পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-গল্প

এই খণ্ডের অনুবাদক

শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাড়ে তিন টাকা

১৩৪৭

উৎসর্গ

অমিয়, বিনয় ও দুলালকে

অনুবাদকের নিবেদন

রাশিয়াকে বলা হয় ছোটো গল্পের দেশ ; রুশ-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট দিক হোলো গল্প। প্রায় সব গল্পের প্রাণ-মূলেই রয়েছে ব্যাপক বেদনা, সমাজ-চেতনা অথবা স্বপ্নাবেশ ; ঘটনার সংঘাত মূলতই এখানে স্তিমিত, অনুভূতিই প্রিয় প্রাণ-সম্পদ।

উনিশ শতক থেকে শুরু ক'রে প্রাক্-বিপ্লব পর্যন্ত একশ বছরের গল্পসাহিত্য থেকে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি সঞ্চয়ন করে বাঙলাভাষায় পরিবেশন করা হ'য়েছে। গ্রন্থ প্রসংগে কয়েকটি নিবেদন :—

(১) নির্বাচন-ক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত হ'লেও—অনেক মুনিই একমত : যে সব গল্প বিখ্যাত রচনারূপে সুধীজনের সম্মান ও সর্বজনের সমাদর পেয়ে এসেছে এবং যেগুলি আমাদের দেশের গতি-প্রকৃতির সংগে সামঞ্জস্য রচনা ক'রেছে সেই গল্পগুলি নির্বাচিত হ'য়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব-পূর্ব রুশীয় ছোটো গল্পের আবেদন ও নিবেদন একেবারেই আমাদের অন্তরংগ। পৃথিবীর গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের দেশে এই সংগতি-সামঞ্জস্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও আলোচ্য বিষয়।

(২) রুশ দেশের গল্প-সাহিত্যের ধারা যথাসম্ভব রূপায়িত করার জন্যে আনুক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হ'য়েছে। কোনো দেশের সাহিত্যের পরিবর্তন ও পরিণতি জানার পক্ষে তার ঐতিহাসিক অনুক্রম অনুসরণ করা একান্ত দরকার।

(৩) লেখকদের জীবনালোচনা তাঁদের প্রত্যেকের রচনার আগে প্রিয় পরিচয় রূপে সন্নিবেশ করা হ'য়েছে—লেখকের প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য।

(৪) রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প-সংগ্রহ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ করা অসম্ভব, তাই পরবর্তী খণ্ডে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ গল্প স্থান পেয়েছে।

(৫) অনুবাদ-প্রসংগে একটি ত্রুটি স্বীকার : রুশ ভাষা এখনো আমার অগম্য, তাই ইংরেজি অনুবাদের অনিবার্য সাহায্য গ্রহণ করেছি ; পুনরনুবাদের অবকাশে মূল রচনা

থেকে যথেচ্ছা স'রে না যাই, সেই উদ্দেশ্যে আমার বিশেষ মনোযোগ র'য়েছে বিশ্বস্ত অনুবাদের দিকে,—কোনো অংশ বা কোনো শব্দতাৎপর্য বাদ দেবার পন্থা বর্জন করেছি, অনেক সময় বিভিন্ন ইংরেজি সংস্করণ তুলনা করা হ'য়েছে। এই পদ্ধতির ভালো-মন্দ দুয়ের জন্যই অনুবাদক দায়ী। নিজের অসাবধানতা বা অজ্ঞতার জন্য যে দোষত্রুটি ঘটেছে তা দ্বিতীয় সংস্করণে পরিশোধন পর্যন্ত লজ্জিত রইলাম। বইয়ের সুরুতে পুশকিন-জীবনীর শেষের দিকে মারাত্মক একটি ছাপা ভুল—গ্যেটের স্থলে গোথে।

(৬) 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-গল্প' বিভিন্ন খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি সিরিজ,—সমস্ত দেশের শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্কলন ও অনুবাদ। রাশিয়া থেকে তার শুভযাত্রা, কারণ ছোটো-গল্পসাহিত্যে অন্যান্য বিদেশ থেকে রুশ গল্পই আমাদের অধিকতর অন্তরঙ্গ হবার যোগ্য। ইতি—

অনুবাদক

ভূমিকা

সাহিত্য অন্যান্য ললিতকলার মতোই শিল্পপদার্থের অন্তর্ভুক্ত এ কথা অনেকে ভুলে যান তার কারণ সাহিত্যের বাহন হ'ল বাক্য। প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিবিধ প্রসঙ্গে আমরা বাক্য অর্থাৎ ভাষার শিল্পরূপকে আচ্ছন্ন ক'রে জানি, শিল্পিত বাক্যই যে সাহিত্যের বাহন তা আমাদের ছিন্নপ্রাসঙ্গিক বোধনে ধরা পড়ে না। সূচীশিল্পীর হাতে সাধারণ সুতোই রূপজালে পরিণত হয়, একটি সূত্রকেও ছিন্ন বা অলগ্নভাবে দেখা সম্ভব নয়; প্রাণবান ভাষার রচিত রূপ আরো কত নিবিড়, অবিচ্ছেদ্য, ভাবের আঙ্গিকে অখণ্ড ঐক্যধর্মী। সাহিত্যকে ভাষান্তরিত করতে গেলেই এসব কথা বোঝা যায়, বাক্যের সঙ্গে বাক্যের অমোঘ সমবায়ের একটি শিল্পমূর্তি ধরা পড়ে যা নির্দিষ্ট হয়েও নির্দিষ্টের চেয়ে বেশি এবং একান্ত ভাবে অন্তর্লীন ব্যঞ্জনার সঙ্গে জড়িত। অনুবাদকের পক্ষে এই শিল্পজ্ঞান সুখকর নয় কেননা দ্রুত সুলভ তর্জমাব্যবসায়ের পথে তা বাধা; কিন্তু এই অভিজ্ঞতার একটি চরম মূল্য আছে। সাহিত্যকে যে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় না, অন্য ভাষায় নূতন ক'রে সৃষ্টি করতে হয় সেই জ্ঞান বিস্তৃত হওয়া দরকার।

কাব্যকে অনুবাদ করা যায় না এ কথা মানতেই হবে। দু-একটি ব্যতিক্রমকে প্রতিকূল দৃষ্টান্ত-স্বরূপে ব্যবহার করা চলেনা, কেননা সৃষ্টিশীল সমালোচক জানেন সার্থক কাব্যানুবাদের প্রচলিত দৃষ্টান্তে অনেক সময়ে বিরুদ্ধ সাক্ষ্যই পাওয়া যায়; যথাযথ অনুবাদের স্থলে স্বকল্পিত প্রক্ষিপ্ত ভাব—সে-ভাব যতই সুন্দর হোক না কেন—কখনই সমর্থনীয় নয়। বাংলাসাহিত্যে এমন একটিও তর্জমা আজ পর্যন্ত বেরোয়নি যাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পের মূল্য দেওয়া চলে, অন্যান্য দেশের কাব্য তর্জমা সম্বন্ধেও সেই কথা বলতে হবে। গদ্যসাহিত্যের তর্জমা অন্যান্য দেশে শিল্পের উৎকর্ষলাভ করেছে; আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও অন্যান্য ভাষা হ'তে সাহিত্যিক অর্থাৎ শিল্পরূপী অনুবাদ ক্রমে দেখা দিচ্ছে।

বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, কিন্তু অনুবাদ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার এবং ভাবনার প্রয়োজন আছে। রুষ সাহিত্যের এই গল্পমালা বাংলা ভাষায় পড়তে গিয়ে মনে হ'ল আধুনিক সাহিত্যে একটি নূতন অঙ্গন খুলে যাচ্ছে—ছোটো গল্পের এই তর্জমাগুলি উৎকৃষ্ট হয়েছে। পুষকিন্ হতে গর্কি পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর যে-সকল গল্প চয়ন করা হয়েছে তাতে অনুবাদকের সাহিত্য-বোধের পরিচয় পাওয়া গেল, বাংলাভাষার মধ্য দিয়ে তিনি রুষ রচনার উজ্জ্বলরূপ প্রকাশ করেছেন। দু-একটি বানান্ এবং উচ্চারণ ভুল লক্ষ্য করলাম কিন্তু গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হবেই এবং ভাষার সংস্করণও সেই সঙ্গেই হ'তে পারবে। আসল কথা এই যে শ্রীমান অনিলেন্দুর শিল্পজ্ঞান এবং অনুবাদ সম্বন্ধে দায়িত্ব বোধ আছে : তিনি এই বইখানিতে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পগুলি প'ড়ে চমৎকৃত হ'তে হয় এবং এই আনন্দদানের কৃতিত্ব মূল লেখকদের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদকেরও অনেকখানি প্রাপ্য বল্‌তে দোষ নেই। বাংলা সাহিত্যে এই নূতন অনুবাদশিল্পীকে আমরা অভ্যর্থনা জানাই—তিনি তাঁর বিশিষ্ট কারুশিল্পের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নূতনতর রুষ এবং অন্যান্য দেশীয় সাহিত্যের পরিচয় দেবেন এই অপেক্ষায় রইলাম।

অমিয় চক্রবর্তী

এলেকজাণ্ডার সার্গেভিচ্ পুশকিন

(১৭৯৯—১৮৩৭)

এই বিখ্যাত রুশ-কবির জন্ম হয় মস্কোতে প্রাচীন এক সম্ভ্রান্ত 'বয়ার' পরিবারে, ৬ই জুন ১৭৯৯ খৃঃ। প্রথম শিক্ষা এক ফরাসী স্কুলের বিদেশী আবহাওয়ায়, পরে সার্কাসেলোর লিসিয়ামে। বৈদেশিক মন্ত্রীর অফিসে চাকুরীকালে লেখা সুরু হয় এঁর 'রুসলান ও লুড়ামিলা' কাব্য। রাজধানীর ফ্যাসানদস্তুর সমাজে ইনি এমনভাবে মশগুল হ'য়ে পড়েন যে কবি হওয়ার চেয়ে বরং কাব্যিক হওয়ার লক্ষণই হ'য়ে ওঠে স্পষ্ট। সহসা তার "স্বাধীনতার প্রশস্তি" কবিতা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত পিটার্সবার্গে, ফলে নির্বাসিত হন দক্ষিণ রাশিয়ায়। স্বাস্থ্য লাভের জন্য ককেশাশে বাসকালে রায়েভস্কি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন বায়রণের কবিতার দিকে এবং ককেশাশের অপূর্ব প্রকৃতিরূপ ফুটিয়ে তোলে তার সুপ্ত কবি প্রতিভা। ফলে, রচনা : ককেশাশের বন্দিনী, বাক্‌চিসারির ঝর্ণাধারা ও জিপসি। ১৮২৫এ রচিত 'বোরিশ গুডানভ' গ্রন্থ—ফরাসীপ্রভাব থেকে মুক্ত। "১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের গুচানেভ বিদ্রোহের ইতিহাস"—এঁর রচিত এক চমৎকার ইতিহাস। ১৮৩১ এ রচিত বিখ্যাত উপন্যাস "ক্যাপ্টেন-কন্যা" লেখকের গদ্য রচনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। পরবৎসরে রচিত "ইভেগনি অনেগিন" বায়রণ প্রভাবিত। গোগোলের সাহিত্য জীবনের পেছনে ছিলো পুশ্‌কিনের যথেষ্ট উৎসাহ।

এক দ্বন্দ যুদ্ধে মারাত্মকরকম আহত হয়ে লেখকের মৃত্যু হয় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী,—মাত্র ৩৮ বছর বয়সে।

রুশভাষার মধ্যে সবচেয়ে মার্জিত সুন্দর গীতি কবিতা রচিত হয়েছে এঁরি হাতে। প্রথম উপন্যাস লেখক হিসেবেও ইনি বিশিষ্ট একজন। ইটালির দাঁতে ও জার্মেনির গোথের মতো রাশিয়ায় এঁর স্থান। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যযুগের অগ্রদূতের চেয়ে পুশকিন বরং পূর্ববর্তী রোমান্টিক ও সামন্ত যুগের সর্বশেষ সুপরিণত অধ্যায়।

লেখকের শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট গল্প—'ইশ্‌ক্রাপনের বিবি'।

ইশ্‌কাপনের বিবি

(১)

গার্ড লেফটানেণ্ট নারুমভের বাড়ীতে একটা তাসের আড্ডা চলছিলো। শীতের দীর্ঘ রাত যে কখন চ'লে গেলো টেরও পাওয়া গেলো না ;—রাতের খাবার পরিবেশন করা হোলো একেবারে ভোর পাঁচটায়। বিজয়ীদল পেটুকের মতোই খেলো, অন্য সবাই কিছুটা অন্যমনস্কভাবে। শ্যাম্পেনের সুভদর্শনের সংগে সংগে সকলেই এবার মশ্‌গুল হ'য়ে উঠলো আলাপ আলোচনায়।

নারুমভ জিজ্ঞেস করছিলো—"কি রকম পেলে, সুরিণ ?"

"বরাবরের মতোই হারছি। আমার বরাতই খারাপ। মিরাণ্ডোল খেলি, মাথা ঠাণ্ডা রাখি, কখনো উত্তেজিতও হইনা—অথচ সব সময়েই হেরে যাই।"

"তাহ'লে কি বলছো যে কক্ষনো লাল তাস ধরতে লোভ জাগে না তোমার ? তোমার মনের জোর দেখে সত্যি বিস্ময় লাগে !"

"কিন্তু, হারমনের বিষয়ে কি বলেন আপনি !"—একটি ইঞ্জিনিয়ার আফিসারকে দেখিয়ে অতিথিদের মধ্যে আর একজন যুবক ইঞ্জিনিয়ার বলে উঠলো।—

"সারা জীবনেও একটা কার্ড ছুঁয়ে দেখেনি, একবারও বাজি ধরেনি,—তবু সোজা একঠাঁয় ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সমানে আমাদের খেলা দেখে যাচ্ছে !"

"তাসটা চমৎকার লাগে আমার",—হারমন মন্তব্য করলো। "কিন্তু আমার অবস্থাটা এমন যে অনিশ্চিত আমোদের জন্য দরকারী কিছু আমি উৎসর্গ করতে পারি না।"

টমস্কি মন্তব্য করলো—"হারমন জার্মান, সতর্ক লোক। ওকে দেখে মোটেই অবাক লাগেনা আমার। একটা আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে কিন্তু আমার দিদিমা,—প্রিন্সেস ফিডরভানা।"

"কেন, কি রকম ?"—সবাই ব'লে উঠলো।

টমস্কি বলে চললো—"কিছুতেই আমি বুঝতে পারি না,—কেন যে খেলেন না তিনি ?"

"এতে একটা আশ্চর্যের কিছু নেই !"—নারুমভ উত্তর দিলো।

"আপনার খেয়াল থাকা উচিত যে তাঁর বয়সও আশী।"

"আচ্ছা, আপনি তাঁর কোনো কথা জানেন কি ?"

"না, কিছুই না।"

"ও, এবার তা হ'লে শুনুন। ষাট্ বছর আগে ঠাকুমা একবার প্যারিসে গিয়েছিলেন,—সে এক অলেহি কারবার। মস্কোর এই ভিনাসকে একবার একটু দেখবার জন্য তার গাড়ীর পিছু পিছু লোকে লোকারণ্য। রিচিলিয়েভ ঠাকুমার কাছে এসে প্রেম নিবেদন করলেন এবং ঠাকুমা নিশ্চয় ক'রে বলেছেন—ভদ্রলোক তার কাছে নির্মম প্রতিদান পেয়ে প্রায় আত্মহত্যাই ক'রে বসেছিলো আর কি ! সে সময়ে মেয়েরা "ফ্যারো" খেলতো। কোর্টে একদিন সন্ধ্যেবেলা ঠাকুমা ডিউক ডি অরলিন্স্-এর কাছে অনেক টাকা হারলেন। বাড়ী ফিরে তিনি তাঁর মুখ থেকে "বিউটি স্পট" মুছে ফেললেন।

তারপর তিনি ঠাকুর্দাকে এই ক্ষতির কথা জানিয়ে ঝুলে পড়লেন যে তাকে এই ঋণ শোধ করতেই হবে। স্বর্গীয় ঠাকুর্দা ছিলেন তখন, যতদূর মনে পড়ে আমার,—তার স্ত্রীর একজন সরকারের মতোই, তাকে ভয়ও করতেন খুবই। যা হোক, ঠাকুর্দা এই ক্ষতির কথা শুনে তো জ্বলে উঠ্লেন, বিলের একটা মস্তো প্যাকেট সামনে ফেলে দিয়ে দেখালেন যে এই ছ' মাসের মধ্যে তাঁরা অন্ততঃ পঞ্চাশ লাখ টাকার বেশী উড়িয়েছেন। আঙুল দিয়ে দিয়ে আরো দেখালেন ;—তাদের মস্কো ও সারাটভের জমিদারী তো আর বিক্রী করা চলবে না ! শেষ পর্যন্ত তখন দাঁড়ালো এই ;—টাকা দিতে তিনি একেবারেই নারাজ। ঠাকুমা ঠাকুর্দার উপরে খুব এক চোট কিল ঘুষি বাগালেন, রাগ দেখাবার জন্য ভিন্ন বিছানায়ও শুলেন গিয়ে। ভোর বেলায় স্বামীকে তিনি ডেকে পাঠালেন,—ভরসা ছিলো, রাতের বিচ্ছেদ-বটিকা নিশ্চয়ই কাজ করেছে তার উপর : কিন্তু, না ; ঠিক তেমনিই একগুঁয়ে তিনি। জীবনে এই প্রথম বারই ঠাকুমাকে যুক্তি

কৈফিয়ৎ দিতে হোলো! "ঋণেরও রকম ভেদ আছে"—বোঝালেন ঠাকুর্দাকে—"একজন প্রিন্সের সংগে তো আর রাস্তার লোকের মতো ব্যবহার করা চলে না!" কিন্তু ঠাকুমা তার সমস্ত নরম বক্তৃতা দিয়েও তাকে একটুও টলাতে পারলেন না। ঠাকুমা এবার ভেবেই পেলেন না—কী করবেন তবে। কোনো ক্রমে একজন নামজাদা লোকের সংগে একটুখানি তার পরিচয়ের মতো ছিলো। কাউণ্ট সেণ্ট জারমেনের কথা আপনারা শুনেছেন বোধ হয়—যার প্রসংগে কতো অদ্ভুত গল্পই না চ'লে আসছে। ভ্রাম্যমান একজন ইহুদি বলে তিনি সুপরিচিত এবং তার জীবনে নাকি ভবঘুরের চাঞ্চল্য ও দার্শনিকের গাম্ভীর্য দুটোই সমানে ছিলো। কেউ কেউ তাকে মনে করতো—ভণ্ড! কাজানভ তার "স্মৃতি লেখায়" বলেছেন: আসলে তিনি ছিলেন একজন গুপ্তচর। সে যাই হোক না,—সেণ্ট জার্মেনের চারদিকে এই সমস্ত দুর্বোধ্য রহস্য ঘিরে থাকলেও চমৎকার মর্যাদাময় তার চেহারা,—সামাজিক চাল চলনও নিখুঁত রকম মার্জিত। আজ পর্যন্তও দিদিমা তার কথা ভাবতে ভালোবাসেন এবং তাকে নিয়ে কেউ কোন অমর্যাদার কথা বললে চটে ওঠেন। দিদিমা জানতেন,—সেণ্ট জার্মেন ইচ্ছে করলে লাখে লাখে টাকাও ঢেলে দিতে পারেন। সোজা তাই তাঁর কাছেই লিখে জানালেন তিনি: যতো শিগগির সম্ভব তাকে এসে যেনো একবার দেখেন। তখন সেই অদ্ভুত বুড়ো ভদ্রলোক এসে দেখলেন, ঠাকুমা গভীর শোকে মুহ্যমান। ঠাকুমা তার স্বামীর বর্বরতার কথা, যতো দূর সম্ভব জঘন্য রঙ্‌ চঙ্‌ দিয়ে বলা সম্ভব, বল্লেন। এখন তার সমস্ত আশা ভরসা নির্ভর করছে এক মাত্র তার বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির উপরেই। সেণ্ট জার্মেন চিন্তা ক'রে বললেন:

"আমি টাকাটা দিতে পারতাম, কিন্তু শোধ না করা পর্যন্ত যে সুস্থই থাকবেন না আপনি—সেই হচ্ছে মুস্কিল। বুঝতেই পারছেন, এটা মোটেই কাম্য নয় যে আপনি শেষে আবার আরও বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়েন। বরং আর একটা উপায় আছে; টাকাটা আপনি আবার জিতেই যেতে পারেন।"

"কিন্তু, বন্ধু কাউণ্ট"—ঠাকুমা বাধা দিলেন,—"আপনি কি বুঝছেন না যে আমার টাকাই নেই আর!"

"টাকার দরকার নেই আপনার। শুনুন তা হোলে।"—এই ব'লে সেণ্ট জার্মেন তখন ঠাকুমাকে একটা গোপন সন্ধি ব'লে দিলেন—যা জানবার জন্ম এখানকার প্রত্যেকে তাদের যথা সর্বস্ব সাগ্রহেই দিয়ে দিতে রাজি!

খেলোয়াড়দের মধ্যে যুবকেরা এবার আগ্রহে ঝুঁকে প'ড়ে শুনতে লাগলো। টমস্কি পাইপটায় গোটা দুই তিন টান দিয়ে নিলো:

"সেদিন সন্ধ্যা বেলায়ই দিদিমা Versilles an jen de la rune-এ এসে উপস্থিত। ডিউক অব অরলিনস্-এর উপর টাকা লেনদেনের ভার। দিদিমা সুরুতেই বল্লেন—"ক্ষমা করবেন" এবং তখন ঋণের টাকাটা না আনার জন্ম একটা যা খুসী গল্প বানিয়ে বল্লেন। এবারে খেলা আরম্ভ হবে। তিনটি তাস বেছে নিয়ে একটির উপর আর একটি রাখলেন ঠাকুমা। আশ্চর্য, ফি বারেই জিতলেন তিনি,—সব ঋণ থেকেই একেবারে মুক্ত হ'লেন।"

"নিছক ভাগ্যের খেলা!"—একজন অতিথি মন্তব্য করলো। "এ যে রূপকথা!" —হারমন একটু হাসলো।

"তাসগুলিতে সম্ভবতঃ দাগ-কাটা ছিলো।"—তৃতীয় আর একজনের উত্তর।

"আমার তা মনে হয় না"—টমস্কির গম্ভীর গলা শোনা গেলো। নারুমভ এবার জিজ্ঞেস করলো:

"তা হ'লে কি বলছো,—তোমার একজন ঠাকুমা আছেন—পর পর তিনটি জয়ী তাসের সন্ধান জানেন তিনি, অথচ তুমি তার কাছ থেকে কখনও তার রহস্য জেনে নাওনি?"

"হ্যাঁ, তা বটে।"—টমস্কি বলতে লাগলো—"চার ছেলে ছিলো ঠাকুমার, আমার বাবা তার একজন; প্রত্যেকেই হাড়ে হাড়ে জুয়াড়ী। কিন্তু ঠাকুমা কারো কাছে কক্ষনো তার গোপন সন্ধি প্রকাশ করেন নি,—করলে অবশ্যি তারা ও আমি দু'দলই টেক্কা মেরে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমার কাকা কাউণ্ট আইভান ইলিচ আমাকে একবার বলেছিলেন,—খেয়াল করবেন, তাঁর সম্মানের দোহাই দিয়েই বলেছিলেন যে, স্বর্গীয় চ্যাপ্লিট্স্কি,—লাখ টাকা উড়িয়ে শেষে যিনি উপোষ করে

মরেছেন,—তিনি একবার তিনশ হাজার রুব্‌ল হারলেন জোরিচ,—হ্যাঁ, জোরিচের কাছেই। ঠাকুমা সাধারণত যুবকদের এই খেয়াল-খারাবির উপর ভয়ানক চটা; কিন্তু কেন যেনো সেবার চ্যাপ্লিট্‌স্কির উপর দরদ হোলো তাঁর। ঠাকুমা তাকে পর পর খেলবার তিনটে তাস দিয়ে দিলেন; আর, তাকে দিয়ে জোর প্রতিজ্ঞাও করিয়ে নিলেনঃ জীবনে আর কখনো কিছুতেই খেলবে না সে। জোরিচদের ওখানে চ্যাপ্লিট্‌স্কি এসে খেলতে বসলেন। প্রথম তাসেই ধরলেন পঞ্চাশ হাজার,—জিতলেন। শেষ পর্যন্ত হারানো টাকার বেশীও তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন······সে যা হোক, তা হ'লে এবার শুতে যাওয়া দরকার,—ছ'টা বাজে প্রায়।"

ভোর হ'য়ে আসছে। যুবকদল তাদের পানপাত্র নিঃশেষ ক'রে চলে গেলো—যে যার পথে।

(২)

বৃদ্ধা কাউণ্টেস ড্রয়িং রুমে বড় একটা আয়নার সামনে ব'সে আছেন; তিনটি কুমারী ফরমাস-যোগানোর জন্য পাশে দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে রুজের একটা পাত্র, আর একজনের পিনের বাক্স, তৃতীয়জনের হাতে একটা টুপি,—লাল ফিতে ঝুলোনো। রূপ নিয়ে কণামাত্র অহংকার করার দাবীও এখন আর কাউণ্টেসের নাই; বহুদিন হয় তা চলে গেছে। কিন্তু নবীন বয়সের সমস্ত কিছু অভ্যাসই এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনি। সপ্তাদশ খৃষ্টাব্দের বিলাস-ব্যসন এখনও অধ্যবসায়ের সংগে অনুকরণ করেন আয়নার সামনে প্রসাধনে সময় নেন—সেই ষাট্ বছর আগেও যেমন! তার পরিচারিকাটি (গভর্ণেস্) জানালায় ব'সে তখন ফ্রেমে কি যেনো বুনছিলো।

হঠাৎ একজন যুবক ঘরে ঢুকে বল্‌লো—"ভালোতো ঠাকুমা? এই যে মিস্ লিজি, নমস্কার! ঠাকুমা, আপনার কাছে একটা কাজে এসেছি।"

"কি বলো, পল্?"

"আমার এক বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি? শুক্রবার 'বলে' নিয়ে আসবো তাকে?"

"আচ্ছা নিয়ে এসো; সেখানেই পরিচয় হবে। তুমি কি গিয়েছিলে সেখানে—কালকে,?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! চমৎকার লাগলো, পাঁচটা পর্যন্ত নাচ গান হোলো আমাদের। মিস্ ইলাট্‌স্কায়াকে দেখাচ্ছিলো চমৎকার!"

"চমৎকার বলছো! এতো সহজেই চোখ ভোলে তোমার? দেখবে তো তার ঠাকুমাকে—প্রিন্সেস্ ডেরিয়া পেট্রোভানাকে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে এখন ত সে বুড়োই। প্রিন্সেস—"

"কিন্তু সে তো সাত বছর আগেই মারা গেছে, ঠাকুমা—" উদাস ভাবেই বললো টমস্কি।

মিস লিজি এবার মাথা তুলে যুবকটির দিকে একটা ইংগিত জানালে; টমস্কির মনে পড়লো যে কাউন্টেসকে তার সমসাময়িকদের মৃত্যুর কথা বলতে নেই। কাউন্টেস অত্যন্ত বিরক্তি নিয়ে উদাসীন ভাবে এই নতুন খবরটা গ্রহণ করলেন।

"মরেছে?"—আশ্চর্য হলেন তিনি,—"আর আমি জানি না!...একই বছরে সে আর আমি সব চেয়ে সম্মানিত কুমারীর আসন পেয়েছিলাম এবং আমাদের সেবারে যখন নিয়ে যাওয়া হোলো, তখন মহারাণী......"

একশো বারের বেশীও কি টমস্কির কাছে এই একই কথা বলেননি কাউন্টেস!

"আমাকে ধরো পল!"—তিনি বল্লেন,—"লিজাংকা আমার নস্যির ডিবেটা কোথায়?"

কুমারী সেবিকাদের গায়ে ভর ক'রে কাউন্টেস পর্দার পেছনে চলে গেলেন।

লিজাভেটা আইভানোভানা এবার নরম ক'রে জিজ্ঞেস করলো—"আপনার কোন বন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন বলছিলেন?"

"নারুমভ, তাকে চেনো বুঝি?"

"না; সে সৈন্য, না সিভিলিয়ান?"

"সৈন্য।"

"ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে?"

"না, অশ্বারোহী বিভাগে,—কিসে ধারণা হোলো তোমার সে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে?"

মেয়েটি হাসলো শুধু, কোনো উত্তর দিলো না। "পল?"—কাউন্টেস পর্দার ওদিক থেকে ডাকলেন—"দেখে শুনে একটা নতুন রকমের উপন্যাস পাঠিয়ে দিও তো আমায়—শুধু তোমাদের এই আধুনিক ধরণের হয় না যেনো, বুঝলে?"

"তা হোলে, নতুন হবে কি ক'রে, ঠাকুমা?"

"মানে—বলছিলাম, যে উপন্যাসের 'হিরো'; তার বাবা বা মাকে গলা টিপে মারেনি বা জলে ডুবে মরেনি কেউ। জলে ডোবাটা আমি কিছুতেই সামলে উঠ্‌তে পারিনা। আজকাল কি আছে এরকম নভেল?"

"রাশিয়ান ভাষারটা ভালো লাগবে তো?"

"রাশিয়ায় নভেলও আছে নাকি?—যা হোক একটা পাঠিয়ে তো দিও পল?"

"দুঃখিত আমি ঠাকুমা! এখনি বেরুতে হবে আমাকে, সত্যিই দুঃখিত।"

"লিজাভেটা, কি ক'রে ধারণা হোলো তোমার যে নারুমভ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে?" লিজাভেটার কাছে ফিরে এসে এই ব'লে চলে গেলো টমস্কি।

লিজাভেটা ব'সে আছে একা, হাতের কাজ ফেলে সে জানালার বাইরে তৃষ্ণার মতো চেয়ে আছে। একটু কাল পরেই যুবক একজন সৈনিক অফিসার রাস্তার কোণ ঘুরে এসে বেরুলো, আর লিজাভেটার গালে এসে লাগলো যেনো একটা লাল ছোপ! আবার কাজে মন দিলো সে এমব্রয়ডারীর উপরে একেবারে নুয়ে প'ড়ে। ঠিক তখনি কাউন্টেস সম্পূর্ণ সেজেগুজে এসে ঢুকলেন।

"লিজাংকা, এক্ষুনি গাড়ী তৈরী রাখতে বলো। বাইরে বেরুবো।"

লিজাংকা সূচীকাজ থেকে উঠে হাতের জিনিসপত্রগুলি তুলে রাখছিলো।

"কাণের মাথা খেয়েছো বুঝি?"—কাউন্টেস চেঁচিয়ে বললেন—"এক্ষুনি গাড়ী অর্ডার করো।"

"যাচ্ছি।"—মেয়েটি তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েই ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো।

চাকর এসে কাউণ্টেসকে একটা বই দিয়ে গেলো—প্রিন্স পল এলেকজ্যাণ্ড্রোভিচ্ পাঠিয়েছেন।

"প্রিন্সকে আমার ধন্যবাদ জানিও। লিজাংকা, লিজাংকা, আঃ থাকো কোথায়।"

"জামা কাপড় পরবো?"

"ঢের ঢের সময় আছে এখনো; বসো, এসে বসো এখানে। প্রথম ভাগটা খুলে গলা ছেড়ে পড়ো দেখি।"

মেয়েটি বইটা নিয়ে পড়তে লাগলো।

"আরো জোরে পড়তে পারো না?"—কাউণ্টেস যেনো ধমক দিলেন,—"ঘুমোচ্ছো নাকি? হ্যাঁ, একটুকাল রাখো। পাদানীটা নিয়ে এসো আগে, আরো একটু কাছে,—হ্যাঁ।"

কয়েকটা পাতা পড়লো লিজাভেটা,—কাউণ্টেস হাই তুলছেন।—"রাখো ওটা, কি যাচ্ছেতাই! ধন্যবাদ জানিয়ে প্রিন্স পলকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। গাড়ী তৈরী?"

"হ্যাঁ"—রাস্তার দিকে তাকাতে তাকাতে লিজাভেটা বল্‌লো।

"বাঃ রে! এখনো সাজগোছ করোনি?"—কাউণ্টেস জিজ্ঞেস করলেন—"সব সময়ই তোমার জন্যে বসে থাকতে হবে! লিজা, তোমাকে নিয়ে চলাই অসম্ভব হ'য়ে উঠছে দিন দিন।"

লিজা দৌড়ে গেলো তার কোঠায়। কিন্তু দু' মিনিট না যেতেই কাউণ্টেস ভয়ানক ভাবে কলিংবেল বাজালেন। সেবিকা তিনটি কুমারী একটা দরজা দিয়ে দৌড়ে এলো,—চাকরটা আর একদিক দিয়ে। "এত ক'রেও কানে ঢুকছে না!"—কাউণ্টেস যেনো কৈফিয়ৎ চাইছেন—"লিজাভেটাকে বলো গিয়ে,—দাঁড়িয়ে আছি আমি।"

লিজাভেটা তাড়াতাড়ি একটা ক্লোক ও টুপি পরে এসে দাঁড়ালো।

কাউণ্টেস বাঁকা অভ্যর্থনা জানালেন—"শেষ পর্যন্ত দয়া করে এসেছো যা হোক।··· বাঃ, কী চমৎকার সাজ! কিন্তু দরকার ছিলোনা কোনো! ভুলিয়ে নেবার নেই কেউ সেখানে! আবহাওয়াটা আজ ভালো তো? মনে হয়, বাতাস হ'চ্ছে।"

"না, দেখুন, কোনো হাওয়াই দিচ্ছে না।"—চাকরটা উত্তর দিলো।

"ঠিক জানো তুমি? খোলো জানালা। দেখেছো, এবার হাওয়া দিচ্ছে, ঠাণ্ডা হাওয়া। গাড়ী দরকার নেই, লিজাংকা, বেরুবো না আজকে। দুঃখ হচ্ছে, তোমার অমন সাজটাই বৃথা গেলো।"

"উঃ, কী জীবন!"—লিজাভেটা শুধু ভাবছিলো।

সত্যই, লিজাভেটার মতো এমন অসুখী আর কেউ নেই। "অন্যের হাড়ির ভাত যেনো বিষে ভরা"—দান্তে বলেছেন,—"অচেনা ঘরের দোর পর্যন্ত অনেক হোঁচটই ছড়ানো।" অধীনতার এই বিষাক্ত অবস্থা—প্রাচীন সমাজের নামজাদা কোনো মহিলার অধীনে চাকুরী-করা কোনো পরিচারিকার চেয়ে আর কে তা হাড়ে হাড়ে বুঝবে?

কাউণ্টেসের প্রাণটা খারাপ নয়; কিন্তু পৃথিবী তাকে নষ্ট করে দিয়েছে। খাম-খেয়ালী তিনি, নীচমনা, দাম্ভিক ও আত্মকেন্দ্রিক। সমস্ত প্রাচীন লোক—যাঁরা তাঁদের দিনে ভালোবেসেছেন কিন্তু আজকে বেখাপ্পা—তাঁদের সেই আত্মমুখিতা এখনো এঁর মধ্যে চাড়া দিয়ে আছে। এখনো তিনি সমস্ত সামাজিক উৎসব আসরে যোগ দেন, উৎসাহ ভরে নিজেকে টেনে নিয়ে যান "বলে",—এক কোনে ব'সে থাকেন—প্রসাধন রঙলেপা, প্রাচীন কালের ফ্যাশানে সজ্জিত সে এক জঘন্য দৃশ্য! অতিথিরা এসে নিয়ম-মাফিক তাঁর দিকে একবার মাথা নোয়াতো; তারপর আর ভুলেও তাকাতো না। তাঁর নিজের বাড়ীতে গোটা সহরটাই তিনি আমন্ত্রণ করতেন; কিন্তু একটি মুখও চিনতেন না তার। ঘরের অসংখ্য ঝি-চাকর দিনের পর দিন বারান্দায় ও চাকরদের হলঘরে ব'সে ব'সে মোটা হচ্ছে—এবং তাঁরি টাকা পকেট মারবার জন্য এ ওর সংগে গালি-গালাজ ও মারামারি নিয়ে ব্যস্ত। লিজাভেটাই হচ্ছে ঘরের নানান ঘা-লাগা খুঁটি। চা তৈরী করতে গেলে, প্রত্যেক চামচ চিনির হিসেব করবে সে; জোরে জোরে পড়িয়ে শোনাতে গেলে—গ্রন্থকারের দোষের জন্য জবাবদিহি দিতে হবে তার; কাউণ্টেসের সংগে গাড়ী ক'রে কোথাও গেলে,—ঈষৎ অসুবিধের আবহাওয়া বা রাস্তার জন্যেও দায়ী হতে হবে তাকেই। একটা নির্দিষ্ট মাইনে তার পাবার কথা, কিন্তু ঐ পর্যন্তই,—অথচ তাকে অন্যমেয়েদের মতো সাজ-

পোষাক করতে হবে; মানে, সমাজের বাছা কয়েকটি মেয়ের মতোই। সমাজে তার স্থান কী করুণ! চেনে তাকে প্রত্যেকেই, অথচ কেউ একবার তার দিকে ফিরেও তাকায় না; "বলে" কেবলমাত্র তখনি সে নাচবার সুযোগ পায় যখন পর্যাপ্ত সংখ্যক পুরুষ উপস্থিত থাকে না। মহিলারা ফিরে আবার তাদের সাজ-প্রসাধন ক'রতে হ'লে তার ঘাড়েই ভর রেখে বিশ্রাম-ঘরে আসে। সে নিজে অত্যন্ত অনুভূতি-প্রবণ, অভিমানী; নিজের অবস্থা নির্মমভাবে মনেপ্রাণে বুঝতে পারে—এ থেকে মুক্তি দেবার একজন লোকের জন্য সে আকুলভাবে প্রতীক্ষা করে শুধু। কিন্তু যে সমস্ত যুবকদের সংগে তার দেখা হয়—তারা সজাগ, হিসেবী, চঞ্চল ও ভণ্ড, তা ছাড়া তাকে তারা বিশেষ লক্ষ্য করবার মতো জীব ব'লেও মনে করে না।—যদিও লিজাভেটা আইভানো-ভামা এই সমস্ত পিতল-মুর্তি মেয়েরদল—যাদের পাশে তারা ঘুরে বেড়ায়—এই তাদের চেয়ে শত শত গুণে সুন্দর। কতোবার করে যে সে এই জাঁকজমক-ঝলসানো একঘেয়ে ড্রয়িংরুম থেকে তার ঘরে গিয়ে উবুড় হ'য়ে পড়ে আকুলভাবে কেঁদেছে! তার ছোট্ট, একেলা ঘর,—একটা পর্দা, ক'টা ড্রয়ার, বিছানা, আলো এবং পিতলের বাতিদানীতে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে জ্বলছে একটা মোমবাতি।

একদিন—এই দৃশ্যের ঠিক এক সপ্তাহ আগে এবং এই গল্পের ঘটনা আরম্ভ হ'বার দুদিন আগে মাত্র—সূচীকাজ নিয়ে জানালায় ব'সে আছে লিজাভেটা। হঠাৎ সে দেখতে পেলো, যুবক একজন অফিসার নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে জানলায় তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। মাথা নুইয়ে সে হাতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল; মিনিট পাঁচেক পরে আবার যখন মাথা তুলল তখনও যুবকটী ঠিক সেখানেই। পথের লোকের দিকে এমনি নজর দেয়া তার অভ্যাস নেই, কাজেই জানালা থেকে সরে গিয়ে দুঘণ্টা ধরে কেবল সেলাই ক'রেই চললো, মাথাটা পর্যন্ত একটুও তুললো না। দুপুরের খাবার ঘণ্টা পড়লো। উঠে সে সেলাইয়ের জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে রাস্তার দিকে হঠাৎ একবার তাকিয়েই দেখে, অফিসারটী তখনও একঠায়ে তেমনিই দাঁড়িয়ে! ব্যাপারটা তার কাছে অস্বাভাবিক—একেবারে বিচিত্র লাগলো,—খেয়ে এসে ফিরে,—কেমন যেনো আশংকা নিয়েই দেখলো যে চলে গেছে সে। তারপর তার বিষয়ে

কোনো কিছুই আর মনে রইলো না। দুদিন পরে আবার তাকে সে দেখতে পেলো কাউন্টেসকে নিয়ে গাড়ীতে উঠবার পথে। দোরের দিকের সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো সে,—জামার মস্তবড়ো কলারটায় মুখখানা অনেকটা ঢাকা, টুপীর তলা থেকে ছুটে আসছে উজ্জ্বল দুটি চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। লিজাভেটা কেন যেনো ভয় পেয়ে গেলো এবং কেমন ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে গাড়ীতে গিয়ে বসল।

বাড়ীতে ফিরেই জানালার কাছে দৌড়ে এল সে। অফিসারটী ঠিক সেখানেই—তার চোখ ঠিক লিজাভেটার উপরেই। ঔৎসোক্যের যন্ত্রণা আর নতুন কি যেনো এক অনুভূতির মধুর উত্তেজনায় তাড়াতাড়ি সে জানলা থেকে পিছে স'রে দাঁড়ালো। সেদিন থেকে প্রতিটি দিনই সে ঠিক সময় সেই জানলার নীচে এসে দাঁড়ায়। একটা অলক্ষ্য আকর্ষণ তাদের দুজনের মধ্যে গড়ে উঠলো। লিজাভেটা তার কাজে বসে বসে তার আগমন অনুভব করতো; আর প্রত্যেক দিনই সে আগের দিনের চেয়ে আরো বেশীক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতো তার দিকে। যুবকটী এই অনুগ্রহের জন্য তার উপর কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠলো। যৌবনের সজাগ চোখে লিজাভেটা যেনো দেখতো তাদের চোখাচোখি হোলেই প্রতিটিবার অফিসারটীর মুখের উপর নরম একটা রঙ ফুটে ওঠে। এক সপ্তাহ না যেতেই তার দিকে লিজাভেটা হাসি মুখে চাইলো.........। টমস্কি যখন কাউন্টেসের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার অনুমতি চেয়েছিলো এই মেয়েটী প্রথমটায় আনন্দে যেনো দুলে উঠলো। কিন্তু নারুমভ্ অশ্বারোহী সৈন্যদলে, ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে না,—একথা জেনে তার আফসোষই হোলো;—হাল্কা মানুষ টমস্কির কাছে কেনো তার গোপন খবর খুলে দিলো?

হারমান্ রাশিয়ান্ হ'য়ে-যাওয়া একজন জার্মানের ছেলে; বাবা কিছুটা সম্পত্তিও রেখে গেছেন, কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার সংকল্পে সে তার মূলধনের সুদে পর্যন্ত হাত দিতো না। সংযত উচ্চাকাংখী মানুষ সে, তার সহকর্মী অফিসাররা তার তীক্ষ্ণ সতর্কতা নিয়ে কখনও বড়ো একটা উপহাস করবার পর্যন্ত সুযোগ পেতো না। আবেগ-প্রবণ তার মন, কল্পনার উড্ডীন শিখা তার বুকে, কিন্তু তার চরিত্রের অদ্ভুত জোর যৌবনের অনেক হোঁচট থেকে তাকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছে। নিজে

কখনও সে তাস স্পর্শ করে না। বিবেচনা করে দেখেছে—সে সামলাতে পারবে না; নিজেই যেমন বলেছে—"আমার অবস্থাটা এমন যে, অনিশ্চিত আমোদের ঝোঁকে দরকারী কিছু উৎসর্গ করতে পারি না।" তা সত্ত্বেও তাসের টেবিলের সামনে রাতের পর রাত বসে থাকে, খেলার ওঠা-নামা, আশা-নিরাশার বিচিত্র মোড় নেশার মতো উৎসাহে লক্ষ্য করে।

তিন-তাসের গল্পটা তার ভাবনায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, সমস্ত রাত এক মুহূর্তও তা মন থেকে তার মুছে গেলো না। পরের দিন সন্ধ্যেবেলা সেই পিটার্সবার্গএর রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে ভাবলো সে—"আচ্ছা যদি—যদি সেই বুড়ী কাউণ্টেস তার গোপন সন্ধিটা বলে দেয় অথবা তাস তিনটাই বলে দেয়? আচ্ছা, আমি নিজেই ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি না কেন? প্রথমত তার সংগে পরিচয় করতে হবে। তার অনুগ্রহ আদরের মধ্যে জায়গা করে নিতে হবে,—দরকার হ'লে তার প্রণয়ী হয়ে নেবো —কিন্তু না, এতে অনেকটা সময় দরকার এবং এখন তার সাতাশী বছর, এক সপ্তাহের মধ্যে মরেও যেতে পারে; কেন, এই একদিনের মধ্যেই হয়তো! আশ্চর্য লাগছে, গল্পটা সত্যি কিনা? হয়তো একটা রূপক মাত্র। বিজ্ঞতা, সংযম আর পরিশ্রম এই হচ্ছে তিনটা নিশ্চিত জয়ী তাস,—আমার মূলধনকে যা তিন গুণ করে এনে দেবে, তিন গুণ কেনো—সাত গুণ; এবং সে সংগে শান্তি ও স্বাধীনতার আশীর্বাদও।"

ভাবতে ভাবতে সে পিটার্সবার্গএর প্রধান রাস্তায় সুন্দর একটা প্রাচীন বাড়ীর সামনে এসে পড়লো। রাস্তায় গাড়ীর পর গাড়ীর দীর্ঘ শ্রেণী, উজ্জ্বল আলোতে সাজানো একটা বারান্দার দিকে এসে দাঁড়াচ্ছে। গাড়ী থেকে কখনো একটী মেয়ের সম্ভ্রান্ত ছোট্ট পা দুটী মাটীতে এসে নামছে, কখনো আবার ভারী বুট জুতোর ক্যাঁচ ক্যাঁচ, এই একটা ডোরা কাটা মোজা, এই আবার অদ্ভুত ধরণের জুতো; পশমী কোট, আলেষ্টার সমস্তই—ঐ দীর্ঘ দেহ পুলিশটীর পাশ দিয়ে ঝলকের মতো চলে যাচ্ছে।

"ওটা কার বাড়ী?"—মোড়ের একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করলো সে।

"কাউণ্টেস যিনি—"পুলিশটী উত্তর দিলো।

আবার সোজা চলতে লাগলো হারমন। সেই অদ্ভুত গল্প আবার তাকে পেয়ে

বসেছে। বাড়ীটার সামনে বার বার করে সে কেবল পায়চারি করতে লাগলো। মনের মধ্যে এক মাত্র ভাবনা: এই বাড়ীর কর্ত্রী, কী তার অদ্ভুত শক্তি! সে যখন তার দীন কুটিরে ফিরে এসে পৌছলো—তখন রাত। অনেকক্ষণ পর্যন্ত জেগে জেগে শেষে সে ঘুমিয়ে পড়লো ও স্বপ্ন দেখলো: তার সামনে সবুজ একটা টেব্‌লে নোটের তাড়া আর সোনার স্তূপ! তাসের পর তাস খেলছে সে;—সংকেত স্বরূপ তাসের কোন একটু ভেঙে রাখলো এবং জিতলো তো শুধু জিত্‌তেই থাকলো।—নোট আর সোনায় পকেট্‌কে পকেট ভারী হয়ে গেলো। তারপর, অনেক বেলায় যখন সে এবার জাগলো—বুক ফাটা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার এই ছায়া-সম্পদের জন্য।···

আবার সে ফিরতে লাগলো সহরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে। সেই কাউণ্টেসের বাড়ীর সামনে আবার এসে দাঁড়ালো সে। একটা অদৃশ্য অদম্য শক্তি যেনো এখানেই তাকে টেনে আনছে বার বার। দাঁড়িয়ে প'ড়ে সে উপরে জানালার দিকে তাকালো। সেখানে কালো চুল ভরা একটি মাথা নোয়ানো র'য়েছে। সম্ভবত, কোনো হাতের কাজ নিয়ে আছে; মাথাটি এবার উপরে উঠলো:—হারমনের দিকে চেয়ে আছে একখানি মিষ্টি মুখ আর সুন্দর দুটি কালো চোখ। সেই মুহূর্তেই হারমনের ভাগ্য স্থির হ'য়ে গেলো।

(৩)

লিজাভেটা সবে মাত্র গা থেকে ক্লোকটা খুলেছে কি—কাউণ্টেস অমনি আবার তাকে ডেকে পাঠালেন: এক্ষুনি গাড়ী প্রস্তুত রাখতে হবে। এবারে তারা বেরিয়ে পড়লেন। লিজাভেটা দেখলো—তার সেই অফিসারটি গাড়ীর পাশেই দাঁড়িয়ে। সে এসে তার হাত ধরলো। লিজাভেটা ভয়ে যেনো আর নিজেকে সামলে রাখতে পারছিলো না। তার হাতের মধ্যে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে যুবকটি চলে গেলো। লিজাভেটা সেটা তার দস্তানার মধ্যে চট্ ক'রে সেটুকু ঢুকিয়ে রাখলো। সমস্ত দিনটাই

যেনো স্বপ্নের মধ্যে কাটালো সে। চারদিকের সমস্ত দৃশ্য, সমস্ত শব্দ মুছে গেলো তার সামনে থেকে। কাউণ্টেস পথে পথে প্রশ্নের পর প্রশ্ন দিয়ে তাকে যেনো অভিভূত ক'রে ফেলছিলো।

"ঐ কার সংগে দেখা হোলো?" "এই পুলটার নাম কি?"

"এই সাইন বোর্ডটায় কি লেখা?" লিজাভেটা কিন্তু চিন্তামাত্র না ক'রে আনমনার মতো উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে বিরক্তভাবে। কাউণ্টেস্ চটে উঠলেন:

"তোমার হ'য়েছে কি শুনি? ঠিক যেনো একটি কাঠের পুতুল! শুনতে পাচ্ছো না, না মাথায়ই ঢুকছে না কিছু,—কোনটা? ভগবানকে ধন্যবাদ, এখনো আমি স্পষ্ট ক'রে সব ভাবতে বা বলতে পারি। আর, যা বলবো ঠিক লাগ-সই!"

লিজাভেটা এসব কিছুই শুনছিলোনা। বাড়ী পৌঁছেই সে নিজের ঘরে দৌড়ে এলো—একটা মুক্তির নিশ্বাসের মতো। দস্তানা থেকে লেখাটুকু বের করলো,—খোলা চিঠি; পড়তে লাগলো সে। প্রাণের দরদ-দেয়া ভালোবাসার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি সেখানে: প্রত্যেক কথাটি একটা জার্মান উপন্যাস থেকে তুলে নেয়া। লিজাভেটা জার্মানভাষা জানে না, কাজেই নিশ্চিন্ত হোলো। কিন্তু তা হ'লেও চিঠিটা তাকে উদ্বিগ্ন ক'রে রাখলো। প্রথমত, একটি অচেনা যুবকের সংগে সে অবৈধ রকম ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। যুবকটির দুঃসাহস দেখে সে ভয় খেয়ে গেছে, এই অন্যায় আচরণের জন্য নিজেকে মন্দ না বলে পারলো না সে এবং বুঝে উঠতে পারলো না যে এখন তার কী করা উচিত। জানালার পাশে ব'সে আর সূচীকাজ করবেনা, তাচ্ছিল্য দেখিয়ে যুবকটির সমস্ত উজ্জ্বল উৎসাহ সে নিভিয়ে ফেলবে? চিঠি ফেরৎ পাঠাবে, না নির্মমভাবে উত্তর লিখে দেবে? এমন কেউই নেই,—যার কাছে একটা কথা সে জিজ্ঞেস করতে পারে, একটি বান্ধবী নেই, নেই একটি গুরুজন। লিজাভেটা ঠিক উত্তরই দেবে।

লেখার ছোট টেবিলের পাশে ব'সে সে কাগজ ও কলম নিলো, লেখার চেষ্টায় পৃষ্টার পর পৃষ্টা ছিঁড়ে ছিঁড়ে;—কারণ, একটার সুর মনে হচ্ছিল উৎসাহ দেয়া আর একটার বেশী নির্মম। শেষ পর্যন্ত কয়েক ছত্র লিখে উঠ্‌লো সে,—কোনোরকমে মনমতো।

"একথা বোধ হয় নিশ্চিত বলিয়া ধরতে পারি যে"—সে লিখলো "আপনার উদ্দেশ্য সাধু এবং নিশ্চিতই আপনার কোন কাজের দ্বারা আমাকে অপমান করিতে চান নাই কিন্তু এভাবে আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হওয়া উচিত হয় নাই। আপনার চিঠি ফেরৎ পাঠাইতেছি আমি। ভবিষ্যতে হঠাৎ কোনো অমর্যাদার কারণ আপনার দিক হইতে আশা করিব না।"

পরদিনই রাস্তায় হারমনকে দেখতে পেয়ে লিজাভেটা তার সূচীকাজ থেকে উঠে বারান্দায় গেলো ও একটা জানলা খুলে লেখা চিঠিটা ফেলে দিলো; বিশ্বাস রইলো যে সতর্ক যুবকটী নিশ্চয়ই এসে তুলে নেবে। হারমন দৌড়ে গিয়ে লেখাটা তুলে নিয়ে একটা ময়রার দোকানের মধ্যে এলো। এনভেলাপটা ছিঁড়ে তার নিজের চিঠিটাই দেখতে পেলো সে, সংগে লিজাভেটার উত্তর। এমন উত্তর কখনো সে আশা করেনি। গোপন প্রণয় ব্যাপারে একেবারে ডুবে থেকে সে বাড়ী ফিরে এলো।

তিনদিন পরে মেয়ে খলিফার এক দোকান থেকে একটা তীক্ষ্ণচোখা মেয়ে এসে লিজাভেটাকে একটুকরা চিঠি দিলো। লিজাভেটা দোকানের 'বিল' ভেবে খাম খুলতেই হঠাৎ হারমনের হাতের লেখা দেখলো।

"দেখো, ভুল করেছো তুমি, এটা আমার জন্য নয়।"

"হ্যাঁ, আপনারই"—জবরদস্ত মেয়েটি লেগে রইলো, শয়তানির হাসিটুকুও ঢাকতে পারলো না, "দয়া ক'রে পড়বেন একবার।"

লিজাভেটা চিঠিটার দিকে একবার চোখ ফেললো: হারমন একবার দেখা করতে চেয়েছে।

"অসম্ভব"—এই দাবীর হঠকারিতা ও তার পন্থা নিয়োগের রূপ দেখে সে ভয় পেয়ে গেছে। "নিশ্চয়ই আমাকে লেখা না" এই বলেই সে চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো।

"আপনার জন্যই যদি না হবে, তাহলে ছিঁড়লেন কেন!"—মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, "যিনি পাঠিয়েছেন তার কাছেই ফেরৎ দিতাম।"

"দেখো,"—লিজাভেটা মেয়েটির খোঁচায় রেগে উঠে বললো,—"ভবিষ্যতে কক্ষণো

কোনো কিছুই এনো না আমার কাছে বলে রাখছি। আর, বোলো তোমার ভদ্রলোককে যে তার লজ্জিত হওয়া উচিত।"

কিন্তু হারমনও ফিরবার পাত্র নয়। যেমন ক'রেই হোক লিজাভেটা প্রত্যেক দিনই তার কাছ থেকে এক একটা চিঠি পেতে লাগলো। এখন আর জার্মান থেকে অনুবাদ নয়; হারমন নিজেই লিখছে। তার প্রেমের উদ্দীপনায় নিজের বুক থেকেই নতুন এক একান্ত আপনার ভাষা বেরিয়ে এলো,—কামনার তীব্র দাহন আর অসংযত স্বপ্নের বিশৃঙ্খলা সেখানে। লিজাভেটা এখন আর চিঠি ফেরৎ দেবার কথা ভাবেও না। এবং তার চিঠিও ক্রমেই দীর্ঘ ও নরম হয়ে এলো। শেষ পর্যন্ত সে জানলা দিয়ে তাকে এই চিঠিটা ছুঁড়ে দিলো: "আজ রাতে 'বলনাচ' আছে—বৈদেশিক মন্ত্রীদের ওখানে। দুটো পর্যন্ত থাকবো সেখানে। আমাকে একা পাবার সুযোগ দিচ্ছি। কাউণ্টেস বেরিয়ে গেলেই চাকরেরা সম্ভবতঃ নিজ নিজ ঘরে চ'লে যাবে। হলঘরের চাকরটা থাকবে শুধু, সাধারণতঃ, সে অবশ্যি হল থেকে দূরেই একটা ঘরে ব'সে থাকে। সাড়ে এগারটার সময় এখানে এসো, সোজা উপরে যাবে। কারো সংগে দেখা হয় যদি জিজ্ঞেস কোরবে—কাউণ্টেস বাড়ী আছেন কিনা? তিনি অবশ্য বাড়ী থাকবেন না,—যদি থাকেন সে অবস্থায় অগত্যাই তোমাকে চলে যেতে হবে, কিন্তু যতদূর সম্ভব কাউকেই দেখবে না তুমি। ঝিরা সাধারণত, চাকরদের হলঘরেই পোড়ে থাকে। দোতালায় উঠে বাঁ মোড় নেবে, সোজা চলতে থাকবে—যে পর্যন্ত না কাউণ্টেসের শোবার ঘরে এসে পড়ো। দুটো পরদার পেছনে দুদিকেই দুটো দরজা আছে। ডানপাশেরটা ছোট একটা পড়ার ঘরের দিকে,—কাউণ্টেস জীবনেও তা ব্যবহার করেন নি; বাঁ পাশেরটা বারান্দার মুখে—সেখানে দেখবে মোড়ানো একটা সিঁড়ি চলে গেছে,—তারপরেই আমার ঘর।"

নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষায় হারমন অস্থির বাঘের মত এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো। দশটার সময়ই সে কাউণ্টেসের বাড়ীতে এসে গেছে;—ভয়ানক দুর্যোগ-রাত বাতাসের গর্জন, স্তরে স্তরে তুষার পড়ছে, রাস্তার আলোগুলি নিভে নিভে জ্বলছে, পথে কোনও লোকজন নেই। মাঝে মাঝে দু একজন শ্লেজ চালক অনেক রাতের

ভাড়া খুঁজে ঘোরা ফেরা করছে। হারমন শুধু কোট গায়ে দিয়েই দাঁড়িয়ে,—হিমেল বাতাস ও তুষার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই তার। শেষ পর্যন্ত কাউণ্টেসের গাড়ী এসে গেলো। হারমন দেখলো, দুটো চাকর তার দুদিকে দু হাত ধরে নিয়ে আসছে; গায়ে একটা স্যাব্‌লের পশমী কোট; পিছু পিছু পাতলা ক্লোকে দেহ জড়ানো পরিচারিকা মেয়েটি —চুলে তাজা ফুলের একটা গোছা। নরম তুষারের উপর দিয়ে চাদর বিছিয়ে দেওয়া হলো এবং তার উপর দিয়ে কাউণ্টেস চলে এলেন। একটা চাকর এবার ঘরের দরজা বন্ধ করলো: জানলার আলোও নিভে গেলো। নির্জন বাড়ীটার সামনে হারমন একেলা পাইচারী করছে। ঘড়ি দেখবার জন্য রাস্তার একটা পোষ্ট ল্যাম্পের কাছে গেলো সে,—এগারটা বেজে দশ। বাতিটার ওইখানেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো সে হাতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে—মিনিট কটা পেরিয়ে যাবার অধৈর্য প্রতীক্ষায়। সাড়ে এগারোটা বাজতেই হারমন কাউণ্টেসের ঘরের দরজা-মুখের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল-করা একটা মস্তো হলঘরে এসে পড়লো। কেউ নেই। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে সে সামনেই দেখলো: একটা চাকর দাগধরা একটা আরাম কেদারায় শুয়ে আছে। পা টিপে টিপে হারমন তার পাশ কেটে গেলো। নাচঘর ও বৈঠকখানা ভরা অন্ধকার,—শুধু মাত্র সিঁড়ির মুখে ছোট্ট একটা বাতির ক্ষীণ আলো। কাউণ্টেসের শোবার ঘরে এলো হারমন। বেদীর সামনে প্রাচীন এক মূর্তি আর একটা মূর্তির হাতে-ধরা সোণার দীপদানিটা জ্বলছে। ঘরটায় ভিড় করে আছে অনেক রঙ্‌ফ্যাকাসে আরাম কেদারা। পালকের গদীআঁটা পালংক, সোণার কাজকরা শোফাগুলি দেয়ালের সামনে নীরব গাম্ভীর্যে দাঁড়িয়ে; দেয়ালে চীনদেশী ওয়ালপেপার লাগানো, সেখানো টাঙানো দুটো তৈলচিত্র,—শিল্পী মাদাম লেব্রুঁ। আঁকা প্যারিসের একখানা বেশ শক্তিমান পুরুষের,—লালচে গাল, উজ্জ্বল সবুজ একটা তারা-খচিত ইউনিফর্ম পরা। অপরটী একটি যুবতী মেয়ের, নাকটি বাঁকা, প্রসাধন মাথা চুলে একটি লাল গোলাপ, চুলটা দুপাশে গালের দুটি টোলের উপরে টেনে আনা। ঘরের প্রত্যেকটি কোণে চিনে-মাটির এক একটি মেষপালিকা মেয়ের মূর্তি; হিরযের বিখ্যাত দেওয়াল-ঘড়ি, ছোট ছোট বাক্স, মেজেতে লুডুর কোট আঁকা. এবং মেয়েদের বিচিত্র রকম খেলার জিনিষ—সবই গত শতাব্দীর শেষ দিকে

জোগাড় করে রাখা; আরও একটা গ্লোব ও সম্মোহিনী চুম্বক। হারমন পর্দার ওদিকে গেলো; ডানদিকে একটা দোর পড়ার ঘরের মুখে—বাঁ দিকেরটা একটা বারান্দার দিকে। হারমন দোরটা খুলে সামনে দেখতে পেলো,—সরু একটা ঘুরোনো সিঁড়ি লিজাভেটার শোবার ঘরে চলে গেছে। মোড় ফিরে সে তখন পড়ার ঘরে এলো।

ধীরে অতি ধীরে সময় যাচ্ছে। শান্ত স্তব্ধ সব। বৈঠকখানার ঘড়িতে বারোটা বাজলো। একে একে প্রত্যেক ঘরের ঘড়িতেই বারোটা ক'রে শব্দ হ'লো। তারপর, ফিরে আবার সব নিস্তব্ধ নীরব। ঠাণ্ডা 'স্টোভ'এর পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো হারমন। সমান তালে বুক তার কাঁপছে—সে যেনো বিপজ্জনক একটা অযথা অভিযানে এসেছে। ঘড়িতে বাজলো একটা, তারপর দুটো; সেও গাড়ীর দূর-শব্দ শুনতে পেলো। ইচ্ছাকে ডিঙিয়ে একটা উত্তেজনা তাকে অভিভূত ক'রে রেখেছে। গাড়ীটা দোর পর্যন্ত এসে থামলো। এবার সে বেশ শুনতে পাচ্ছে কেমন ক'রে একটা কার্পেট তুষারের উপর দিয়ে বিছিয়ে রাখা হলো; বাড়ীর মধ্যে লেগে গেলো তাড়াহুড়া, চাকরটাও দৌড়ে এলো, চারদিকে অনেকের গলার আওয়াজ, আলো জ্বলে উঠলো উপরে। তিনটি পরিচারিকা কাউণ্টেসকে ধ'রে ধ'রে নিয়ে এল শোবার ঘরে। এসেই তিনি আধমরার মতো একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। হারমন এদিকে দরজার একটা ফাঁক দিয়ে দেখছে সব। লিজাভেটা তার কাছ দিয়েই চলে গেলো। ঘোরানো-সিঁড়ি দিয়ে সে যে দৌড়ে উপরে উঠছে—স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে হারমন। একটা ক্ষীণ ব্যথা তার বুকের মধ্য দিয়ে ঝিলিক দিয়ে উঠলো,—কিন্তু এদিকে তার কোনো খেয়ালই নেই। হঠাৎ বিস্ময়ে সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

আয়নার সামনে কাউণ্টেস পোশাক খুলতে সুরু করেছেন। পরিচারিকারা তার টুপী ও পরচুলা খুলে নিলো। এবার বেরিয়ে পড়লো তার খাটো-কাটা ধূসর চুল। সেফটিপিনগুলি চারধারে ঝুর ঝুর ক'রে ঝ'রে পড়লো; রূপোলি কাজ-করা হলদে গাউনটা খোলা হ'লে সেটা তার পায়ের উপর জড়ো হ'য়ে পড়লো। তার প্রসাধনে এই বিরক্তিকর ফর্দই লক্ষ্য করছিলো হারমন। কাউণ্টেস এবার পরলেন পাতলা একটা

ড্রেসিং জ্যাকেট ও হালকা নৈশ টুপী। এই পোশাকেই তাকে মানিয়েছে তবু। এবারই বরং তাকে কতকটা কম জঘন্য ও কম ভয়ানক দেখাচ্ছিলো। প্রায় বুড়োদের মতই কাউন্টেস রাতে ঘুমুতে পারেন না। পরিচারিকাদের ছুটী দিয়ে তিনি একটা আরাম কেদারায় ব'সে পড়লেন। মোমবাতি সব নিভে গেছে, বেদী-মূর্তিটার কাছ থেকেই ক্ষীণ আলো আসছে ঘরে। কাউন্টেস যেনো রুগ্ন-ফ্যাকাশে হ'য়ে পড়েছেন,—অবশ ওষ্ঠ কুঞ্চিত হয়ে কাঁপছে, এপাশ ওপাশ কচ্ছেন তিনি। নিষ্প্রভ চোখ তার একান্ত উদাসীন, দৃষ্টিহারা। তার দিকে চেয়ে যে কোনো কারোর মনে হতে পারতো যে স্বতই তিনি এপাশ-ওপাশ করছেন,—সেখানে তার ইচ্ছার কোনো যোগমাত্রও নেই।

তার অনুভূতিহীন মুখের উপরে সহসা একটা অদ্ভুত অবর্ণনীয় পরিবর্ত্তন এলো। ওষ্ঠ নড়তে নড়তে থেমে গেলো, চোখদুটো চমকে উঠ্লো,—অদ্ভুত একটি লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে।

"ভয় নেই, ভগবানের নাম করে বলছি, কোনো ভয় নেই।"—শান্ত বিশ্বস্ত গলায় বললো সে—"কোনো ক্ষতি কোরবোনা আপনার ; শুধু একটা অনুগ্রহ চাইতে এসেছি।"

বৃদ্ধাটি নিঃশব্দে তার দিকে বিস্ময়ের মতো তাকিয়ে রইলেন,—যেনো কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। কানে কম শোনেন ভেবে হারমন মাথা নুইয়ে তার কানের কাছেই ঐ কটি কথা ফিরে বললো, কিন্তু তবুও কাউন্টেসের কোনো সাড়া নেই।

"আপনি আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারেন"—হারমন ব'লে চললো।—"আপনার কোনোই পরিশ্রম নেই, অথচ সমস্ত জীবন ভ'রে আমাকে সুখী করতে পারেন। আমি জানি,—আপনার জানা আছে পর পর তিনটে তাস......"

হারমন দম নিল। কাউন্টেস যেনো এবার বুঝেছেন—তার কাছে কি চাওয়া হ'চ্ছে এবং উত্তর দেবার জন্য কথা যেনো তার ওষ্ঠে এসে নড়ে উঠলো।

শেষে এবার কাউন্টেস বললেন—"ঠাট্টা, নিশ্চয়ই কেউ ঠাট্টা করেছে!"

"না, মোটেই ঠাট্টা নয়।"—হারমন রাগের সংগেই বললো,—"চ্যাপ্লিট্স্কিকে কি ভুলে গেছেন আপনি,—যার হেরে যাওয়া সমস্ত টাকা আপনিই পাইয়ে দিয়েছিলেন—?"

কাউন্টেস স্পষ্টতই এবার ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত দেহেই যেনো একটা তীব্র আবেগের উত্তেজনা, কিন্তু তক্ষনি তিনি আবার বিমূঢ় অবস্থায় ফিরে এলেন।

"আমাকে ব'লে দেবেন কি সেই বিজয়ী তাস তিনটা কি কি?"—হারমনের গলায় যেনো দাবীর জোর।

কাউন্টেস নীরব। হারমন ব'লে চললো :—

"কার জন্য এই গোপন টুকু পাহারা দিয়ে ফিরছেন আপনি? আপনার নাতিদের জন্য? তারা বেশ রকম ধনী, দেখতেই পাচ্ছেন, জানেনা তারা টাকার কি দাম। বদখরচী লোককে কী হবে আপনার টাকা দিয়ে? যে লোক বাপের সম্পত্তি উড়িয়ে দেয় শেষে সে না খেয়ে মরবেই,—ধাপ্পাবাজিতেই হোক বা আর যা থেকেই হোক। আমি অমিতব্যয়ী না; টাকার কদর বুঝি। আপনার তাস তিনটা আমার কাছে এসে মাঠে মারা যাবে না, তাহ'লে আপনি···"

থামলো সে, এবং রাগে রাগে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলো।

"কাউন্টেস তবুও নীরব। হারমন তার সামনে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করলো।

"কাউকে যদি আপনি কখনো ভালো বেসে থেকেন"—অনুনয় করতে লাগলো হারমন, "—সুখের দিনের যদি কোনো কথা মনে থাকে, নবজাত শিশুর কান্না শুনে যদি কখনো কোনোদিন খুসী হ'য়ে থাকেন—যদি কখনো কোনো মানুষের দুঃখ আপনার প্রাণকে স্পর্শ ক'রে থাকে,—তাহ'লে আপনার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কচ্ছি আমি তাদেরই নাম নিয়ে। স্ত্রী, কর্ত্রী, বোন, মা—আপনার জীবনের সমস্ত পবিত্র কিছুর নাম নিয়েই বলছি—আমার প্রার্থনা ফিরিয়ে দেবেন না; গোপন সন্ধানটি আমাকে বলে দিন······বোধ হয় কোনো একটা ভয়ানক কিছুর সংগে এটা অচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো —হয়তো বা মুক্তির বিনিময়ে—হয়তো শয়তানের সংগে আপনার একটা গোপন সন্ধি ······কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনি বুড়ো, বেশী দিন আর বাঁচবেন না—আপনার সমস্ত পাপ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। বুঝতে পারছেন? আপনার হাতের মুঠোতে একটা লোকের জীবনের সমস্ত সুখ; আমার কেন, আমার সন্তানেরা, আমার নাত্‌নাত্‌নীরা,

তাদের বংশধরের পর্যন্ত বংশে বংশে আপনার স্মৃতিকে ধন্যবাদ জানাবে, পবিত্র ব'লে মাথায় তুলে রাখবে……"

কাউণ্টেসের মুখে সাড়া নেই।

হারমন উঠে এবার দাঁড়ালো।

"তুমি জঘন্য, ডাইনী বুড়ী!"—দাঁত কড়মড় করে বললো সে—"এখনি আমি দেখাচ্ছি তোমাকে!"

সংগে সংগেই পকেট থেকে সে একটা রিভলবার টেনে বের করলো। রিভলবার দেখে কাউণ্টেস ফিরে আবার কেমন হ'য়ে পড়লেন। মাথাটা শুদ্ধ পেছনে ঝুঁকিয়ে আত্মরক্ষার জন্য হাত দুটো একবার উপরে তুললেন এবং তারপরেই অজ্ঞান হ'য়ে এলিয়ে পড়লেন পেছনে।

"রাখো তোমার খুকীপনা!"—হারমন তার হাত ধরে ঝাঁকানি দিলো,—"শেষবার ফিরে চাচ্ছি আমি। বলবে কি,—না? বলো, তিনটা বিজয়ী তাস কি কি?"

কাউণ্টেন কোনো উত্তর দিলো না। হারমন দেখলো, ম'রে গেছে সে।

(৪)

লিজাভেটা আইভানাভানা এখনো তার বল-ড্রেস খোলেনি, তার ঘরে ব'সে সে ভাবনায় ডুবে আছে, বাড়ী এসেই সে তার পরিচারিকাকে তাড়াতাড়ি ছুটি দিলো এবং নিজে নিজেই পোশাক ছেড়ে নেবে ব'লে উপরের ঘরে উঠে এলো;—তখন তার মধ্যে হারমনকে দেখতে পাবার একটা প্রতীক্ষা,—তবু যেনো ভরসা হচ্ছিলো যে এখানে সে থাকবে না। একবার চোখ ফেলেই সে নিশ্চিত হোলো: সে নেই,—এবং যে দুর্ঘটনার কৃপায় তদের সাক্ষাৎ হোলোনা বার বার তাকে সে ধন্যবাদ জানালো। একটা চেয়ারে ব'সে পড়ে লিজাভেটা সমস্তই ভাবতে চেষ্টা করলো:—এই

অল্প ক'য়েক দিনের মধ্যে কতো ঘটনা যে ঘটে গেছে, এবং ইতিমধ্যেই সে তাকে এতোদূরে নিয়ে এসেছে! তিন সপ্তাহ ও যায়নি বলতে—এই তো সেদিন জানালা দিয়ে সে যুবকটিকে প্রথম দেখেছিল। তারপরেই চিঠিপত্র আদান-প্রদান এবং সে তাকে এমন হাত ক'রে নিলো যে গভীর রাতে তাদের দুজনার দেখা করার কথা পর্যন্ত লিজাভেটা নিজেই তাকে লিখেছে! হারমনের চিঠির স্বাক্ষর দেখে সুধু তার নামটাই মাত্র জানে সে, তার সংগে একবার কথাও পর্যন্ত বলেনি, তার গলাও শোনেনি কখনো, এবং আজ এই সন্ধ্যা পর্যন্তও কোনো লোক কখনো তার কথা উল্লেখও করেনি। অথচ কী অভাবিত যোগাযোগ! সেদিন সন্ধ্যায় 'বলের' আসরে প্রিন্সেস পলিনা আর কারো সংগে বেশ জমিয়ে নিচ্ছে দেখে টমস্কি বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে লিজাভেটাকে নিয়ে নাচলো বহুক্ষণ পর্যন্ত। ইঞ্জিনিয়ার অফিসারটির উপর লিজার দরদের জন্য টমস্কি তাকে নাচের সময় ঠাট্টা করতেও ছাড়েনি এবং নিশ্চিত ক'রেই জানিয়েছে যে তার নিজের প্রসংগে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী খবর রাখে টমস্কি। এমনকি তার কয়েকটা ইংগিত ও ঠাট্টা এতো লাগ-সই হ'য়ে গেলো যে লিজাভেটা বারবার ভাবলো, নিশ্চয়ই তার সব গোপন কথা জানে সে।

"কে বললে আমাকে?"—হেসে জিজ্ঞেস করলো লিজাভেটা।

"তোমার জানা কোনো ভদ্রলোকের এক বন্ধু।"—টমস্কি উত্তর দিলো,—বেশ চমৎকার মানুষ!"

"কে চমৎকার মানুষ?"

"নাম তার হারমন।"

লিজাভেটা কোনো উত্তর দিলো না, হাত পা যেনো তার হিম-অবশ হ'য়ে এসেছে।

"হারমন"—টমস্কি বলতে লাগলো—"সত্যিকার রোমান্টিক সে! দেখতে নেপোলিয়ন কিন্তু অন্তরে মেফিস্টোফেলিস; যে কোনো অপরাধই করতে পারে সে। ইস্ কী রকম ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছ তুমি!"

"মাথাটা কামড়াচ্ছে কিনা·· আচ্ছা হারমন···বা যে নামই হোক না, কি বললো আপনাকে?"

"হারমন তার বন্ধুর উপরে মোটেই খুসীনা। তার মতে, এই অবস্থায় সে অন্য কোনো পথ নিতো। মনে হচ্ছে, তোমাকে নিয়ে তার আর কোনো রকম অভিসন্ধি র'য়েছে ; যে ক'রেই হোক, চোখ কান বুঁজে সে তার বন্ধুর হতাশ প্রণয়ের গোপন প্রলাপ শুনে যায় শুধু।"

"কিন্তু কোথায় সে আমাকে দেখলো ?"

"গির্জায়, রাস্তায়—ভগবানই জানেন কোথায় ? তোমার নিজের ঘরেই হয়তো—যখন ঘুমিয়ে ছিলে।"

আলোচনা ক্রমেই লিজাভেটার কাছে, যন্ত্রনাময় আকর্ষণের মতো হয়ে উঠছিল ;—ঠিক তখনই তিনটি মহিলা এলেন, এবং আলোচনাও বন্ধ হোলো। তাদের মধ্যে একজন কিন্তু প্রিন্সেস পলিনা নিজেই। সে টমস্কির কাছে সব বুঝিয়ে বললো। টমস্কি এবার যখন লিজাভেটার কাছে এলো—তখন সে লিজাভেটা বা হারমন কারো কথাই ভাবছে না আর। লিজাভেটার ফিরে সেই আলোচনা করার খুবি ইচ্ছা কিন্তু তখন নাচ শেষ হয়ে গেছে এবং পরক্ষণেই কাউণ্টেসও বিদায় নিলেন।

টমস্কির সবকথা হয়তো নাচঘরের খোসগল্প ছাড়া বেশী কিছু না, কিন্তু নতুন স্বপ্নে অধীর এই তরুণীর বুকের মধ্যে তা যেনো বাসা বেঁধে রইলো। টমস্কির কথার সব ছবি তার মনের উপরে এবার আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্লো। হারমনের সেই সাধারণ মুখখানাই তাকে যেনো বিমূঢ় করে রাখলো। নগ্ন হাত ছুটি বুকের উপর রেখে সে বসে রইলো শুধু, মাথাটা ঝুকে পড়েছে তার খালি বুকের উপর চুলের মধ্যে তখনো সেই ফুলগুলি। হঠাৎ দোরটা খুলে গেলো,—ঢুকলো এসে হারমন। লিজাভেটা চমকে উঠ্লো।

"কোথায় ছিলে তুমি ?"—ভয়ের মতোই সে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো। "কাউণ্টেসের শোবার ঘরে"—হারমন উত্তর দিলো—"এক্ষণি আমি সেখান থেকে আসছি, মরে গেছেন কাউণ্টেস।"

"মরে গেছেন, ওঃ। বলছো কি তুমি ?"

"মনে হচ্ছে, আমিই তার মৃত্যুর কারণ।"—হারমন এটুকুও যোগ ক'রে দিলো।

লিজাভেটা তার দিকে পাষাণের মতো তাকিয়ে রইলো শুধু। টমস্কির শেষ কথাটা তার বুকের মধ্যে যেনো চমকে উঠ্‌লো—

হারমন তার পাশে জানালায় বসে সমস্ত কথাই খুলে বললো।

লিজাভেটা ভয় নিয়ে সব শুনে গেলো। তা হ'লে তার সমস্ত আবেগ-ছাপা চিঠি,—আকুতিভরা অনুনয়, তার জবরদস্ত লেগে-থাকা কিছুই তা হলে প্রকৃত নয়! হারমনের প্রাণ শুকিয়ে আছে টাকার জন্যই! লিজাভেটার দশা তখন,—ডাকাতের হাতের একটা অন্ধ যন্ত্রের মত,—তারি মিষ্ট্রেস-ঘাতকের হাতের! লিজাভেটা উচ্ছ্বসিত আবেগে শুধু করুণ ভাবে কাঁদতে লাগল। হারমন নীরবে তার দিকে তাকিয়ে আছে; তার প্রাণেও যেনো ছিঁড়ে যাচ্ছে—অবশ্যি মেয়েটির ব্যথায় না, লিজাভেটার দুঃখ মোটেই লাগেনি তাকে। বুড়ীর মৃত্যুর জন্যও কণামাত্র আফশোষ নেই তার; একটা মাত্র ব্যাপারে সে বিমূঢ় হয়ে গেছে ঃ—যার সাহায্যে তার বড়োলোক হবার আশা ছিলো—চিরদিনের মতোই সে চলে গেলো।

"তুমি ডাকাত!—লিজাভেটা শেষ পর্যন্ত এইটুকুমাত্র বলতে পারলো।

"তার মৃত্যু চাইনি আমি,"—হারমন উত্তর দিলো—"রিভলবার আমার খালিই ছিলো।"

দুজনেই এবার নীরব।

ভোর হয়ে গেছে। লিজাভেটা চঞ্চল আলোটাকে নিভিয়ে দিলো; জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে এসেছে মলিন একটা আলো। অশ্রুভিজা চোখ দুটি মুছে সে হারমনের দিকে তাকালো। হারমন জানালার ওখানে বুকের উপর হাত ভাঁজ ক'রে বসে আছে, চোখে কঠিন ভ্রূকুটি। এই অবস্থায় নেপোলিয়নের চিত্রের সংগে তার অপূর্ব সাদৃশ্য। লিজাভেটা তাকিয়ে না থেকে পারলোনা।

শেষে জিজ্ঞেস করলো সে—"কেমন ক'রে বেরুবে বাড়ী থেকে? তোমাকে আমি একটা গোপন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু কাউণ্টেসের শোবার ঘর পেরোতে কিছুতেই সাহস হচ্ছেনা।"

"কোথায় সিঁড়িটা বলো, নিজেই খুঁজে নিচ্ছি।"

লিজাভেটা উঠ্‌লো, দেরাজ থেকে চাবি নিয়ে বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে হারমনের

হাতে দিলো। হারমন তার হিম নিস্পন্দ হাত ধরে একবার চুমো খেয়ে চলে গেলো।

মোড়ানো সিড়ি বেয়ে নেমে আর একবার কাউণ্টেসের শোবার ঘরে চোখ ফেললো সে। বুড়ী শক্ত হয়ে সোজা বসে আছে, তার মুখের ভাব সম্পূর্ণই শান্ত। হারমন তাকে দেখবার জন্য দাঁড়ালো—মারাত্মক সত্যটাকে নিজে ঠিক করে বুঝে নিতে চায়। শেষে পড়ার ঘরে এলো সে, হাতড়ে নিলো দোরটা। অদ্ভুত ভাবনা আর বিচিত্র অনুভূতিতে সংক্ষুব্ধ হয়ে একটা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো সে। "এই সিঁড়ি দিয়েই"—সে ভাবতেছিলো, "ষাট বছর আগে হয়তো একজন তৃপ্ত প্রেমিক এই একই ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে যাচ্ছিলো,—হয়তো ঠিক এমনি সময়ই। সে এক সুন্দর প্রেমিক—নিশ্চিতই বিচিত্র-কাজ করা কোট তার গায়ে,—রাজকীয় ভংগীতে তার কেশ-বিন্যাস, তিন-কোথাকার টুপি নেমে এসেছে বুকের উপরে। আর এখন, কোন কবরের তলায় তার অস্থিগুলি পচে ক্ষয়ে যাচ্ছে,—আর এদিকে তার বর্ষিয়সী প্রণয়ীর বুকের স্পন্দনও থেমে গেলো!

(৫)

সেই ভয়ানক রাতের পর তৃতীয় দিনে ভোর নটায় হারমন রওনা হলো—গির্জার দিকে। সেখানে কাউণ্টেসের সৎকার হবে। যদিও গত ঘটনার জন্য সে মোটেই অনুশোচনা অনুভব করেনি, তবু বিবেকের এই বাণী তাকে বার বার খোঁচা দিচ্ছিলো :— "তুমিই বুড়ীকে খুন ক'রেছো।" ধর্ম-বিশ্বাস নেই ব'লে হারমন বরং অন্ধবিশ্বাসী : বুড়ী কাউণ্টেস তার জীবনে একটা কুনজর ফেলে থাকবে—এই ভেবে সে স্থির করলো যে তার সৎকারে যোগ দেবে ও নিজের অপরাধের জন্য একান্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

গির্জায় ভরা লোক; হারমন কষ্টে স্বষ্টে ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে নিলো। কারুকাজ করা একটা মঞ্চের উপর শবাধারটা স্থাপিত,—উপরে ভেলভেটের চন্দ্রাতপ। বৃদ্ধার গায় একটা শাদা গাউন, মাথায় ফিতেয়ালা টুপি, হাত দুটি বুকের উপর ভাঁজ করা। চারপাশে ঘিরে আছে তার আপন সব জন ও চাকর বাকর; শেষের দল কালো পোষাক পরা, হাতে মোমবাতি। কাউণ্টেসের আত্মীয় সবাই গভীর শোকের পোশাক পরা—ছেলে মেয়ে, নাত নাত্‌নী—তাদের সন্তান সন্ততি সব। কারো চোখেই কিন্তু জল নেই,—কেউই তার মৃত্যুতে আঘাত পায়নি। কারণ, কাউণ্টেস একেবারেই বুড়ী, আত্মীয়েরা অনেকদিন থেকেই তাকে দেখে আসছে পরপারের যাত্রীর মতো। যুবক একজন পাদ্রী সৎকারের মন্ত্র পাঠ করলেন। সহজ ও সংক্ষিপ্ত প্রাণস্পর্শী ভাষায় তিনি এই পবিত্র মহিলার শান্তিময় মৃত্যুর কথা বললেন।

সমস্ত দীর্ঘ জীবনই কাউণ্টেস ধার্মিক খৃষ্টানের মতো শেষ পরিণতির পথে নম্র-নীরব আয়োজনে এগিয়ে এসেছেন। "মৃত্যুর দেবদূত"—বক্তৃতার উপসংহারে বললেন তিনি—"তার শুভ-সন্ধানের পথে আজ শেষে তাকে তুলে নিলেন অন্ধকারের রাজার কাছে।" নিঃশব্দ সমারোহে সৎকার-সমাধি শেষ হোলো। সবার আগে আত্মীয়েরাই মৃতদেহের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন; তারপর বন্ধু বান্ধবের দল,—এই সামাজিক সমারোহের ঘোরপাকের মধ্যে তারা একবার তাঁর কাছে মাথা নোয়াবারই সুযোগ পেয়েছে মাত্র। এবার ঘরের ঝি-চাকরের পালা; তাদের মধ্যে দুজন কাউণ্টেসকে ধ'রে ধ'রে ঘরের মধ্যে বেড়িয়ে নিতো। একজন শবটির হাতে বিদায়-চুম্বন দেবার কালে চোখের জল ফেললো দুএক ফোঁটা, আরজনে কিন্তু এতোটা অভিভূত হয়নি। হারমনের এবার সংকল্প: শবাধারের সামনে এগোবে সে। পাইনের ডালপাতা ছড়ানো ঠাণ্ডা মেজেতে বুক রেখে নিঃশব্দে প'ড়ে রইলো সে। শেষ পর্যন্ত যখন উঠলো—মৃত বৃদ্ধার মতোই ফ্যাকাশে তার মুখ। বেদীর সিঁড়িটার কাছে গিয়ে সে শব-দেহটির উপর নুয়ে পড়লো। কাউণ্টেস যেনো তার দিকে বিদ্রূপ ভরা একটা চাউনি ফেললো ও এক চোখ দিয়ে পিট্‌ পিট্‌ ক'রে তাকাতে লাগলো। হারমন তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যেতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মেজের উপর। কে যেনো তাকে ধ'রে তুললো। ঠিক এই মুহূর্তেই লিজাভেটাকেও অজ্ঞান

অবস্থায় বাইরে নেওয়া হোলো। এই ব্যাপারটাতে কিছুক্ষণের জন্য এখানকার গম্ভীর-শান্ত আবহাওয়ার মধ্যেও অস্থিরতা জেগে রলো। তখন ভিড়ের মধ্যে একটা গুঞ্জন শোনা গেলো। একজন কিযাণ-কঞ্চুকী, মৃত কাউণ্টেসের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়,—তার পাশের একটি ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছে ফিস-ফিস্ ক'রে বলছিলেন যুবক অফিসারটি আসলে কাউণ্টেসের একটি গোপন সন্তান। শুনে ভদ্রলোকটি উদাসীন ভাবে বললেন—"তা' হবে!"

সমস্ত দিনই হারমন ঘুরে কাটালো পাগোলের মতো। প্রায়-নির্জন একটা সরাইতে গিয়ে খেলো সে অভ্যাসের বিরুদ্ধেই পূরো এক বোতল—ভেতরের অস্থির অশান্তি ডুবে যাবে এই ভরসায়। কিন্তু সুরায় তার ভাবনা আরো জ্বলে উঠ্‌লো। বাড়ী ফিরেই সে বিছানায় গিয়ে সটান শুয়ে পড়লো, পোশাকও খুললো না,—গভীর ঘুমে একেবারে মড়ার মতো পড়ে রইলো সে।

মাঝ রাতে হঠাৎ সে জেগে উঠ্‌লো; জানালা দিয়ে আসছে চাঁদের আলো। হাত-ঘড়িতে তিনটে বাজতে পনেরো। বিছানায় উঠে ব'সে সে বৃদ্ধা কাউণ্টেসের কবরের কথা ভাবতে লাগলো। ঠিক সেই মুহূর্তেই কে যেন তার জানালার বাইর দিয়ে একবার উঁকি মেরে স'রে গেলো। হারমন বিশেষ একটা লক্ষ্য করলো না। কিন্তু এক মিনিট না যেতেই কে যেনো খুললো বাইরে ঘরের দরজা। হারমন ভাবলো: তার আরদালিটা প্রায় রোজই মাতাল হ'য়ে খুব রাত ক'রে বাড়ী ফেরে,—আজো এসেছে! কিন্তু না, কানে যেনো লাগছে এক জোড়া অপরিচিত পায়ের শব্দ, পোশাকের নরম খস্‌খসানি! ঘরের দোরটা এবার খুলে গেলো ও শাদা পোশাকে একজন মেয়েলোক এসে ঢুকলো; হারমন ভাবলো, তার নার্স; অথচ বিস্ময়ও লাগছিলো যে, এতো রাতে কেন? মেজের উপর দিয়ে নরম পায়ে মেয়েলোকটি আরো এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ালো। সেই কাউণ্টেস!

"আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তোমার কাছে এসেছি"—স্থির গলায় তিনি বলতে লাগলেন—"তোমার প্রার্থনা পূরণ করবার আদেশ হ'য়েছে আমার উপর। তিরি, সাতা, টেক্কা—এই তিনটি বিজয়ী তাস,—শুধু একখানা ক'রে মাত্র ধরবে এবং জীবনে কখনো আর খেলবে না। আমার মৃত্যুর জন্য ক্ষমা কচ্ছি তোমাকে,—পারো তো আমার পরিচারিকা লিজাভেটা আইভানাভানাকে বিয়ে ক'রো।"

ব'লেই তিনি শান্ত ভাবে ফিরে, দোর দিয়ে মিলিয়ে গেলেন মর্যাদাময় ভংগীতে। হারমন শুনলো যে বাইরের দোরটা শব্দ ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেলো। এবং আবার কে যেনো জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে গেলো।

ব্যাপারটা সামলে নিতে হারমনের কিছুটা সময় লাগলো। পাশের ঘরে উঠে গেলো সে। মেজেতে আরদালিটা পড়ে ঘুমোচ্ছে, তাকে তুলতে হারমনের বেশ বেগ পেতে হোলো। বরাবরের মতোই লোকটা মদে বুঁদ, কাজেই সে কোনো সঠিক খবর দিতে পারলো না ; বাইরের দোরটা কিন্তু তালা বন্ধই আছে। হারমন তার ঘরে ফিরে একটা মোমবাতি ধরালো এবং স্বপ্নটা লিখতে লাগলো।

(৬)

মনের রাজ্যে কক্ষনো দুটো স্থির বিশ্বাস এক সংগে দাঁড়াতে পারে না,—পদার্থ জগতে যেমন দুটো জিনিষ একসংগে একই স্থানে ও কালে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিরি, সাতা আর টেক্কা এসে শীগগিরি তার মনের মধ্য থেকে কাউণ্টেসের মৃত-মূর্তি মুছে ফেলে দিলো। তার মনে, তার মুখে সর্বদাই তিরি, সাতা আর টেক্কা। একটি তরুণী মেয়েকে দেখে ব'লে উঠ্‌তো সে : "কী চমৎকার দেখতে! ঠিক যেনো চিরতনের তিরি।" কেউ তাকে সময় জিজ্ঞেস করলে সব সময়েই তার এক উত্তর "সাতটা বাজতে পাঁচ", পথে একটি মোটা জালা-পেট লোক দেখলেই তার মনে পড়ে টেক্কা। ঘুমের মধ্যে পর্যন্ত তিরি সাতা, ও টেক্কা তাকে খুঁজে বেড়ায়, আর সবরকম রূপ-রঙ্‌ বদলাতে থাকে। তিরিটা কখনো কখনো গরম দেশের একটা ফুল গাছের মতো ফুটে উঠে, সাতাটা গথিক ভাস্কর্যের অর্ধচন্দ্র তোরণ দ্বারের মতো, টেক্কাটা একটা মস্তো মাকড়! একটি মাত্র চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে,—এতো কিছুর বিনিময়ে যে গোপন সন্ধি সে জেনেছে তাকে প্রাণপণে কাজে লাগাতে হবে। বিশ্রাম কালেও সে স্বপ্ন দেখতে থাকে : প্যারিসের সদর

জুয়োখেলার আড্ডায় সে তার সম্মোহন-করা সৌভাগ্যগুণে হাতে পেয়েছে ইপ্সিত ধনভাণ্ডার। এবার সত্যসত্যই একটা সুযোগ এসে তাকে এই অস্থির অবস্থা থেকে মুক্তি দিলো।

মস্কোতে ধনী জুয়াড়ীদের একটা মস্তো বড়ো আড্ডা বসলো—বিখ্যাত চেকালিনস্কির সভাপতিত্বে,—যিনি তার সমস্ত জীবনই কাটিয়েছেন তাস নিয়ে এবং সময়ে লাখে লাখে আয়ও করেছেন আর কাঁচা টাকাও হারিয়েছেন যথেষ্টই। তার দীর্ঘ-কালের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি বন্ধুদের বিশ্বাস অর্জন করেছেন, খোলা বাড়ী, ভালো খাবার, খোস মেজাজ ও আলাপ-আমোদের জন্য সর্বসাধারণেরও কাছেই তিনি সম্মানিত। ইনিই সেন্ট পিটার্সবার্গে বেড়াতে এসেছেন। তার পিছু পিছু ছুটে চললো তরুণের দল, তাসের ঝোঁকে নাচ, ঘোড়দৌড় কোথায় গেলো তলিয়ে;—প্রণয় কারবারের চেয়ে তাসের নেশায়ই মেতে উঠ্‌লো সবাই, নারুমভ হারমনকে নিয়ে এলো এঁরি কাছে।

জাঁকজমক ভরা বিরাট বিরাট দালানের পর দালান কতো দারোয়ান চারদিকে;—সমস্তই পেরিয়ে এলেন তারা। লোকে লোকারণ্য সেখানে। কয়েকটি জেনারেল, ও প্রিভি-কাউন্সিলর মিলে হুইষ্ট খেলছিলেন; কয়েকজন যুবক বিছানার উপর আলস ভরে শুয়ে সিগ্রেট টানছে। ড্রয়িং-রুমে এক একটা লম্বা টেব্‌ল, চার পাশে জন বিশেক ক'রে খেলোয়াড়; টাকার লেনদেন-এর ভার গৃহস্বামীর উপরে। ষাট্‌ বছর বয়স হ'য়েছে তার। বিশেষ রকম মহিমা-উজ্জ্বল চেহারা, রূপোর মতো সাদা চুল, তার গোল গাল মুখে ভালোমানুষের ছাপ, চোখে সব সময়েই লেগে আছে খুসীর দীপ্তি। নারুমভ এঁর সংগেই হারমনকে পরিচয় করিয়ে দিলো। চেকালিনস্কি তাকে বন্ধুর মতো ভংগীতে হাত ধরে বললেন—'বেশ ভালো ক'রে বসুন!' খেলা চলতে লাগলো। একদানেই পেরিয়ে গেলো অনেকটা সময়। টেবলের উপরে প্রায় ত্রিশটা তাস। চেকালিনস্কি প্রত্যেক চালের আগেই একটু সময় দিতেন—খেলোয়াড়েরা যাতে তাদের মধ্যে হারানো টাকাটার বন্দোবস্ত ক'রে নিতে পারে। অসাবধানতায় হয়তো কোন তাসের কোণ কখন বেঁকে রয়েছে—বিশেষ ক'রে সেদিকে নিখুঁত নজর

তাঁর। শেষ পর্যন্ত এ দান শেষ হোলো। চেকালিনস্কি তাস গুছিয়ে সাফল ক'রে বেঁটে দিলেন। খেলাও আরম্ভ হোলো আবার।

"আমাকে একদান খেলতে দিন,"—হারমন তার কাছের এক ভদ্রলোকের ঘাড়ের উপর দিয়েই হাত বাড়িয়ে দিলেন।

চেকালিনস্কি হাসলেন ও নীরবে মাথা নোয়ালেন,—রাজী আছেন তিনি। নারুমভ হাসতে হাসতে হারমনকে অভ্যর্থনা জানালো,—তার এতোদিনের দীর্ঘ ব্রত এবার ভাঙলো যাহোক্। নারুমভ তা'কে শুভ-আরম্ভের কামনা জানালো।

"ঠিকই জিতবো আমি।"—হারমন বললো ও তার তাসের উপর চক্ দিয়ে দানের টাকার সংখ্যাটা লিখে দিলো।

"কতো ?"—ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন চেকালিনস্কি—" ঠিক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না আমি।"

"সাত চাল্লিশ হাজার।"—হারমনের উত্তর।

এই কথা শুনে সকলেই মাথা ঘুরিয়ে হারমনের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো।

"লোকটা পাগোল হ'য়ে গেলো ?"—নারুমভ ভাবছে।

"বলতে পারি কি, বড্ডো বেশীই ধরে ফেলেছেন !"—চেকালিনস্কি মন্তব্য করলেন ঠিকই তেমনি হাসিমুখেই। "এখানে কেউ কখনো দু'শো পঁচাত্তরের বেশী ধরেনি।"

"বেশ ! আপনি আমার তাস নেবেন কি না ?"—হারমন জিজ্ঞেস করলো, চেকালিনস্কি সম্মতিভরে মাথা নাড়লেন।

"অবিশ্যি, একটা কথা বল্‌তে হচ্ছে আপনাকে।"—তিনি বললেন, "আমার বন্ধুদের বিশ্বাসের খাতিরেই আমি নগদ টাকা ছাড়া খেলা আরম্ভ করতে পারি না। অবশ্যি, আমার দিক থেকে আপনার কথাই সব, কিন্তু খেলার রীতি ও হিসেব বজায় রাখার অনুরোধে আপনার টাকাটা তাসের উপরে রাখলে ভাল হয়।"

হারমন পকেট থেকে একটা ব্যাঙ্ক-নোট তুলে নিয়ে চেকালিনোস্কির হাতে দিল, তিনি তা একবার দেখে হারমনের তাসের উপরে রাখ্‌লেন।

খেলা আরম্ভ হলো। ডানদিকে নকড়া, বায়ে তিড়ি !

"আমারই জিত !"—হারমন তার তাসটা দেখিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল।

খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা অস্থির গুঞ্জন ধ্বনি ; চেকালিনস্কি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, কিন্তু তখনি আবার তার মুখে হাসি ফিরে এল।

"টাকাটা দিয়ে দিচ্ছেন ত এখন ?"—হারমন জিজ্ঞেস করলো।

"সানন্দেই।"

চেকালিনস্কি কয়েকটা ব্যাংকনোট পকেট থেকে তুলে দাবী মিটিয়ে দিলেন। হারমন টাকাটা নিয়ে টেব্‌ল থেকে দূরে সরে এলো। নারুমভ নিজেকে যেন আর সামলাতে পাচ্ছিল না। হারমন এদিকে একগ্লাস লিমনেড খেয়ে রওনা হলো বাড়ীর দিকে।

পরের দিন সন্ধ্যায় আবার সে চেকালিনস্কির ওখানে এসে উপস্থিত। ভদ্রলোকটি সেদিনও খেলার তত্ত্বাবধান কচ্ছেন। হারমন টেবিলের কাছে এগিয়ে আসতেই খেলোয়াড়েরা অমনি সসব্যস্তে জায়গা করে দিলো। চেকালিনস্কি তার দিকে মাথা হেলিয়ে দিলেন বন্ধুর মতো।

হারমন নতুন একটা দানের প্রতীক্ষায় আছে। তার তাসটার ওপর রাখলো সে সাতচল্লিশ হাজার, আর সঙ্গে কালকের জেতা সেই টাকাটা।

চেকালিনোস্কি দান আরম্ভ করলেন। ডানে গোলাম, বায়ে সাতা। হারমনও উল্টে দেখালো—সাতা।

চারিদিকেই বিস্ময়ের ব্যাকুল কোলাহল। চেকালিনোস্কির মধ্যেও যেন অস্থিরতা, তিনি ৯৪০০০৲ গুণে হারমনের হাতে দিলেন। টাকাটা স্থির ভাবে নিয়ে সে চলে গেলো।

পরের দিন সন্ধ্যায় হারমন আবার সেই টেবিলে এসে উপস্থিত। সবাই অস্থির প্রতীক্ষায় ঝুঁকে আছে।. জেনারেলগণ, প্রিভিকাউন্সিলরগণ তাদের হুইষ্ট খেলা রেখে দিয়ে এই আশ্চর্য খেলা দেখতে এগিয়ে এলেন। যুবক অফিসারেরা তাদের আসন থেকে লাফ দিয়ে উঠে এলো। ড্রয়িং রুমে দারোয়ানদেরও ব্যাকুল ভিড়। সবাই এগোচ্ছে হারমনের কাছে। অন্য খেলোয়াড়রা খেল্‌লো না আর,—হারমনের খেলার শেষ পর্যন্ত দেখতে সবাই যেন দম বন্ধ ক'রে আছে। হারমন টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে চেকালিনোস্কির সঙ্গে একাই খেলবে বলে তৈরী হয়ে নিচ্ছে। চেকালিনোস্কি তখনও হাসছেন

তাঁর মুখের রঙ্ যদিও নিভে গেছে। প্রত্যেকেই তাস বেঁটে দিল; চেকালিনোস্কি 'সাফ্‌ল' করে রাখলো। হারমন তার তাস নিয়ে রাখলো টেবিলের উপর—উপরে একতাড়া ব্যাঙ্কনোট। দৃশ্যটা যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানের মতো। একেবারেই নিস্তব্ধ সব।

চেকালিনোস্কি দান দিতে সুরু করলেন। হাত কাঁপছে তাঁর। ডানে বিবি, বাঁয়ে টেক্কা।

"আমার টেক্কাই জিতেছে!"—হারমন তার তাস দেখিয়ে ব'লে উঠলো।

"হেরেছে আপনার বিবি!"—চেকালিনোস্কি মৃদুভাবে বললেন।

হারমন চমকে উঠল; আর সত্য সত্যই তার টেক্কার জায়গায় যে ইস্কাপণের বিবি! নিজের চোখকে যেনো সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেনা—মাথা, ঘুরে গেলই কি করে যে এমন হলো।

ইস্কাপণের বিবিটি ঠিক তার দিকে চেয়েই চোখ পিট্ পিট্ করছে, বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হাসছে। বিস্ময়ের একটা ধাক্কা লাগল তার :—

"এ যে সেই বুড়ী!"—ভয়ে হারমন চীৎকার দিয়ে উঠল।

চেকালিনোস্কি জিতে-নেওয়া নোটতাড়া নিজের দিকে টেনে আনলেন, হারমন নিস্পন্দ নিঃশব্দ।

টেবল থেকে সে যখন চলে এলো—চারদিকেই চাপা কোলাহল। "একদম কিস্তিমাৎ," —খেলোয়াড়রা বলছিলো। চেকালিনোস্কি আবার তাস বাট করলেন। এবং আবার নতুন খেলা শুরু হল।

হারমন পাগল হ'য়ে গেছে। এখন সে আছে আবুট্রাস্কি পাগলা গারদের সতেরো নম্বর ওয়ার্ডে। কোন কথারই জবাব দেয় না সে; সব সময়ই কেবল বিড়বিড় করে,— "তিরি-সাতা টেক্কা! এই তিরি-সাতা বিবি!"

* * *

লিজাভেটা আইভানোভানার বিয়ে হ'ল চমৎকার একজন যুবকের সঙ্গে। ভদ্রলোক কোথাও ভাল চাকরী কচ্ছেন এবং নিজের জমিদারিও রয়েছে; বুড়ী কাউণ্টেসের বিগত দেওয়ানেরই ছেলে সে।

টমস্কির পদোন্নতি হোয়েছে এবং বিয়ে হয়ে গেছে প্রিন্সেস পলিনার সংগেই।

নিকোলাই ভ্যাসিলিভিচ্ গোগোল

(১৮০৯—১৮৫২)

ইনি এক নতুন সাহিত্যযুগের অগ্রদূত। রচনারীতি নিজস্ব,—ভাষা-সৌন্দর্য অনবদ্য বিষয়, বস্তুও সাধারণ এবং অগৃহীত রাজ্য থেকে। রচনা-পরিবেশ রোমান্টিক হলেও প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রাণমূলের সংগে তার নাড়ীর টান, সমাজ-চেতনায় সজাগ। অপূর্ব-অন্বীক্ষা ও অনুভূতির মনিকাঞ্চন যোগে এর রচনা খাঁটি স্বদেশীয় ও জনপ্রিয়। এঁর রচনার মাঝে মাঝে নীলকান্তমণির মতো ঝলমল করে অপূর্ব বাস্তব ছবি,—সমাজ-জীবনের ও রুশীয় পল্লী প্রকৃতির।

এঁর জীবনও বিচিত্র অদ্ভুত। জন্ম পল্টোভাপ্রদেশের সেরোচিন্টস্কিতে, ৩১শে মার্চ, ১৮০৯তে, সম্ভ্রান্ত এক ইউক্রেনীয় কসাক পরিবারে; শিক্ষা-নিঝিন জিমনাসিয়ামে। ১৮২০ এ ইনি পিটার্সবার্গে থিয়েটারে অভিনেতারূপে স্থান নিতে চেষ্টা করে বিফল হন। ১৮২১ এ ইনি কেরাণীগিরি কাজ নিয়ে শীঘ্রই ছেড়ে দেন। ১৮২৯এ তাঁর একটা কবিতা এতো কুসমালোচিত হয় যে লেখক সেটাকে পুড়েই ফেলেন এবং রাগের মাথায় যাত্রা করেন এমেরিকা কিন্তু মধ্যপথ থেকে ফিরে আসেন পিটার্সবার্গে। সেখানে সরকারী কাজ নেন এবং সাহিত্য মহলে পরিচিতি এবং পুশ্‌কিনের সৌহার্দ্য লাভ করেন।

ফলে, "ডিকাংকার এক গোলাবাড়ীর সন্ধ্যাগুলি" প্রকাশিত হয় বেনামে এবং উক্রেনীয় জীবনের এই সুন্দর ছবিগুলি সাদরেই পঠিত হয়। পরবর্তী বিখ্যাত রচনা: তারাস বুলবা; ওল্ড্ ওয়ার্লড জেন্টি (পুরানোদিনের ভদ্র জীবন), ওভার কোট (কেরাণীর করুণ চিত্র)।

১৮৩৬এ রচিত বিখ্যাত কমিডি 'রেভিজর', বা ইনস্পেক্টর জেনারেল রুশ কমিডির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ,—বুরোক্রেসির উপরে চমৎকার এক বিদ্রূপ-সমালোচনা।

এঁর বিখ্যাত উপন্যাস "মৃত আত্মা"—মৃত তালুকদারদের জীবনচিত্র রচনার পথে পথে ফুটে উঠেছে গ্রাম্য জীবনের ও পল্লীপ্রকৃতির ছবির পর ছবি অপূর্ব সুন্দর, সাহিত্যের মণিমালার মতো। মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হাস্যরসের ঝলক। গোগোল আশ্চর্য অন্তদৃষ্টি দিয়ে জীবনপ্রতীক করে এঁকেছেন তার চরিত্রগুলি, শক্তিমান তুলির টানে।

"মৃত আত্মার" দ্বিতীয় ভাগ রচনায় ব্যর্থ হয়ে, তাঁর বক্তব্য বা রাশিয়ার প্রতি তার নিজস্ব যুগবাণী প্রকাশ করেন কতগুলি পত্রাকারে। কিন্তু চেলেনিস্কর হাতে, তীব্র সমালোচিত হ'য়ে চলে যান —জেরুজালেমে। পরে ইনি ফিরে এসে পড়েন এক ধর্ম-ক্ষ্যাপার পাল্লায় এবং তার উপদেশ মতো প্রায় লেখাগুলিই নষ্ট করে ফেলেন।

মৃত্যু হয় ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ১৪৫২ খৃঃ,—মাত্র ৪৩ বছর বয়সে।

গোগোলের রচনা রোমান্টিশিজ্‌মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ এবং তার সংগে বাস্তব জীবনের অপূর্ব সুন্দর যোগাযোগের নিদর্শন। প্রতিভা অনেক বড়ো হলেও ইনি বিদেশের কাছে পুশ্‌কিনের চেয়ে কম পরিচিত।

আগের দিনের ভদ্র জীবন

পল্লীর নিভৃত নিরালায় পুরানো তালুকদারদের শান্ত জীবনযাত্রা ভারী ভালো লাগে আমার। লিটল রাশিয়ায় তাঁদের সাধারণত বলা হয় "প্রাচীন"। তারা যেনো ছোট ছোট কুটিরের মতো সরল সুন্দর। আজকালকার নতুন এই সব মসৃণ দালানের মতো মোটেই নয়,—দেয়ালের উপরে ধরেনি যার বর্ষার দাগ, ছাদে জমেনি সবুজ শ্যাতলা, বারান্দার গা থেকে আস্তর ক্ষয়ে ক্ষয়ে বেরিয়ে পড়েনি লালচে ইঁটগুলি।—মাঝে মাঝে সাধ হয়, চলে যাই অমন এক নিরালা জীবনে,—মনটা যেথানে ছটফট্ করবেনা বাইরে যাবার জন্য ছোট্ট আঙিনা-ঘেরা বেড়াটি ডিঙিয়ে, প্লাম ও আপেল বনের পাঁচিল পেরিয়ে, ছাড়িয়ে চারপাশের এলডার, পিয়ার ও উইলো বন, আর তার ছায়ায় ছায়ায় শান্ত নিঝুম পল্লীকুটিরগুলি। এই সব বাড়ীর লোকের জীবন এতো শান্তির, এতো যে নিরালা,—এক পলক যেনো স্বপ্নে ভুলে যাই সব! মনে হয়, এই যে কামনা-বাসনা, ক্ষুধিত দানবের এই যে অস্থির ক্রিয়া, কলাপ দুনিয়াকে অশান্ত জর্জর করে তুলেছে এ যেনো সত্য নয়, মায়া মাত্র, কোন দুঃস্থ দুঃস্বপ্নেই তা দেখছি শুধু! এখনো আমি স্পষ্ট দেখিতে পাচ্ছি : সেই নীচু-ছাদের ছোট ছোট ঘর, কালো কালো খুঁটি দিয়ে চারপাশ ঘেরা ; পিছনেই একটা সুগন্ধি বার্ড-চেরী ; খাটো খাটো ফল-গাছের সারি হারিয়ে গেছে লাল চেরী ও এমেথিষ্ট প্লাম বনের পুষ্পরাজ্য। শাখাবহুল একটা মাপ্লেপলের ছায়ায় বসবার জন্য বিছানো রয়েছে সতরঞ্চ, ঘরের সামনেই উদার এক আঙিনা, তাজা সবুজ দুর্বায় ঢাকা, তারি মাঝ দিয়ে পায়ে-চলা একটি পথরেখা—ভাড়ার ঘর থেকে রান্নাঘর, রান্নাঘর থেকে কর্ত্তার ঘর পর্যন্ত। একটা রাজহাঁস তার লম্বা গলাটা বাঁকিয়ে জল খাচ্ছে, চারপাশে ঘিরে রয়েছে পালকের মতো নরম বাচ্চাগুলি। আড়বাসে ঝোলানো একটা কম্বল, একগাড়ী তরমুজ ভাঁড়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে, বলগা-খোলা একটা বলদ গা ছেড়ে শুয়ে আছে একপাশে,—এই সব কিছুই আমার কাছে অব্যক্ত এক মায়ার মতো!

হয়তো, আমি এখন আর সে সব দেখতে পাইনা তাই; হয়তো বা পুরোনো দিনের হারানো সবকিছুই আমার প্রিয়, সে জন্য!

সে যাই হোক, আমার শ্লেজ-গাড়ী যখন এই বাড়ীটার দোরের দিকে এগিয়ে আসছিলো—সমস্ত প্রাণই ভরে গেলো এক আশ্চর্য মধুর শান্তিতে। ঘোড়াগুলি সানন্দে থামলো এসে সিঁড়ির কাছে, কোচোয়ান শান্ত-ধীরে নেমে এলো কোচ-বাক্স থেকে, আরাম করে পাইপ ধরালো,—যেনো সে নিজের বাড়ীতেই এসে পৌছালো! এমন কি, রোভারস্, পণ্টস্ ও নিরোস্—এই কাহিল কুকুরগুলির ডাক পর্যন্ত মিঠেই শোনাচ্ছিলো আমার কাণে, কিন্তু সবার চেয়ে ভালো লেগেছে এই সরল পল্লীকোণের লোকদের।—বুড়ো বুড়ি কেমন সহৃদয় বিনয়ে দেখা করতে এলো আমার সাথে। আজো শহরের বুকের এই ব্যস্ত-শব্দিত ভিড়ে, ফ্যাসান দস্তুর সাজ-সজ্জার মধ্য দিয়ে ভেসে ওঠে তাদের মুখ; আর, আমি যেনো স্বপ্ন দেখতে থাকি, সমস্ত অতীত একে একে এসে দাঁড়ায় আমার সামনে। তাদের মুখে ফুটে থাকে এমন সরল হাসি, এমন সহৃদয় আতিথেয়তা, এমন প্রাণখোলা ভালোবাসা! চেয়ে চেয়ে কেমন ক'রে যেনো ক্ষণিকের জন্য মিছে মনে হয় যতো সব আদর্শের স্বপ্ন,—ধীরে ধীরে সমস্ত প্রাণ মিলিয়ে যায় সেই সরল পল্লী জীবনে।

আজ পর্যন্তও পুরোনোদিনের দুটি মানুষকে ভুলতে পারিনি আমি; হায়রে, তারা আজ কোথায়! আজো যখন ভাবি আবার ফিরে গেছি সেই বাড়ীতে, স্মৃতির ভারে বুক ভেঙে যায় যেনো। সেখানে পড়ে আছে ভাঙা এক ছাড়া ভিটা, জীর্ণ কুটিরগুলি হুমড়ি খেয়ে পড়ে পড়ে আছে, পুকুরটা শ্যাওলার ভারে হাঁফ ছাড়াতে পারছে না; ছোট্ট ঘরখানি যেখানে ছিলো,—সেখানে একটা গর্ত-নালা, চারিদিকেই জংলা গাছের জঞ্জাল,—সেদিনের কিছুই নেই আর। কী যে করুণ এই ছবি। তার স্মৃতিও এতো বেদনার! কিন্তু সে থাক, এবারে কাহিনীটা বলবো।

আফানসি টভ্‌ষ্টোগাভ্‌ ও তার স্ত্রী ফুলেরিয়া টভ্‌ষ্টোগুহিভা (আশেপাশের কিষাণরা বলতো যেমন)—এ দুজনের কথাই আমি বলতে সুরু করেছিলাম। যদি শিল্পী হতাম ও ক্যানভাসের পটে আঁকতে চাইতাম ফিলেমন ও বসিচ-এর ছবি,—এদের চেয়ে ভালো

মডেল ভাবতেই পারতাম না আমি। আফানসির বয়স ষাট, ফুলেরিয়ার পঞ্চান্ন। আফানসি লম্বা, গায়ে কাপড়-আটা একটা মেষ-চামড়া, দুমড়ে বসা তার অভ্যাস। সব সময়েই যেনো মুখখানি তার হাসছে,—তা সে গল্পই বলুক নিজে বা শুনতেই থাকুক শুধু। ফুলেরিয়া কিছুটা গম্ভীর, বড়ো একটা হাসতো না; কিন্তু তার চোখে মুখে এমন সহৃদয় ভাব, সমস্ত কিছু দিয়েও তোমাকে খুশী রাখবার জন্যে সব সময় এমন সজাগ! তার এই সহৃদয় শান্ত মুখখানির উপরেও আর একটি হাসি নিশ্চয়ই তোমার কাছে ঠেকতো অতিরিক্ত! তাদের মুখের উপরে বার্দ্ধক্যের রেখা কটি এমন সুন্দর ভাবে আঁকা,—শিল্পী কেউ দেখলে তা আদর্শ বলে মনে রাখবে চিরদিন! সেখানে যেনো অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা তাদের সমস্ত জীবন,—সরল-সুন্দর স্বচ্ছ-শান্ত জীবন,—পুরোনো দিনের খাঁটি লিটল-রাশিয়ানরা,—সেই সরল-প্রাণ স্বচ্ছল পরিবারগুলির ছিলো যে জীবন। নীচু-শ্রেণীর লিট্‌ল রাশিয়ানদের মতো নয় মোটেই। আলকাত্‌রা বানানো বা আবগারী মালের ব্যবসা ক'রে যারা পংগপালের মতো ঝাঁক বেঁধে আসে আইন-আদালতে, মামলা-মোকদ্দমায় চুষে নেয় ভাই ভাইয়ের শেষ কড়িটি; আর পিটার্সবুর্গ গরম হ'য়ে ওঠে রক্ত-চোষা এটর্নিতে, দেখতে দেখতে জমে ওঠে ফাইলের পাহাড় এবং গম্ভীরভাবে তারা নামের শেষে 'ও' অক্ষরটির পরে 'ভি' দেয় বসিয়ে;—কিন্তু না, এরা হলো গিয়ে সেই প্রাচীন লিট্‌ল-রাশিয়ান পরিবারের মতো,—এই সমস্ত নগণ্য ঘৃণ্য জীবন থেকে বহু বহু দূরে।

দুজনার ভালোবাসা দেখলে সহানুভূতি না জাগে এমন মানুষ নেই। সমীহ না ক'রে এ ওকে সম্বোধন করতো না কখনো।

ফুলেরিয়া জিজ্ঞেস করছে আফানসিকে—"চেয়ারটা আপনার হাতেই কি ভেঙেছে?" "কিছু মনে কোরোনা ফুলেরিয়া, হ্যাঁ আমার হাতেই।" কোন সন্তান নাই এদের, সমস্ত স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে এ ওকে ঘিরে রেখেছে। তরুণ বয়সে আফানসি একদিন চাকরী করতো, লেফটানেণ্ট মেজর ছিলো সে; কিন্তু সে বহু বহু দিন আগের কথা। সেদিনের কী আর আছে আজ! আফানসিও সেকথা বড়ো মনে করেনা আর। বিয়ে হোলো ত্রিশ বছরে—তখন সে চমৎকার এক তরুণ যুবক, কারুকাজ-করা একটা ওয়েষ্ট কোট গায়ে থাকতো সব সময়ে। ফুলেরিয়ার আত্মীয় স্বজন আপত্তি তুললো বিয়েতে। কাজেই, তাকে

নিয়ে আফানসি চম্পট দিলো সোজা। তা,—সে কথা আজ আর বড়ো মনে পড়ে না তার, পড়লেও বলে না কথনো।

সেই দুরান্ত যৌবনের এই সব অনন্ত অভিযানের পরে এলো এক শান্ত নিরালা জীবন। ঠিক যেনো এক শান্তিময় স্বপ্ন : কাঠের বারান্দায় বসে চেয়ে আছো,—সামনেই বাগান, মধুর এক বর্ষাধারা পাতায় পাতায় তুলেছে তার নরম ঐক্যতান, কুলভরা ঝর্ণাস্রোতে জেগেছে ফেনিল জোয়ার,—চেয়ে চেয়ে সমস্ত দেহ আরামে জড়িয়ে আসছে;—এদিকে, গাছের আড়াল দিয়ে আধো চাঁদের মতো জেগে উঠেছে সাত-রঙা রামধনু!

অথবা,—হঠাৎ সবুজ ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তোমার শেজ গাড়ী, তালে তালে দুলছে তোমার দেহ, প্রান্তর থেকে ভেসে আসছে কোয়েইল পাখীর গান; শস্য-মঞ্জরী ও বুনো ফুলের সংগে সুগন্ধি ঘাসের ঘ্রাণ মিশে মিশে বয়ে আসছে হাওয়ায় হাওয়ায়, ঝাপ্‌টা দিয়ে যাচ্ছে তোমার গাড়ীর দুয়ারে, আর ত্রস্তসুখে তুমি মুখখানি হাত দিয়ে চেপে ধরছো!

আফানসি তার অতিথিদের কথাবার্তা শুনতে থাকতো মুখখানিতে মিষ্টি একটি হাসি নিয়ে, কথনো কথনো বা নিজেই কথা বলতো, কিন্তু প্রায়ই সে নানা কথা জিজ্ঞেস করতেই ভালোবাসে। প্রাচীনদের মতো যে পুরানো দিনের চিরন্তন সুখ্যাতিতে আত্মহারা আধুনিকদের অভিসম্পাত এবং সে ধরণের ছিলো না সে মোটেই। বরং তোমাদের জীবনের কথা জানবার জন্য তার বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ পেতো;—তোমার আশা নিরাশা উন্নতি-অবনতির সমস্ত কথা। সব বৃদ্ধেরাই অবশ্যি এমন ক'রে থাকে, সেটা হোলো এক ধরণের কৌতূহল মাত্র,—ছোট্ট খোকা যেমন তোমার ঘড়িটার সোনালি কাঁটা দেখতে দেখতেই কথা বলে যায়! এমনি সব সময় বৃদ্ধের মুখখানা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌তো এক অপূর্ব সহৃদয়তায়।

ঘরটির যে কোঠায় এই বুড়োবুড়ী থাকতো সেখানা ছিলো ছোট ও নীচু; আগের দিনে যেমনটা থাকতো আর কি! প্রত্যেক কোঠায়ই প্রকাণ্ড একটা ফায়ার প্লেস, কোঠার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ জুড়ে। এই সব কোঠায় ভয়ানক গরম,—আফানসি ও ফুলেরিয়া দুজনেরই গরম ভালো লাগে! বাহির ঘরটাও ফায়ার প্লেস রেখে গরম ক'রে রাখা হ'য়েছে, সে ঘরটার ছাদ পর্যন্ত খড়ে বোঝাই। লিট্‌ল রাশিয়ায় গাছের বদলে খড়ই ব্যবহৃত

হয় জ্বালানীরূপে; জ্বলন্ত খড়ের আগুন ও তার পট্ পট্ শব্দে শীতের সন্ধ্যেবেলা বেশ আরামে ভরে থাকে। ঘরের দেয়ালে পুরোনো দিনের কায়দা দস্তুর সরু-ফ্রেমে আঁটা কয়েকটি ছবি; নিশ্চিতই বলতে পারি, ঘরের কর্তারাই ভুলে গেছে ও ছবি কিসের,—কেউ যদি ওর দু একটা সরিয়েও নেয়তো তবু টের পায় না কেউ। দুটি তৈলচিত্রও রয়েছে সেখানে: বিশপ ও তৃতীয় পিটার। অন্য এক ফ্রেম থেকে চেয়ে আছেন ডাচপত্নী ডিলা ভেলিয়ার। জানালার চারদিকে ও দোরের উপরটায়ও অনেকগুলি ছোট ছোট ছবি। মনে হবে কালো কালো কয়েকটা দাগ; তাই, নজর দিয়ে দেখতেও যায় না কেউ। প্রায় ঘরের মেজেই মাটির, আল্‌পনা আঁকা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এতো পরিষ্কার যে ধনীঘরের আলসে হাতে ঝাট-দেওয়া কোনো পার্কেট মেজেও অমন সুশ্রী নয়!

ফুলেরিয়ার কোঠা তো ছোটো বড়ো ডেস্ক বাক্সের গুদামই বলা চলে। কয়েকটা ছোট ছোট ছালা ও ফুলবীজের থলি, শাক-শব্জী বীজের থলি, তরমুজ-বীজের থলি—সবগুলিই দেয়ালের উপর। নানা-রঙের উলস্থতোর কয়েকটা বল ও পুরোনো ফ্যাশানের কয়েকটা ছেঁড়া গাউন ছোট্ট একটা ডেস্কের মধ্যে। ফুলেরিয়া একজন পাকা গৃহিণী; সব কিছুই সে সঞ্চয় করে রেখেছে,—নিজে জানে না যদিও কোন্ কাজে লাগবে এসব।

ঘরের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে কিন্তু দুয়ারের গান। ভোর হ'লেই দোরের গান শোনা যায় প্রতিটি ঘরে। তা কেমন ক'রে বলবো আমি কেন গান গায় তারা? মরচে-পড়া কব্জাগুলির দোষেই, অথবা মিস্ত্রীই কোন রহস্য বানিয়ে রেখেছে ওরি মধ্যে! কিন্তু এটা সত্যই অভিনব যে প্রত্যেক দোরই নিজস্ব ভাষায় কথা কয়! শোবার ঘরের মুখের দোরটা মুমূর্ষুর ক্ষীণ সুরে, খাবার ঘরেরটা ভাঙা গলায়; কিন্তু বাইরের ঘরের দোরটা অদ্ভুত এক গোঙানির মতো! সে শব্দ কারো কানে এলেই স্পষ্ট যেনো শোনা যায়: "ভগবান, রক্ষা করো!" আমি জানি যে প্রায় লোকেই পছন্দ করেন না এমনি সব শব্দ! আমার কিন্তু বেশ লাগে, এবং এখানে আজো যদি কখনো হঠাৎ কবাট নড়ার শব্দ শুনি, আচম্‌কা ধাক্কা দিয়ে জেগে ওঠে সেই গ্রামের কথা। নীচু ছাদের ঘরটি, প্রাচীন বাতিদানীতে জ্বলছে একটি মোম, ইতিমধ্যেই খাবার এসে গেছে টেবলে; বাগানে দাঁড়িয়ে

জানালা দিয়ে উঁকি মারছে আঁধার-নিঝুম বাসন্তী-রজনী, চেয়ে আছে কাঁটা-চামচ সাজানো টেবিলের দিকে। নাইটেংগেলের সুরের জোয়ারে ডুবে গেছে বাগান, ঘরবাড়ী, দুরান্তের কলোচ্ছল নদী পর্যন্ত; ডালপাতার বিচিত্র মর্মর-শিহরণ, আর—হে ভগবান, দুর স্মৃতির কতো যে সুদীর্ঘ মালা দুলে উঠে আমার সামনে······

ঘরের চেয়ারগুলি মোটা মোটা কাঠের,—পুরানো দিনে ছিলো যেমন, প্রত্যেকটির পিঠের দিকটা উঁচু আর বাঁকা, উপরে থাকতো না কোনো বার্নিশ বা রঙ,—এমন কি পর্দা ঢাকাও না,—বিশপ্‌রা আজ পর্যন্তও সে রকম চেয়ারে বসেন; কোনে ত্রিকোণ একটা ছোট টেবল, সোফার সামনে চতুষ্কোণ কয়েকটা, কারুকাজ করা সোনালি ফ্রেমে-আঁটা একটা আয়না, মাছিরা কালো কালো দাগে ভরে গেছে সেটা। সোফার সামনে একটা কম্বল, তার উপর আঁকা পাখীগুলি দেখাচ্ছে ফুলের মতো, ফুলগুলি পাখী। আমাদের বুড়োবুড়ীর ছোট্ট সরল ঘরটির এই হচ্ছে সব সাজ-সজ্জা।

বাড়ীটা পরিচারিকা কুমারী মেয়েতে ভর্তি, বড়ো মেয়েদের গায়ে ডোরা-কাটা জামা। ফুলেরিয়া দু এক সময় তাদের দুএকটা সেলাই-ফোড়াইয়ের কাজ দিতো, অথবা লাগিয়ে দিতো ফলের খাবার বানাতে। কিন্তু প্রায় সব সময়েই তারা রান্নাঘরে গিয়ে পেট ফুলিয়ে খায়, আর পড়ে পড়ে ঘুমায় শুধু! তাদের ঘরে রাখা একান্ত দরকার মনে করতো ফুলেরিয়া এবং তাদের স্বভাব চরিত্রের উপরেও রাখতো কড়া নজর। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এমন একটা মাসও বড়ো কাটে না—যখন অন্তত দু একটি মেয়ের চেহারাও সন্দেহজনক হ'য়ে ওঠেনি! ঘটনাটা আরো অদ্ভুত, যেহেতু ঘরে নেই কোনো যুবক, একমাত্র চাকরটা ছাড়া। এবং সে ছোঁড়াটাতো একটা ধূসর কোট গায়ে রাস্তায় রাস্তায় খালি পায়ে ঘোরে শুধু, যদি ঘরে আসে তো খায়, অথবা নিশ্চয়ই ঘুমোয়। ফুলেরিয়া দোষী মেয়েটিকে গালিগালাজ করে খুব,শাস্তিও দেয় জোর,—ফিরে অমন আর কখনো হয় না যেনো।

জানালার কাচে প্রকাণ্ড এক ঝাঁক মাছি ঝংকার তুলেছে, এবং তাকে ছাপিয়ে উঠেছে একটা মৌমাছির গুঞ্জন, সংগে তার ভীমরুলের তীক্ষ্ণ সুর। তারপর বাতি আনতে আনতেই সব ঝাঁক শুদ্ধ ঘুমোতে যায়,—আর সমস্ত ছাদটা দেখায় কালো মেঘের মতো।

আফানসি চাষবাস বড়ো একটা কিছুই দেখা শুনো করতো না, মাঝে মাঝে অবশ্যি কিষান্-মজুরদের কাজ দেখতো গিয়ে। সমস্ত দেখাশোনার ভার একমাত্র ফুলেরিয়ার উপরেই। ঘরকন্না করতে গিয়ে ফুলেরিয়া এই তালাবন্ধ করছে ভাঁড়ার ঘর, এই আবার খুলছে, নুন মাখাচ্ছে, শুকোচ্ছে, তুলে রাখছে কতো রকম যে ঝুড়িভরা শাকশব্জী. ফল। তার ঘর যেন ঠিক একটা রসায়নাগার। আপেল গাছের তলায় দিনরাত জ্বলছে একটা উনুন; তারই উপরে কড়াই ভর্তি মোরব্বা, ফলের রসেরভাঁড়, মৌ ও চিনি মেশানো ফলের পনীর এবং তার সংগে কি জানি, আরো কতো কী। উনুন খালি পড়ে নেই কখনো। অন্য একটা গাছের নীচে কোচোয়ানটা দিনরাত বসে একটা তামার পাত্রে ভোদকা চোলাই কচ্ছে—পিচ্ পাতা, বার্ডচেরীর ফুল, সেঞ্চুয়ারী ও চেরী পাথর দিয়ে। তৈরী হবার শেষের দিকটায় লোভ সামলানো তার শক্তই হ'য়ে ওঠে; তখন বিড় বিড় ক'রে সে এমন যাতা বলতে থাকে যে ফুলেরিয়া তার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝে ওঠে না, সোজা চলে যায় রান্না ঘরের দিকে। এই সমস্ত জিনিষ সিদ্ধ, নুন-মাখানো ও শুকোনো হতে থাকে এতটা পরিমাণে যে সমস্ত আঙিনায়ই যেনো ভরে থাকে (ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর পরিমানে মজুত রাখা ফুলেরিয়ার অভ্যাস, হিসেবমতো যা দরকার তা ছাড়াও); ভাঁড়ার ঘর থেকে চুরি ক'রে ক'রে আধাআধি উবে যায় পরিচারিকা মেয়েদের পেটে, তাই রক্ষা! আর, তারা খায়ও এতোটা ক'রে যে দিনরাত শুধু পেট-ব্যথায়ই মরে আর কি!

ফুলেরিয়া চাষবাস বা ঘরকন্নার অন্য কোন দিকে নজর দেবার সময়ই পায় না। সরকার আর তার সাকরেৎ গ্রাম্যমোড়ল হাতে হাত মিলিয়ে এদের সম্পত্তিতে প্রাণভরে সিঁদ কেটে বেড়ায়। মনিবের ধন-সম্পদ যেনো তাদের নিজেরি;—কাঠ নিয়ে শেজ বানায়, বিক্রি করে কাছের হাটে, বিশেষ ক'রে মোটা মোটা পুরোনো ওকগাছগুলি মিল-ঘর বানাবার জন্য বিক্রি করে দেয় আশপাশের কিষানদের কাছে।

একবার মাত্রই ফুলেরিয়া বন দেখতে গিয়েছিল। শেজগাড়ী আনা হ'ল একটা, কোচোয়ান বলগা ধরে ঝাঁকানি দিতেই ঘোড়াগুলি ছুটল জোর কদমে, আকাশে

উঠল বিচিত্র ধ্বনি,—যেন বাঁশী, ভাম্বুরিন ও ড্রামের ঐক্যতান। প্রত্যেকটা লোহা-লক্কর এতজোরে ঝম্ ঝম্ করতে লাগল যে দেড় মাইল দূরের মিল থেকে পর্যন্ত স্পষ্টই বোঝা গেল,—ভূম্যাধিকারিণী আসছেন এবারে। ফুলেরিয়া দেখল, তার বনের কী যে সর্বনাশ হয়েছে! ওকগুলি নেই; মনে আছে, তার ছোটবেলাও সেগুলি ছিল একশ বছরের প্রাচীন।

"আচ্ছা নিচিপর",—সরকারকে জিজ্ঞেস করলো সে। "ওকগুলি এমন সরু হয়ে দাঁড়ালো কি ক'রে? তোমার আঙুল তো একটুও সরু হয়ে যাচ্ছে না?"

"তা কেন, আজ্ঞে, পড়ে গেছে সেগুলি, মাটিতেই ভেঙে পড়েছে, বাজ প'ড়ে, কাঠ-ঠোকরার ঘায়েই প'ড়ে গেছে।"

ফুলেরিয়া শুনে একদিকে নিঃসন্দেহ হ'লো, বাড়ী ফিরে এসে ব'লে দিল আরও কড়া নজর রাখতো, বিশেষ করে স্পেনিশ-চেরী ও বড় উইণ্টার-পিয়ার্সের দিকটায়।

এই রক্ষকেরা, মানে এই সরকার, ও মোড়লটি ভাবতো কিজন্যে আবার কষ্ট ক'রে সমস্ত ময়দাই মনিবের বাড়ি নিয়ে তুলব? আর্ধেকটা দিলেই তো যথেষ্ট! এবং সবচেয়ে মজার সেই আর্ধেকটা হবে ভিজা, বাজারে অচল বা পোকা-ধরা! সরকার ও মোড়ল যে পরিমানেই সরিয়ে নিক, স্থানীয় সবাই যতটা খুসী পেটেই পুরুক্না,—(গৃহরক্ষক থেকে শুয়োরগুলি পর্যন্ত,) কিন্তু তাহলেও চুরি যাবে আর কতটা? আর, শুয়োরেরও খাওয়া কি খাওয়া! অসংখ্য আপেল, কুল গিলে গিলেও তবু সাধ মেটেনা, পাকা ফল ঝেঁকে ফেলবার জন্যে মাথা দিয়ে তারা গাছের গোড়ায় গোড়ায় ধাক্কা দিয়ে ফেরে—তারপর চড়ুই, কাকেই বা খায় কতো। চাকর বাকরেরা ভিন্ন গ্রামে গিয়ে পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবদের বিতরণ করে আসে প্রাণভরে।

পাড়াপড়শী, কোচোয়ান ও দর্শকেরাও যে গলিয়ে নেয় কতো তারই বা হিসেব রাখে কে? কিন্তু অন্নপূর্ণা মাটি দুহাত ভ'রে এত ফসল দেন এবং আফানসি ও ফুলেরিয়ার অভাব বোধও এত কম যে এই সব দিন দুপুরে ডাকাতিও তাদের ঐশ্বর্যের উপরে কোন রেখাপাত করতে পারেনি।

এই প্রাচীন প্রাচীনা দুজনেরই ছিলো খাওয়া দাওয়ার ঘটা। প্রাচীনদিনের তালুক-

দারদের রীতি ছিল যেমন। ভোরের আলো ফুটলেই (খুবভোরে ওঠাই ছিল তাদের অভ্যাস) এবং দোরের বিচিত্র ঐক্যতান আরম্ভ হ'লেই টেবিলে এসে তারা কাফি খেতে আরম্ভ করে। তারপরে আফানসি বারান্দায় এসে রুমালটা নেড়ে ডাক দেয় সরকারকে—"কিস্, কিস্, এদিকে শোনে।" এবার সে সরকারের সংগে কথা বলতে থাকে, চাষবাসও মজুরের কথা জিজ্ঞেস করে নিখুঁত মনোযোগে, মন্তব্য পেশকরে ও সংগে সংগে হুকুম জারি করে। দেখে মনে হয়, বুড়োর চাষবাসের জ্ঞান যথেষ্টই। এবং সত্যিই কোন মানুষ বুঝে উঠতে পারেনা এমন কড়া-নজর মনিবের কাছ থেকে চুরি করাও সম্ভব কি ক'রে। কিন্তু সরকারটিও আস্ত একটি শিকারী বেড়াল; কি ভাবে কথা ব'লতে হবে বেশ ক'রে জানে সে,—আর কিভাবেই বা করতে হবে জমির তদারক। এবারে আফানসি বাড়ির ভেতরে চলে যায় এবং স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলে "আচ্ছা ফুলেরিয়া, এখন একটা কিছু খেলে হয় না?"

"বলো কি ভালো লাগবে? পোস্তবীজের পিঠে, ক্ষীরের কেক, না নোনতা ভুঁইফোড়।"

"শেষের দুটো"—এবং সংগে সংগেই টেবেলের উপরে বিছানো হয়ে যায় একটা চাদর, তারপরে পিঠে ও ভুঁইফোড়। দুপুরের খাবারের ঘণ্টাখানেক আগেই আবার আর একদফা; প্রাচীন ফ্যাসানের একটা রৌপ্য পাত্রে ভরা সুরা, ভুঁইফোড়, নানারকম শুটকি মাছ, আরো কতো কী? ঠিক বারোটার সময় আবার দুপুরের খাবার। থালা ও বাটি ছাড়াও টেবেলের উপরে অনেক পাত্র ঢাকা দেওয়া রয়েছে,—চমৎকার রান্না খাবারগুলি নষ্ট না হ'য়ে যায় তাই। খাবার সময় প্রায় কথাবার্তাই ঘুরে ফিরে আসে খাবার প্রসংগেই—"পায়সটা একটু পোড়া লেগেছে, ফুলেরিয়া।"—আফানসি বলছিলো। "আরও একটু মাখন দিয়ে দেখো, পোড়া লাগবে না। অথবা, এইটা নাও, কিছুটা, ঢালো।"—আফানসি প্লেটটা ফুলেরিয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—"দেখা যাক, কেমন হয়!"

খাওয়া দাওয়ার পরে আফানসি শুতে যাচ্ছে; একফালি তরমুজ নিয়ে ফুলেরিয়া বলে, "খেয়ে দেখ, কি চমৎকার তরমুজ!"

"অত নিশ্চয় ক'রে বলতে পারনা যে চমৎকারই!"—আফানসি বড় একটা টুকরো নিয়ে বলে, "মাঝখানটা রাঙা হ'লে হবে কি, অনেক তরমুজ আছে ভিতরে রাঙা কিন্তু খেতে ভালো না।"

তা হলেও দেখতে না দেখতেই কিন্তু গোটা তরমুজটাই টেবিল থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়! এবারে আফানসি কিছুটা পিয়ার ফল খেয়ে ফুলেরিয়ার সংগে বেড়াতে যাবে বাগানে। বাড়ি ফিরে ফুলেরিয়া ঘরকন্না দেখতে থাকে আর আফানসি একটা সামিয়ানার নীচে বসে দেখে,—ভাঁড়ার ঘরটা একবার খুলছে আবার তালাবন্ধ হচ্ছে, পরিচারিকা মেয়েরা এ-ওকে ঠেলেঠুলে নিয়ে আসছে নানা রকম বাক্স-বাসন, আরও কতো কী। একটু পরে ফুলেরিয়াকে ডাকতে পাঠায় আফানসি অথবা নিজেই তার কাছে গিয়ে বলে, "এখন কি খাবো ফুলেরিয়া?"

"বলো, কি ভালো লাগবে,—আচ্ছা, ওটা বলবো আনতে? ওটা বিশেষ ক'রে তোমার জন্যেই তৈরী করিয়েছি।"

"বেশ তো, তাই চমৎকার হবে।"

"না, কিছুটা জেলি আনাবো?"

"হ্যাঁ, তাই ভালো হবে।"—এবারে চটপট এসে পড়ে সব এবং তখন তখনই সব খালি হ'য়ে যায়!

রাতের খাবারের আগে আবার এক দফা। সাড়ে নটায় রাতের খাওয়া; তারপরেই দুজনে মিলে শুতে যাওয়া। তখন এই কর্মব্যস্ত অথচ শান্ত বাড়িটির সর্বত্রই একটি অখণ্ড নীরবতা!

আফানসি ও ফুলেরিয়ার ঘুমোবার ঘর এত গরম যে বেশী লোকের সেখানে থাকাও অসম্ভব। কিন্তু আফানসি আরও গরম লাগবে বলে ফায়ার প্লেসের প্লাটফর্মের উপরেই ঘুমোয়। গরমের চোটে রাতে সে বারবার উঠে পড়ে এবং গোঙানি দিতে দিতে ঘরময় পায়চারী ক'রে বেড়ায়। ফুলেরিয়া জিজ্ঞেস করে, "তুমি অমন কচ্ছো কেন?"

"কি ক'রে বলবো ফুলেরিয়া, মনে হচ্ছে পেটটা কামড়াচ্ছে যেনো।"

"কিছু খেলে ভালো হয় না?"

"কি জানি, কি খাবো এবার ?"

"দই বা শুকনো পিয়ারের স্টু ?"

"দেখলে হয় !"—বলে আফানসি।

একটা ঝিমন্ত মেয়ে আলমারী থেকে খুঁজে নিয়ে আসে, আফানসি খেয়ে নেয় এক প্লেট এবং খাওয়া মাত্রই সাধারণত বলে : এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে !

কখনো কখনো দিন থাকে পরিষ্কার, ঘরের ভেতরে বেশ গরম। আফানসির মনটাও খুশীতে ভরা। সে ফুলেরিয়াকে নিয়ে একটু মজা করবার জন্তেই বলতে থাকে—

"ফুলেরিয়া, আচ্ছা হঠাৎ যদি আমাদের বাড়িতে আগুন লাগে, কোথায় যাবো আমরা ?"

"ভগবান না করুন !" ফুলেরিয়া ভগবানের নাম করে।

কিন্তু, ধর আমাদের ঘর পুড়েই গেলো, কোথায় যাবো তখন !"

"কি যে ব'লছো, সব অলক্ষুণে কথা ! এও কি সম্ভব যে আমাদের ঘর পুড়ে যাবে ? ভগবান না করুন !"

"কিন্তু যদি পুড়েই যায় ?"

"তা হ'লে আর কি উপায় ! রান্না ঘরটায় গিয়ে উঠবো। গৃহরক্ষকের ঘরটা কিছু দিনের জন্য তুমি ব্যবহার করবে।"

"কিন্তু রান্না ঘরটাও যদি পুড়ে যায় ?"

"কী যে বলছ ! ঘর ও রান্নাঘর দুটোই পুড়ে যাবে ? ভগবান এমন বিপদ আনাবেন না নিশ্চয়ই ! তখন ভাঁড়ার ঘরে যাবো, ইতিমধ্যে নতুন একটা বাড়ি তৈরী হবে।"

"কিন্তু ভাঁড়ার ঘরটাও যদি পুড়ে যায় ?"

"এ কি ব'লছো সব, এমন কথা শুনতে চাইনা আমি। এ সব অন্যায় কথা বলার জন্যে ভগবান তোমাকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন।"

আফানসি ফুলেরিয়াকে নিয়ে একটু মজা ক'রে হাসিমুখে চেয়ারটায় ব'সে পড়ে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হয় যখন এদের এখানে কোন অতিথি আসে। ঘরে যেনো তখন এক নতুন আবহাওয়া। এই সহৃদয় মানুষ দু'টি অতিথিদের জন্যেই যেন বেঁচে আছে শুধু।

সেরা সেরা জিনিষ পরিবেশন করা হয় তাদের। এদের ক্ষেতখামারের সমস্ত কিছু দিয়েও তোমাকে খুশী রাখতে যেনো প্রতিযোগিতা লেগে যায় দুজনের মধ্যে। এই আতিথেয়তা ও খুশী রাখবার জন্যে মধুর ব্যস্ততায় তাদের মুখে ফুটে ওঠে এখন এক নির্মল সৌন্দর্য, এমন শান্ত সামঞ্জস্য যে অতিথিরা এদের অনুরোধ রক্ষা না ক'রে কিছুতেই পারে না আর। এদের মুখখানি যেনো সরল প্রাণের শান্ত এক ছবি। কোন গভর্ণমেণ্ট অফিসের কেরাণীকে হয়ত তুমি সাহায্য করেছো, সেও তোমাকে অভ্যর্থনা করে—তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, বিনয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়ে—কিন্তু এদের এই যে আতিথেয়তা সে একেবারে অনন্য অপূর্ব ! তোমাকে সেদিনই যেতে দেবেনা প্রাণ গেলেও, রাতটা থেকে যেতে হবেই। "এত রাতে কি ক'রে এতদূরের পথে রওনা হবেন?"—প্রত্যেক বারেই বলে ফুলেরিয়া। (অতিথিরা অবশ্যি, সাধারণত দু'তিন মাইলের বেশী দূর থেকে আসেনা।)

"সে কিছুতেই হ'তে পারে না," আফানসি বলে, "পথে কখন কি হয়, কেউ বলতে পারে? ডাকাত, বদমাস চড়াও করতে পারে যখন তখন।"

"ভগবান রক্ষা করুন ! ডাকাত কেন হবে?" ফুলেরিয়া বলে, "আর তুমিও যেমন ! কি সব বলছ এই আঁধার রাতে? ডাকাতের কথা নয়, বাইরে যে অন্ধকার, গাড়ী চালানোও এখন অসম্ভব। তা ছাড়া, আপনার কোচোয়ানটি············আমি চিনি ওকে ! এমন আলগা মানুষ, আর মানুষটাও তো এতটুকু, ঘোড়া সামলানোই তো দায় ! এবং সম্ভবত এরই মধ্যে সে কোথাও ঘুমিয়ে গেছে। কাজেই—"

কাজেই, অতিথিকে থেকেই যেতে হয়। কিন্তু এজন্যে অবশ্যি খুশীই হয় সে, নীচু ছাদ, গরম ঘর সুন্দর সন্ধ্যাটি; প্রাণভরা হাসিখুশী; টেবিলের উপরে খাবার থেকে উড়ছে ধুঁয়ো;—কি চমৎকার রান্না খাবার ! সব কিছুই তার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

আজও যেনো দেখতে পাচ্ছি: আফানসি ঝুঁকে বসে আছে চেয়ারে, মুখে হাসিটি লেগেই আছে, সানন্দে শুনছে তাঁর অতিথির কথা। মাঝে মাঝে রাজনীতি নিয়েও কথা চলছে। অতিথিটিও গ্রামছেড়ে বাহিরে যায়নি কখনো, একটা বিশিষ্ট ও রহস্যময় ভাব নিয়ে গম্ভীরভাবে সে তার মতামত প্রকাশ করে। চাপা গলায় বিশ্বস্ত ভংগীতে ব'লছে সে: জানেন, ফরাসীদের সংগে ইংরেজরা গোপনে একটা সন্ধি ক'রে

ফেলেছে—বোনাপার্ট আবার রাশিয়া আক্রমণ ক'রবে।" অথবা ভবিষ্যদ্বানীর মতো বলতে থাকে,—"দেখবেন, খুব শিগগিরি লাগবে আর একটা যুদ্ধ।"

আর, তখন আফানসি ফুলেরিয়ার দিকে না তাকানোর ভান ক'রে প্রায়ই বলে—"মনে হচ্ছে, আমি নিজেই আবার যুদ্ধে যাবো, কেন যাবো না?"

"আবার কি যে বলছ তুমি!"—ফুলেরিয়া বাধা দেয়, অতিথির দিকে ফিরে বলে—"আপনি বিশ্বেস ক'রবেননা ওর কথা। ওর মতো বুড়ো আবার যুদ্ধে যাবে! যে প্রথম দেখবে সেই তো গুলি ক'রে দেবে; হ্যাঁ, ঠিক বলছি, তাক ক'রে সোজা গুলি ছুঁড়বে।"

"বেশ, তাহ'লে অমিও তাঁকে গুলি ক'রবো।"

"শুনুন একবার, কি যে বলছে মাথামুণ্ডু।"—ফুলেরিয়া স্বামীকে হাত দিয়ে টেনে ধরে। "আচ্ছা কি ক'রে যুদ্ধে যাবে এ? ওর পিস্তলেও তো মরচে-ধরা, আলমারী না কোথায় পড়ে আছে তারও ঠিকঠিকানা নেই। আপনিই দেখুননা এসে একবার; গুলি বেরুবার আগে বারুদের ধাকায় যে পিস্তল শুদ্ধই উড়ে যাবে! আর বুড়োর হাত দুটোও ভেংগে যাবে, মুখখানা ক্ষত বিক্ষত হয়ে প'ড়বে—শেষে এই বুড়ো বয়সটাই কাটবে দুঃখে।"

"বেশ"—আফানসি ব'লে চলে, "নতুন অস্ত্রশস্ত্রই কিনে নোবো তবে। ঝকঝকে তলোয়ার, আর একটা তীক্ষ্ণ কশাক-বর্শা।"

"কি সব পাগলামি! আর কোনো কথা নেই? একবার একটা কিছু মাথায় চেপেছে তো বক্‌তে থাকবে শুধু"—ফুলেরিয়া দুশ্চিন্তাভরেই বাধা দেয়। "আমি জানি,—ঠাট্টা কচ্ছে খালি, তবুও শুনতে ভাল লাগে কারো? আর সেজন্যেই অমন ক'রে বলবে; সময় সময় শুনতে শুনতে ভয়ই লেগে যায়।"

আফানসি ফুলেরিয়াকে একটু ভয় খাইয়ে দিয়ে তো ভারী খুশী! চেয়ারে বসে হাসতে হাসতে সে আরও বাঁকা হয়ে যায়। ফুলেরিয়াকে সবচেয়ে সুন্দর লাগে সে যখন অতিথিদের পরিবেশন করে। একটা বোতলের ছিপি খুলে নিয়ে বলতে থাকে "এটা হ'ল ভোদকা, ঘাড়ের রসে বা পেটের ব্যথার ভাল ওষুধ; আর এটা হ'লো চোলাই করা,—কারো কানের মধ্যে যদি বন বন করে বা মুখে গুটি ওঠে তবে বেশ ভালোই কাজ দেয়। আর

এটা হল পিচ্ পাথর দিয়ে চোলাই করা, এক গ্লাস খেয়ে দেখুন, কি চমৎকার গন্ধ, না ? কেউ ভোরে উঠতে গিয়ে যদি আলমারী বা টেবিলের কোণে ধাক্কা খায় আর কপালটা গোল হয়ে ফুলে ওঠে তবে দুপুরের খাবার আগে একটি গ্লাস নিলেই হলো, সব সেরে যাবে। সেই মুহূর্তেই এমনভাবে সেরে যাবে, যেনো, ছিলই না কোনোদিন।"

তারপরে সুরু হয় অন্যান্য বোতলের বৃত্তান্ত,—প্রায় সবটাই নাকি কাজ করে ওষুধের মতো। এই সমস্ত মহৌষধির বিবরণী দিয়ে অতিথিকে মজিয়ে রেখে ফুলেরিয়া তাকে নিয়ে আসে একটা ফলের পাত্রের কাছে। এগুলো হল মাশরুম বা ভুঁইফোড়ের নতুন খাবার। একটি তুর্কী মেয়ে আমাকে শিখিয়েছিল এটা। আমাদের এখানে তুর্কী বন্দীরা ছিল যখন সেই সময়। কি চমৎকার ছিল সে মেয়েটি! মনেই হ'ত না যে ধর্মে সে তুর্কীয়। ঠিক আমাদের মতোই চলাফেরা, শুধু খেতো না শুয়োরের মাংস। তাদের ধর্মে নাকি নিষেধ আছে। তারপরে মাশরুম দিয়েই নানারকমে তৈরী খাবার এইগুলি। এগুলি পনীরের পিঠে আর ওগুলি বাঁধাকপি ও গমের তৈরী—আফানসির খুব প্রিয় এটা।

"হ্যাঁ, সত্যিই বেশ লাগে আমার, ওগুলির আস্বাদও মোলায়েম, বেশ একটু টক্-টক"—আফানসি বলে।

বরাবরই ফুলেরিয়া সবচেয়ে হাসিখুশী হয়ে ওঠে অতিথিদের সামনে। সেই প্রাচীন দিনের নারী! সে যেনো একেবারে অতিথিদেরই। এদের কাছে যেতে ভালবাসি আমি এবং প্রত্যেকবারেই যদিও মারাত্মক রকম ভুরি-ভোজন ক'রে ফেলি (অবশ্যি সেটা আমার পক্ষে ভাল নয় মোটেই) তবু তাদের ওখানে যেতে ভারী আনন্দ লাগে আমার। আশ্চর্য, অবশ্যি নিশ্চয়ই লিট্‌ল রাশিয়ার জলবায়ুতে হজমি কিছু আছে, কারণ কেউ যদি এই এখানে দুঃসাহস ক'রে ওরকম একবারও খেয়ে বসে তাহলে তাকে শুয়েই থাকতে হবে,—বিছানায় নয়, সোজা কবরের তলায়।

আগের দিনের এই সব ভালোমানুষ! কিন্তু এবারে আমার কাহিনীটা করুণ দিকে মোড় নিচ্ছে,—ছোট্ট একটি ঘটনাই নিরালা পল্লীকোণের শান্ত জীবনে ভাঙন ধরিয়ে দিল। ঘটনাটি আরও করুণ যেহেতু অতি সাধারণ কারণ থেকেই তার জন্ম। কিন্তু দুনিয়ার এমনি যোগাযোগ! সাধারণ কারণও গড়িয়ে যায় প্রকাণ্ড এক ব্যাপারে; আবার বিরাট

এক সূচনা শেষ হয় তুচ্ছ কোলাহলে। কোনো সেনাধ্যক্ষ সাম্রাজ্যের সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করে দিনের পর দিন, তার সেনাপতিরা সম্মান লাভ করে প্রচুর; কিন্তু বিজয়ের শেষে লাভ হয় শুধু এক টুকরো জমি,—যেখানে কলাটা মুলোটা ফলাবারও জায়গা হয় না। আবার এমনও হয়, দুই শহরের দুই কাবাবকারী একটা নগণ্য বিষয় নিয়ে সুরু করে ঝগড়াঝাটি, শেষ পর্যন্ত সমস্ত সহরেই বেঁধে যায় বাদবিসম্বাদ, তারপর সহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—সমস্ত রাজ্যময়। কিন্তু থাক এই সব চিন্তা-সমস্যা; চিন্তা-স্রোতের জায়গা নয় এটা। আর আমি নিজেই ভাবনার খেলা ভালবাসি না,—বিশেষ ক'রে চিন্তা যখন চিন্তার বাইরে এগিয়ে আসে না।

ফুলেরিয়ার ছিল ছোট্ট একটি ধূসর বেড়াল। প্রায় সব সময়ই সেটা তার পায়ের কাছে কুঁকড়ে শুয়ে থাকতো। ফুলেরিয়া কখনো চাপড়ে দিতো তার পিঠ, কখনো একটা আঙুল দিয়ে ঘাড় চুলকে দিতো আর বেড়ালটাও আরামে ক্রমেই ফুলে ফুলে উঁচু হ'য়ে উঠতো। বেড়ালটি যে ফুলেরিয়ার একেবারে প্রাণের মতো ছিলো তা নয়, চোখের উপরে দেখতে দেখতে এর প্রতি মায়া পড়েছে, এই পর্যন্ত। আফানসি অবশ্যি প্রায় সময়ই এই মায়া নিয়ে ঠাট্টা করতো ফুলেরিয়াকে।

"দেখো ফুলেরিয়া, তোমার ঐ বেড়ালটার মধ্যে এমন যে কী দেখলে বোঝা শক্ত। কী হবে ওটা দিয়ে? কুকুর হ'লেও তবু কথা ছিলো, শিকারে লাগে, কিন্তু বেড়াল?"

"আঃ, থামোনা বাপু"—ফুলেরিয়া বলে, "তুমি কথা বলবে তো বলবেই, আর কোনো কাজ নেই তোমার? কুকুর? কুকুর নোংরা, ঘর নোংরা করে, এটা সেটা ভাঙে,—কিন্তু আমার পুশি? কেমন শান্ত জীব, কারো একটু ক্ষতিও করে না কখনো।"

আফানসির চোখে অবশ্যি কুকুর বেড়াল দুই-ই সমান; ফুলেরিয়াকে একটু রাগানোই তার দরকার আসলে।

ফুলেরিয়াদের বাগান পেরিয়েই একটা মস্তো বন; সরকারটা হাতও লাগায়নি এতে, অবশ্যি পারেনি বলেই (কারণ, এতো কাছে এটা যে গাছ কাটার শব্দই শুনতে পাবে ফুলেরিয়া)। কাজেই বনটা আড়ালে থেকে থেকে বন জংগলে ভরে আছে, প্রাচীন ট্রিং গাছ ঢেকে আছে নাট-ঝোপে, দেখাচ্ছে যেনো ঝুঁটি-পা-ওয়ালা নোটন পায়রার পায়ের

মতো। বন-বেড়াল থাকে এ বনে। বুনো বেড়ালকে দজ্জাল বেড়ালের সাথে গোল পাকালে চলবে না। দজ্জাল বেড়াল ঘরের চালে পর্যন্ত লাফঝাপ মেরে দৌড়ে ফেরে; এদের স্বভাব চরিত্র শহরে থাকে বলে বন-বেড়ালের চেয়ে ঢের ঢের ভদ্র। শহুরে বেড়ালের চেয়ে বন-বেড়াল লাজুক ও গম্ভীর; তাদের চেহারাও শুক্‌নো, মোটা বুনো গলায় তারা মিউ মিউ করে। প্রায়ই তারা ভাঁড়ার ঘরের নীচে চলে আসে মাটি খুঁড়ে, মাংস চুরি করে খায়; এমন কি ছন-বন থেকে জানালার মধ্য দিয়ে লাফিয়ে এসে হেঁসেলে ঢোকে পর্যন্ত,—যখনি দেখে যে পাচকটি ঘরে নেই। বাস্তবিকই, কোন মহৎ বৃত্তি নেই তাদের, লুণ্ঠন করেই বাঁচে তারা, চড়ুইদের হত্যা করে তাদের বাসায় বাসায়। এই বেড়ালগুলি অনেকদিন থেকেই ভাঁড়ার ঘরে একটা গর্ত খুঁড়ে ফুলেরিয়ার এই শান্ত বেড়ালটির গন্ধ পেয়ে গেছে; এবং শেষ পর্যন্ত একদিন তারা একে নিয়ে গেলো ভুলিয়ে,—একদল সৈন্য যেমন সরল এক কিষাণ মেয়েকে ভুলিয়ে নেয়। ফুলেরিয়া দেখতে পেলো পুশি তার ঘরে নেই; চারদিকে অমনি খোঁজ পড়ে গেলো, কিন্তু কোথাও নেই সে। তিন দিন গেলো, ফুলেরিয়ার দুঃখ লাগলো, কিন্তু দিনে দিনে ভুলে গেলো এ সব। তারপর একদিন, সে যখন নিজেই বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখে ফুট-তরমুজ তুলছিলো,—হঠাৎ শুনতে পেলো খুব করুণ একটা মিউ মিউ ডাক। অভ্যাস বশেই সে ডাক দিলো—"পুশি, পুশি!" আর সাথে সাথেই তার ধূসর বেড়ালটা জংলা ঘাস থেকে বেরিয়ে এলো,—শুকনো চেহারা, হাড়গোড় জাগানো; স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে অনেকদিনই খায়নি সে। ফুলেরিয়া তাকে কাছে ডাকতে লাগলো, কিন্তু বেড়ালটা শুধু মিউ মিউ করছিলো, কাছে এগোতে সাহস পাচ্ছিলো না, এ কদিনেই সে বুনো বনে গেছে। ফুলেরিয়া তবুও ডাকছে, বিড়ালটি আস্তে আস্তে পাঁচিল পর্যন্ত এলো তার পিছু পিছু এবং পুরোনো চেনা সব জায়গা দেখে ভেতরেও গেলো। তাড়াতাড়ি দুধ ও মাংস আনালো ফুলেরিয়া ও নিজে সামনে বসে খুশী মনে দেখছিলো তার গোগ্রাসে খাওয়া; চুক্ চুক্ ক'রে সে দুধটুকুও নিঃশেষে খেয়ে নিলো। এই পালানো বেড়ালটা যেনো চোখের সামনেই দেখতে দেখতে মোটা হ'য়ে উঠ্‌লো, শেষে লোভীর মতোও খাচ্ছিল না আর। ফুলেরিয়া তার গা চাপড়ে দেবার জন্য হাতখানা বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু এই অকৃতজ্ঞ জীবটি এরি মধ্যে মিশ্‌ খেয়ে গেছে

বন-বেড়ালের সংগে, অথবা গ্রহণ করেছে স্বাধীন দরিদ্র জীবনের বৈচিত্র, (সত্য সত্যই বুনো বেড়াল শূন্য ভাঁড়ারের ইঁদুরের চেয়েও দরিদ্র !),—সে যে কারণেই হোক,—একলাফে সে জানালা দিয়ে চলে গেলো ; এবং ঘরের কোন চাকর বাকর তাকে একটুও ধরে রাখতে পারলো না।

বুড়ীকে কিন্তু এই ঘটনাটুকুই গম্ভীর এক চিন্তায় আচ্ছন্ন করে ফেললো ; নিজের মনেই সে বলছিলো—"আমার মরণ ঘনিয়ে আসছে, এ তারি ইংগিত !" এবং এই ভাবনা কিছুতেই আর তার মন থেকে মুছে গেলো না। সমস্ত দিন মন তার ভারী হ'য়ে রইলো। বৃথাই আফানসি হাসিঠাট্টা করতে চেষ্টা করলো ; কিছুতেই সে বুঝে উঠতে পারলো না,—হঠাৎ ফুলেরিয়ার হলো কি ? ফুলেরিয়া কোন জবাব দেয় না, বা দিলেও এমন ভাবে দেয় যে আফানসি ঠিক নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না। পরের দিনই ফুলেরিয়া অনেকটা শুকিয়ে গেলো।

"কি হ'য়েছে তোমার ফুলেরিয়া, নিশ্চয়ই অসুখ ক'রেছে কোনো।" "না অসুখ করেনি ; আফানসি, তোমাকে একটা কথা বলবো। আমি বুঝতে পাচ্ছি এই গ্রীষ্মেই মারা যাবো আমি, আমার মৃত্যু ইতিমধ্যেই আমাকে নিতে এসেছে।"

আফানসির ওষ্ঠ দুটি ব্যথায় কুঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। জোর করে মুখে একটি হাসি ফুটিয়ে রেখে তার সমস্ত মনটাকে সে চেপে রাখতে চেষ্টা করছিলো ; বললো সে—

"কি যে বলছো তুমি ! ভগবান না করুন ! তুমি ভোদকাই খেয়ে থাকবে,—একটু কড়া রকমেরটা।"

"না, আফানসি, কড়া মদ খাইনি আমি।" আফানসি যে ফুলেরিয়াকে ঠাট্টা করছিলো সেজন্য আহতই হলো সে ! ফুলেরিয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখে তার একফোঁটা অশ্রু জেগে উঠলো।

"আফানসি, আমার একটা অনুরোধ"—ফুলেরিয়া বলতে লাগলো—"আমি মরে গেলে গির্জা পাঁচিলের সামনে রেখো আমাকে ; ধূসর পোশাক দিও আমার গায়ে, যেটার উপরে ছোট ছোট ফুল আঁকা, লাল লাল ডোরা কাটা ; সাটিনের জামা পরিও না। মরা মানুষের আবার কি দরকার ওসব ? বরং রেখে দিও, কাজে লাগবে তোমার, ভালো

একটা পোযাক ক'রে নেবে ও দিয়ে। অতিথিরা এলে তখন ঠিকমতো বেশবাস করতে পারবে।"

"ওঃ ভগবান! কী যে বলছো তুমি, ফুলেরিয়া! মরণ, সে হয়তো অনেক বছর পরের কথা, কিন্তু তুমি যে এক্ষণি আমাকে ভয় লাগিয়ে দিয়েছো।"

"না, আফানসি, আমার মরণের কথা এখন আমি ঠিকই বুঝতে পাচ্ছি। আমার জন্য দুঃখ ক'রোনা তুমি। বুড়ী হ'য়েই মরছি আমি; অনেক অনেক বছরই তো বাঁচলাম। আর, তুমিও বুড়ো এখন; শিগগিরি দেখা হবে আমাদের।"

আফানসি এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

"আফানসি, কেঁদোনা, কাঁদা যে পাপ! কাঁদলে ভগবান রাগ করবেন, পাপ হবে। মরছি বলে আমার মোটেই দুঃখ নেই, কিন্তু—একটা কথা ভেবে প্রাণ আমার কিছুতেই বুঝ মানছে না (তার বুক ভেঙে বেরিয়ে এলো একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলো না ফুলেরিয়া)—"তোমাকে যে কার হাতে দিয়ে যাবো, আমি মরে গেলে কে যে দেখবে তোমাকে! একেবারে আপন-ভোলা তুমি, একেবারেই ছেলেমানুষ! তোমাকে দেখা-শোনা করবে প্রাণের টানে—এমন কেউ যে তোমার কাছে থাকা দরকার।"

এই সব কথা বলার সময় তার মুখে ফুটে উঠ্লো গভীর মর্মান্তিক ব্যথার এমন এক স্পষ্ট ছবি! তখন এমন কোন পাষাণ নেই যে ব্যথিত না হয়ে পারে।

"দেখো, জাবদোহা!"—উদ্দেশ্য বশতই গৃহরক্ষককে ডেকে আনিয়েছে সে, এবার তাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলো—"জাবদোহা, আমি তো চলে যাচ্ছি, মনিবকে দেখো তোমার! নিজের চোখের মণির মতো যত্ন করবে, তোমার নিজের সন্তানের মতো। মনে রাখবে ওর খুসীমতো খাবারই রান্না হয় যেনো, পরিষ্কার জামা চাদর রাখবে ওর জন্য। কোনো অতিথি এলে সবচেয়ে ভালো পোষাক পরিয়ে দেবে, নইলে যে ভোলা মানুষ, হয়তো শোবার পোশাক পরেই এগিয়ে যাবে, আজো প্রায়ই ভুলে যায় কোনদিন ছুটি, আর কোনদিন বা ছুটি না। একটিবারও এর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিওনা, পলকের জন্যও না। জাবদোহা! তোমার জন্য পরপারেও আমি মুক্তি কামনা করবো, ভগবান সুখে রাখবেন

তোমাকে। মনে রেখো, নিজে তুমি বুড়ো, বেশীদিন আর বাঁচবেও না, কাজেই পাপ কোরোনা। ওকে ঠিকমতো না দেখলে কোনো শান্তি পাবেনা জীবনে। তোমাকে অশান্তিতে রাখার জন্য আমি নিজেই তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো, তোমার শেষদিনগুলিতে শান্তি পাবেনা একটুও। তুমিও পাবেনা, তোমার ছেলেরাও না;— তোমার ঘরের প্রত্যেকেই ভগবানের আশীস্ থেকে বঞ্চিত হবে তখন।"

হায় বেচারা নারী! তার সামনেই এসে দাঁড়িয়েছে তার মৃত্যু, কিন্তু ভাবছিলো না সে তার আত্মা বা পরকাল। তার হতভাগ্য এই জীবন-সাথীর কথাই তার একমাত্র ভাবনা,—তাকে সে যে ফেলে যাচ্ছে একেলা, অসহায়! আশ্চর্য নিপুণতার সংগে সাজিয়ে গুছিয়ে নিলো সে সমস্ত কিছুই,—তার বিরহ যাতে আফানসির চোখে প্রতিপদে ধরা না পড়ে। তার নিজের মৃত্যু যে ঘনিয়ে এসেছে এ বিশ্বাস তার এতো দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়ালো এবং তার মনও এজন্য এমন ভাবে প্রস্তুত হ'য়ে রইলো যে সত্য সত্যই সে কয়েক দিনের মধ্যেই বিছানা নিলো, কিছুই আর মুখে তুলতে পারলো না! আফানসি তার বিছানা ছেড়ে একটি পলকও নড়লো না কোথাও, নীরব হ'য়ে শিয়রে বসে রইলো শুধু! ফুলেরিয়ার মুখের দিকে অশ্রুচোখে তাকিয়ে সে বলছিলো—"ফুলেরিয়া, এখন একটু কিছু খাও তুমি!"

ফুলেরিয়া নীরবে চেয়ে ছিলো শুধু; অনেকক্ষণ পরে কিছু বলতে চাইলো যেনো, ওষ্ঠ দুটি নড়ে উঠ্‌লো—এবং তার শেষ নিশ্বাসটি মিলিয়ে গেলো।

আফানসি একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়লো। সব কিছুই তার কাছে এতো ভয়ানক মনে হচ্ছিলো যে কাঁদতে পর্যন্ত পাচ্ছিল না; ফুলেরিয়ার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে,—সেই মৃতদেহের যেনো সে কোনো অর্থই বুঝতে পাচ্ছে না।

তার শেষ সাধ অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়ে তাকে শুইয়ে রাখা হ'লো টেবলের উপর,— বুকের উপর হাত দুখানা ভাঁজ করা। আফানসি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দেখছিলো সব। আঙিনা ভরা নানা রকম লোকজন।

অতিথিরা কথা বলছিলো, চোখের জলও ফেললো, মৃত মহিলার দিক চেয়ে তারা নানা গুণের কথা আলোচনা করছিলো ও আফানসিকে দেখছিলো। কিন্তু আফা-নসির কাছে সমস্তই লাগছিলো অদ্ভুত নতুন। এবার শবাধার নিয়ে যাওয়া হ'লো, পেছনে

অনেক লোকের ভিড়। আফানসিও চলতে লাগলো। পুরুতরা প্রস্তুত; আকাশে উজ্জ্বল সূর্য, মায়ের কোলে কাঁদছে শিশুরা; পাখীর গান আকাশে, ছেলেরা ছুটোছুটি কচ্ছে, স্কিপ করছে রাস্তার পাশে। এবারে শবাধারটা রাখা হ'লো কবরের উপর; আফানসিকে এগিয়ে এসে শেষবারের মতো মৃত দেহটিকে চুম্বন করতে বলা হ'লো। সেও ধীরে ধীরে গিয়ে তাই করলো,—চোখে তার অশ্রু,—কেমন উদাসীন অশ্রু! শবাধার নামানো হোলো, পুরুত এক কোদালি মাটি ফেললো তার উপর। মোটা ভাঙা গলায় ডেকন ও তার সহকারী দুজন গান গাইতে লাগলো;—'ইম্‌মরটাল মেমোরি' বা চিরন্তন স্মৃতিগাথা। উপরে নির্মেঘ উজ্জ্বল আকাশ। মজুররা কোদালি নিয়ে লেগে গেলো কাজে এবং দেখতে দেখতে কবরটা ভরে গেলো মাটিতে। বুড়ো এবারে সামনে এগিয়ে এলো: সবাই স'রে স'রে পথ দিলো তাকে,—কী যে করে সে দেখবে। বুড়ো শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকালো সবাইর দিকে এবং হঠাৎ বললো—"তোমরা ওকে কবর দিয়েছো কেন?"—বলতে বলতে চাপাকান্নায় গলা ভার হয়ে এলো, আর সে বলতে পারলো না।

আফানসি বাড়ী ফিরে দেখে শূন্য পড়ে আছে তার ঘর। ফুলেরিয়ার চেয়ারটাও নেই সেখানে। তখন সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। প্রবল শোকোচ্ছ্বাসে কাঁপতে কাঁপতে অবিরাম কাঁদতে লাগলো শুধু। কোনো বুঝ-প্রবোধ, কোনো সান্ত্বনা নেই তার,—তার চোখে যেনো ব্যথার বন্যা নেমে এসেছে অফুরন্ত ধারায়।

তারপর কেটে গেছে পাঁচ বছর। কতো যে দুঃখ-শোক কালের বুকে স'য়ে যায়! কালের জোয়ারমুখে কাঁপতে কাঁপতে কোন বেদনা-কামনাই বা টি কে থাকে চিরদিন!...

* * * * *

ফুলেরিয়ার মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে আর একবার এদিকে এসেছিলাম; আফানসিদের বাড়ীতে সেই পুরানো পরিচিতদের দেখতে গেলাম;—কতো যে আরামের দিন কাটিয়েছি এখানে, প্রাণ ভরে খেয়েছি কতো সেরা সেরা খাবার,—সেই প্রাচীন দিনের ভদ্রমহিলাদের নিজ হাতে পরিবেশন করা খাবার!

বাড়ীর কাছে এগোতেই চোখে পড়ল,—এরি মধ্যেই কতো যে পুরোনো হয়ে গেছে সে বাড়ী। কিষাণ-কুটিরগুলি পড়ে আছে একপাশে, নিশ্চয়ই তাদের মনিবেরাও আজ আর

নেই! আঙিনার চার পাশের বেড়া ও পাঁচিল ভেঙে ভেঙে ধ্ব'সে পড়েছে; নিজ চোখেই দেখলাম, পাচকটি বেড়া ভেঙে কাঠ নিচ্ছে ষ্টোভ ধরাতে,—যদিও আর দুপা এগোলেই কিন্তু কাঠের গোলা! ব্যথিত মনে দোর পর্যন্ত এলাম। সেই কুকুর নিরোস, ট্রিষ্টি এখন বুড়ো, খোঁড়া! পোকাধরা লেজ নেড়ে নেড়ে ডাকছিলো তারা। এক বুড়ো আমাকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন। হ্যাঁ, এ সে-ই। দেখেই চিনলাম আমি। আগের চেয়ে সে দ্বিগুণ বাঁকা হয়ে গেছে! এদিকে দেখছিলাম, প্রত্যেক কিছুতেই একটা অযত্ন বিশৃংখলা, কিসের যেনো স্পষ্ট অভাব! তখন সমস্ত মন আমার ছেয়ে গেলো এক অদ্ভুত অনুভূতিতে!—কোনো লোকের চিরসাথী ও প্রিয়-স্ত্রীর মৃত্যুর পরে সেই লোকের ঘরে ঢুকবার সময় প্রথম যেমন এক বিচিত্র মানসিক অবস্থা। একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষকে পরে একদিন শুকনো কোঁকড়ানো দেখলেও যেমনটা হয়! যেদিকে তাকাও, সমস্ত জিনিষেই ফুলেরিয়ার সযত্ন হাতের অভাব। টেবলের উপরে ছুরি, হাতল নেই তার! আগের মতো সযত্নে তৈরী হয় না খাবার। জমি জমার কথা আর জানতে চাইনি, গোলা-বাড়ী দেখেই আমার ভয় হচ্ছিলো। খেতে বসলাম,—একটি মেয়ে এসে একখানি তোয়ালে জড়িয়ে দিলো আফানসির গায়ে। ভালোই যা হোক! নইলে, তার হাতের খাবার পোশাকেই ছড়িয়ে পড়তো সব। আমি তাকে একটু খুশী করতে চেষ্টা করলাম, বললাম নানান খবরাখবর। আগের মতোই হাসিমুখে সে শুনতে লাগলো সব, কিন্তু মাঝে মাঝে সে চেয়ে ছিলো শূন্য দৃষ্টিতে! মন যেনো তার খেই হারিয়ে গেছে।

কতোবার সে এক চামচে পায়েস মুখে পুরতে গিয়ে এগিয়ে দিচ্ছিলো নাকের কাছে; মাংসের টুকরোতে কাঁটাটা দিতে গিয়ে লাগাচ্ছিলো মদের বোতলে। মেয়েটি তখন তার হাতখানা ধরে ধরে এনে দিচ্ছিলো মাংসের কাছে। এর পরের খাবারটার জন্য বসে থাকতে হ'লো অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

আফানসিও তা লক্ষ্য ক'রে বলছিলো—"এরা এতো দেরী করছে কেন খাবার আনতে?" দরজার একটা ভাঙা ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম, যে ছেলেটা আমাদের প্লেট নিয়ে গেলো সে ব'সে ব'সে ঝিমোচ্ছে একটা বেঞ্চিতে, এদিকে তার খেয়ালও নেই কণামাত্র!

"এই সেই ডিস্"—ক্রিম-টকমাখা কার্ড-কেক এলে আফানসি বলেছিলো—"এই সেই

ডিস্—" তার স্বর কাঁপছে, এক ফোঁটা অশ্রু চোখের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে গড়িয়ে পড়তে চাচ্ছে ; কিন্তু প্রাণপণে সে চেপে রাখছিলো তা। "এই সেই ডিস্, যা একদিন আমার··· আমার প্রিয়—" আর সে হুহু করে কেঁদে উঠ্লো, হাত থেকে প্লেটটা উল্টে গিয়ে মেজেতে পড়ে ভেঙে গেলো, ঝোল ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত গায়ে। শূন্য মনে সে ব'সে আছে শুধু, হাতে খালি চামচটা, চোখের জল অবাধ ধারায় বেয়ে পড়তে লাগলো তার গায়ের তোয়ালের উপর।

এই দেখে ভাবছিলাম আমি—"হায় ভগবান! দীর্ঘ পাঁচটা বছর, সর্বগ্রাসী পাঁচটা বছর ; আর ঐ শীর্ণ বিমূঢ় বুড়ো,—এর বুকে যে কোনো দিন ভালোবাসা ছিলো দেখে পর্যন্ত বিশ্বাস হতে চায় না,—সমস্ত জীবনটাই কাটালো যার চেয়ারে ব'সে ব'সে, শুকনো মাছ আর বিয়ার খেয়ে খেয়ে, সরল মনের সব গল্প ব'লে ব'লে!—আর, তারো এই অসহ্য উদ্দাম শোক! আমাদের বুকের মধ্যে বিজয়ী শক্তি কোনটা,—ভালোবাসা, না অভ্যাস? অথবা,—মানুষের এই উন্মুখ-মুখর বৃত্তি, এই সব কামনার কল্লোল, উত্তাল ভালোবাসা সমস্তই যৌবনের ফলমাত্র,—যৌবনের রাজ্যেই কি শুধু তাদের বিষম গভীর আধিপত্য?

তা যাই হোক, সে সময়ে আমাদের সমস্ত কামনা-ভালোবাসাই ছেলেখেলা মনে হ'লো সুদীর্ঘ বছরের এই অচেতন-প্রায় অভ্যাসের কাছে! অনেকবার সে তার স্ত্রীর নাম মুখে আনতে চেষ্টা করলো ; কিন্তু নাম বলার মাঝখানেই নিবিড় ব্যথায় তার শান্ত মুখখানি কুঞ্চিত হয়ে উঠ্ছিলো। এবং এমন ভাবে সে কাঁদতে লাগলো যে, আমাদের বুকে পর্যন্ত গিয়ে গভীর ভাবে লাগলো। বুড়োরা সাধারণত যে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে কাঁদে—সে অশ্রু নয় এ ; খাবার থালার উপরে তারা যে চোখের জল ফেলে তাও নয়। এ হ'লো হিম-হয়ে-আসা প্রাণের আড়ালে সঞ্চিত গভীর বেদনার বাঁধভাঙা জোয়ার!

এরপরে বেশীদিন আর বাঁচেনি সে। কিছুদিন হয় তার মৃত্যুর খবর পেলাম। আশ্চর্য ঘটনা, তার মৃত্যুর পরিস্থিতিও অনেকটা ফুলেরিয়ার মতোই। আফানসি একদিন একটু সাহস ক'রেই বাগানে বেড়াচ্ছিলো। স্বভাব মতোই শূন্য মনে সে হাঁটছিলো একটি পথ ধ'রে ; তখন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। হঠাৎ সে শুনতে পেলো তারি পেছনে কে যনো স্পষ্ট গলায় ডাক দিলো—'আফানসি।' ফিরে দেখে কেউই নেই! সবদিকেই

খুঁজলো সে, ঝোপের ফাঁকে উঁকি মারলো,—কোথাও কেউ নেই! স্বচ্ছ দিন, আকাশে উজ্জ্বল সূর্য। এক মিনিট কাল ভাবলো সে; তার পরেই মুখখানা তার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো—"ও, ফুলেরিয়াই ডাকছে আমাকে!"

নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময়ে তুমিও হয়তো শুনেছো তোমার নাম ধ'রে ডাকা। সবাই বলে সাধারণত, এক আত্মা নাকি আর আত্মাকে ডেকে ফিরছে, তার মানে, কারো দিন ফুরিয়ে এসেছে। রহস্যময় অমন ডাক শুনলে আমার কিন্তু বরাবরই ভয় লাগে খুব। মনে আছে, ছোট বেলায় প্রায়ই শুনতাম অমন ডাক। হঠাৎ যেনো শুনলাম ঠিক পেছনেই কে ডাক দিলো। সাধারণত, সে-দিনটা হয় উজ্জ্বল, পরিষ্কার, একটা পাতাও নড়ছে না বাগানে, মৃত্যুর মতো নিথর স্তব্ধতা, এমন কি কিছুক্ষণ গংগাফড়িং পর্যন্ত ভুলে গেছে ডাকতে,—কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই। সত্যিই, স্বীকার কচ্ছি আমি,—মেঘমুক্ত এক দুপুরে অমন ডাক শুনলে ভয়ে এমন শিউরে উঠি! ঠিক তেমনটা হয়না আমাকে যদি অমাবস্যার দুর্যোগ রাতে এক গভীর বনের মধ্যে একা একা থাকতে হ'তো তবু! তখন সাধারণত, আমি ভয়ের চোটেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসতাম বাড়ীতে এবং সামনে যে কোনো একটা মানুষ দেখলে তবেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত, হ'তে পারতাম। ধীরে ধীরে কেটে যেতো তখন ভয়ংকর সেই রহস্য নীরব মায়া।

ফুলেরিয়াই তাকে ডেকেছে,—আফানসি তার অন্তরের এই দৃঢ় বিশ্বাসের কাছে নিজেকে একান্তভাবেই সমর্পন করলো, ঠিক বাধ্য শিশুর মতো। দিনে দিনে শুকিয়ে গেলো সে,—একটু আধটু কাশিও আছে। তেল-শূণ্য আলোর মতো ক্ষীণ হ'তে হ'তে একদিন শেষে জীবন-দীপ তার একেবারেই নিভে গেলো,—ক্ষীণ শিখাকে জিইয়ে রাখার কিছু না থাকলে হয় যেমন! মরবার সময় শুধু এটুকু বললো সে,—'ফুলেরিয়ার পাশেই রেখো আমাকে'।

তার ইচ্ছামতোই ফুলেরিয়ার পাশে রাখা হ'লো তাকে। কবরের সময় লোক ছিলো খুব কমই,—ভিখারী ও কিষাণরা ছিলো আগের বারের মতোই। ছোট সেই ঘরটি এবারে একেবারেই ফাঁকা।

প্রাচীন ফ্যাসানের ভালো ভালো জিনিষ ছিলো যা কিছু তার প্রায়ই তাড়াতাড়ি সরিয়ে

নিলো গৃহরক্ষকটি ; বাকী যা ছিলো তা লাগলো ধূর্ত সরকার ও মোড়লের কপালে। এবং দেখতে না দেখতে সেখানে এসে উঠলেন এক দূরআত্মীয় (জানিনা, কোথাকার তিনি) ; তিনিই নাকি এখন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। আগে ছিলেন তিনি লেফটানেণ্ট (সে যে কোন সৈন্যবিভাগে তাও আমার অজ্ঞাত)। এই লোকটি হলেন সাংঘাতিক রকম সংস্কারক। তিনি জমি-জমার ব্যবস্থায় লক্ষ্য করলেন ক্ষমাহীন শৈথিল্য ও একান্ত অব্যবস্থা এবং সমস্ত কিছুরই আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন বোধ করলেন,—সবকিছুকেই যথাযথ ও উন্নত ক'রতে হবে। চমৎকার ছটা বিলিতি কাঁচি আনালেন এবং প্রত্যেকটা ঘরে নির্দিষ্ট নম্বর লাগালেন এক একটা। ফলে, এমন সুনিপুণ ব্যবস্থাই হ'লো যে সমস্ত সম্পত্তিই তিন মাসের মধ্যে লালবাতি জ্বালিয়ে ট্রাষ্টির হাতে গিয়ে উঠলো।

ভালো-মানুষ ট্রাষ্টিরা (তাদের একজন অবসর প্রাপ্ত কর-নির্দ্ধারক, জীর্ণ ছিন্ন ইউনিফর্ম পরা লেফটানেণ্ট)—কিছুদিনের মধ্যেই তারা খড় কুটোটি পর্যন্ত তুলে নিয়ে পরিষ্কার ক'রে দিলেন সব। জীর্ণ কুটিরগুলি নির্বিবাদে ধরাশায়ী হ'লো একে একে। কিষাণরা মদ ধরলো অনেকেই, বাকী যারা অন্যত্র গেলো পালিয়ে। যথার্থ উত্তরাধিকারীটি কিন্তু পাঞ্চের বোতল ও ট্রাষ্টিদের নিয়ে চালাতে লাগলেন চমৎকার, ভুলেও একবার দেখতে যেতেননা জমিজমা ; এদিকে প্রাণ টেঁকে না বেশীদিন। আজো পর্যন্ত সে লিট্‌লরাশিয়ার সমস্ত মেলাতেই গাড়ী করে ঘুরে বেড়ায়, নিখুঁত আগ্রহে দরদস্তুর করে সব পাইকারী মাল,—যেমন ময়দা দড়ি ছালা, মৌ—এই সব। কিন্তু কেনার বেলায় কেনে শুধু ছোটোখাটো টুকরো-টাকরা জিনিষ—দেশলাই কাঠি, পাইপ পরিষ্কার করার শলাকা বা এম্‌নি কিছু। সব মিলেও দাম ওঠে বড়ো জোর এক টাকা।

আইভান সার্গেভিচ্ টুর্গেনিভ

(১৮১৮—১৮৮৩)

রুশ লেখকদের মধ্যে ইনিই প্রথম মর্যাদা পান ইউরোপে। ইনি বিখ্যাত উপন্যাসিক ও গল্প লেখক; জন্ম ওরেলে,—গ্রাম্য এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। মা ছিলেন অত্যন্ত বদ-মেজাজী, অত্যাচারী; শিক্ষাদীক্ষা হয় নিজগৃহে, তারপর মস্কো ও পিটার্সবুর্গ য়ুনিভার্সিটিতে এবং সর্বশেষে বার্লিনে (১৮৯৩—৪০)। এখানে তিনি রাশিয়ান বুদ্ধিজীবীদলের সংগে সংশ্লিষ্ট হন এবং ফলে হ'য়ে পড়েন পাশ্চাত্যবাদী। ইনি রাজকীয় চাকুরী ছেড়ে দেন শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য এবং কবিতা ছেড়ে নাটক ও নাটক ছেড়ে গদ্য রচনায় মন দেন। "শিকারীর ভ্রমণ-ছবি"—এঁর প্রথম সফল গ্রন্থ। এঁর শ্রেষ্ঠ গল্প রচনা বহু সংখ্যক।

বিখ্যাত উপন্যাস: "রুডিন" (১৮৩৬); "ওয়ান-ইভ্নিং"; "ফাদার এ্যাণ্ড সন"। ঘটনাগুলি জড়িয়ে আছে প্রচলিত সমাজ সমস্যার সংগে।

টুর্গেনিভ শক্তিমান এক আদর্শ চরিত্র আঁকতে চেয়েছিলেন 'বারাজভ' এর মধ্যে, কিন্তু তীব্র সমালোচিত হ'য়ে চলে যান রাশিয়া থেকেই। শেষ জীবনের রচনার সুর রাশিয়া জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, আত্ম-পরিক্রমায় পূর্ণ। "স্মোক" এঁর বিখ্যাত উপন্যাস।

মৃত্যু ১৮৮৩ খৃঃ বৌগিভাল-এ, প্যারিসের নিকট। টুর্গেনিভ ফ্রান্সের সাহিত্য মহলে শেষ বয়সে সম্মান পান, মোপাসাঁর মতো যুবকদল তাকে 'মাষ্টার' মনে করতো।

তার চরিত্রচিত্রণে বিশ্লেষণ ও মনস্তত্ত্বই মূল কথা নয়। নিখুঁত সৌন্দর্যে গড়ে-তোলা এক কাব্যিক পরিবেশের মধ্যে তার চরিত্রগুলি ফুটে ওঠে সহজ স্বাভাবিকতায়। বাণীভংগী সযত্ন-সরল, স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে উচ্ছল; উনিশ শতাব্দীর সেই ছিল শ্রেষ্ঠ রচনার আদর্শ। নরম তুলিতে আঁকা প্রান্তরের ছবিই এঁর আশ্চর্য-সুন্দর ও বিশিষ্ট রচনাংশ।

আকুলিনা

তখন শরতকাল, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। আমি একটা বার্চ বনে ব'সে আছি। ভোর থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে কুয়াশার মতো, থেকে থেকে ফুটে উঠ্ছে রোদ। আবহাওয়া অস্থির। এক এক সময় সারা আকাশ ঢেকে যাচ্ছে শুভ্র কোমল মেঘে, আবার ক্ষণেকের জন্য নানা জায়গা মেঘ মুক্ত হ'য়ে উঠছে; তখন সেই ছিন্ন মেঘের আড়ালে ফুটে উঠছে নীলোজ্জ্বল কোমল নয়নের মতো নভস্তল। ব'সে ব'সে আমি চারধারে তাকিয়ে দেখ্ছি, আর কান পেতে শুধু শুনছি।

মাথার উপরে পল্লবদলের অস্ফুট মর্মর। শুধু তাই শুনেই বলা যায়, তখন কোন ঋতু। সে মর্মর গুঞ্জন বসন্তের আনন্দময় স্মিত শিহরণ নয়, গ্রীষ্মের অস্ফুট কানাকানি ও দীর্ঘ আলাপও নয়, আবার বিলম্বিত শরতের ভাঙা ভাঙা কথাও নয়,—এ তার অস্ফুট তন্দ্রালস ভাষা। গাছের মাথায় মৃদু মর্মরে বয়ে চলেছে ধীর বাতাস। সূর্য মেঘের আড়ালে লুকোচ্ছে ও বেরিয়ে আসছে; আর এদিকে ধারা-সিক্ত বনের অন্তঃস্থলেও দেখা যাচ্ছে বিচিত্র পরিবর্তন; কখনো উজ্জ্বল, যেন তার অন্তরের সকল কিছুই হঠাৎ হেসে উঠছে। মাঝে মাঝে লীলায়িত বার্চ গাছগুলির শীর্ষ দেশ সহসা ঝল্কে উঠ্ছে উজ্জ্বল-শুভ্র রেশমের মতো, মাটিতে বিছানো ছোট ছোট পাতাগুলি যাদুর মতো রঙিয়ে উঠ্ছে হলদে-সোনালি রঙে। তরংগায়িত দীর্ঘ ব্রাকেনের সুন্দর শাখাগুলি দৃষ্টির সামনে জটলা বেঁধে আছে; পাকা আঙুরের মতো তাদের রঙ্! এবং আবার যেনো সব কিছুর উপরেই নীলাভ ছায়া এসে পড়ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে উজ্জ্বল রঙবাহার। এবারে বার্চ গাছগুলি দেখাচ্ছে আবছা শাদা,—শীতের ম্লান রোদ ছড়িয়ে পড়ার আগে শেষ-রাতের তাজা তুষারের মতো।

স্পষ্টভাবে বিবর্ণ হ'য়ে উঠলেও বার্চ গাছগুলির প্রায় পাতাই তখন সবুজ; কেবল এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে দু একটি কচি পাতা, লাল বা সোনালি। বৃষ্টি ভেজা স্বচ্ছ

সুকোমল শাখাজালের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো ক্রমে এসে পড়েছে সেই কচি পাতার উপর, তখন পাতাটি যেভাবে জ্বলে উঠছে তা সত্যিই চেয়ে দেখবার মতো। একটি পাখীর ডাকও শোনা যাচ্ছে না কোথাও, তারা সবাই মিলে অদৃশ্য হ'য়ে আছে; মাঝে মাঝে কখনো বা ঘণ্টা ধ্বনির মতো বেজে উঠছে টম্‌টিটে পাখীর আওয়াজ। বার্চের এই ঝোপটার মধ্যে বসবার আগে দীর্ঘ আসপেন বনের মধ্য দিয়ে আসছিলাম। সংগে আমার কুকুরটা।

এখানে আমি স্বীকার করছি, ম্লান শুভ্র-দেহ, ও সবুজ পাতা ভরা আসপেন গাছগুলিকে তেমন পছন্দ করিনা।......এদের গোলাকার বিপর্যস্ত পাতাগুলির শিহরণও ভালো লাগে না। তবে, ছোটো ছোটো ঝোপ ঝাড় থেকে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে এরা যখন গ্রীষ্মের কোনো বেলাশেষে অস্ত-যাত্রী সূর্যের রশ্মিজালের দিকে মুখ ক'রে অফুরন্ত আভায় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত, আর কাঁপতে থাকে শুধু—তখনি একে লাগে সুন্দর। আবার কোনো পরিষ্কার দিনে বায়ু হিল্লোলে যখন এরা তরংগায়িত ও মর্মরিত হ'য়ে নীল আকাশের সংগে কানাকানি করে, এবং এর প্রত্যেকটি পাতাই সুদূরে উড়ে থাকার বাসনায় ছিন্ন হ'তে প্রাণপণ চেষ্টা করে,—তখনও একে লাগে সুন্দর। কিন্তু সাধারণত, আমি গাছটাকে পছন্দ করি না। তাই এখানে না থেমে বার্চবনে চলে আসি, আরাম ক'রে বসি একটা গাছের তলায়।.. ...তারপর চারিদিকের সব দৃশ্যের মধ্যে ডুবে গিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়ি।......কতোক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম বলতে পারি না; কিন্তু যখনি চোখ মেললাম, বনের সারা প্রাণ সূর্যালোকে ভ'রে গেছে, আনন্দে মর্মরিত পল্লবদলের উপর দিয়ে গাঢ় নীলাকাশ ঝলমল করছে; প্রবল হাওয়ার চোটে কোথায় উড়ে গেছে মেঘেরা; আবহাওয়াই বদলে গেছে।......বাতাসে যেনো শুষ্ক সজীবতা। মনে হ'চ্ছে বাদল-দিনের শেষে আজকের সন্ধ্যাটি হবে শান্ত, সমুজ্জ্বল।

আমি উঠে যাচ্ছি আবার শিকার খুঁজতে,—এমন সময় সহসা আমার চোখ পড়লো একটি নিশ্চল মনুষ্যমূর্তির উপর। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম। এক চাষী-তরুণী; হাত বিশেক দূরে সে ব'সে আছে। চিন্তায় তার মাথা নত, হাতদুখানি এলিয়ে আছে কোলের উপর; আধোখোলা এক মুঠোতে ধরা রয়েছে বুনো ফুলের একটি গোছা, ফুলগুলি হাওয়ার বেগে

তার চৌখুপী পেটিকোটের উপর কাঁপছে। গলা ও হাত পর্যন্ত আঁটা তার গায়ের পরিষ্কার শাদা জামাটি তার দেহখানিকে জড়িয়ে আছে ভাঁজে ভাঁজে, হলুদ রঙ্‌ দু ছড়া গুটির মালা তার গলা থেকে বুকের উপর এসে পড়েছে। অপরূপ সুন্দরী সে। সোনালি রঙের তার সুন্দর কেশভার কপালের উপর নামিয়ে আধো-চাঁদের মতো ক'রে সযত্নে বাঁধা, তার উপরে বাঁধা গাঢ়লাল একটি ফিতে। তার মুখের রঙ্‌ ঈষৎ সোনালি। আমি তার চোখদুটি দেখতে পেলাম না,—কেন না চোখদুটি সে একবারো উপরে তোলেনি। কিন্তু দেখতে পেলাম তার ভ্রূ-জোড়া ও চোখের দীর্ঘ-পক্ষ্মগুলি। সেগুলি ভিজা, তার গালেও সূর্যালোকে চিকচিক্‌ করছিলো শুষ্কপ্রায় অশ্রুরেখা, রেখাটি তার ব্যথা-বিবর্ণ ওষ্ঠ পর্যন্ত নেমে এসেছে। এমন কি, কিছুটা খাটো ও মোটা নাকটিও তার মুখের সৌন্দর্য নষ্ট ক'রতে পারেনি, তার ছোট্ট মাথাটি মোটের উপর সুন্দরই। তার মুখখানির ভাবেই আমি বিশেষ ক'রে আকৃষ্ট হ'য়ে রইলাম। এমন সাদাসিধা, সরল-শান্ত, এমন বিষণ্ণ তার আপন বেদনায় তা এমন শিশুসুলভ বিস্ময়ে ভরা! পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো, আর কারো প্রতীক্ষা করছে সে। বনের মধ্যে কি যেন অস্ফুট-ভাবে মট্‌ মট্‌ শব্দ ক'রলো। আর অমনি সে মাথা তুলে তাকালো চারিদিকে। স্বচ্ছ ছায়ায় তার দুটি চোখ এবার ক্ষণিকের জন্য দেখতে পেলাম,—আয়ত, উজ্জ্বল, ভীরু দুটি চোখ—ঠিক হরিণ শিশুর মতো! যেদিক থেকে অস্পষ্ট শব্দটি এসেছে, সেদিক থেকে চোখ দুটি আর না তুলে কয়েক পলক সে কান পেতে শুনলো। তারপর একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার; ধীরে ধীরে মাথাটি ফিরিয়ে নুয়ে প'ড়ে ফুলগুলি গোছাতে লাগলো। তার চোখের পাতায় রক্তিমাভা ফুটে উঠ্‌লো, ওষ্ঠ দুটি অস্পষ্টভাবে সংকুচিত হ'লো, তার ঘন পক্ষ্মরাজির নীচ দিয়ে নতুন ক'রে অশ্রু গড়িয়ে এসে গালের উপর চিক চিক ক'রতে লাগলো। অনেকক্ষণ কেটে গেলো এভাবে। বেচারী মেয়েটি মাঝে মাঝে হতাশায় হাত দুখানি কেবল নাড়াচাড়া করছিলো, কিন্তু নিজে সে একেবারেই নিস্পন্দ নীরব।

বনের মধ্যে আবার মট্‌ মট্‌ শব্দ হ'লো। এবারে চমকে উঠ্‌লো সে। শব্দটা থামলো না, ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে আসছে, আরও কাছে। এবারে স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে দ্রুত দুটি দৃঢ় পায়ের শব্দ। মেয়েটি সোজা হ'য়ে বসলো,—মনে হ'লো, যেনো ভয় পেয়ে

গেছে। তার স্থির চোখ দুটি কিসের আশায় চঞ্চল ও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। ঝোপের ভিতর থেকে তখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো একজন মানুষ। তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, হঠাৎ সে রাঙা হ'য়ে উঠলো, মুখে ফুটে উঠ্‌লো ছোট্ট একটি ফুটি ফুটি হাসি। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গেলো সে, কিন্তু বিবর্ণ বিহ্বল হ'য়ে ব'সে পড়লো। লোকটা তার পাশে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালে পর তার দিকে সে তার মিনতিভরা কম্পিত চোখদুটি তুলে চাইলো।

আমি যেখানে লুকিয়েছিলাম, সেখান থেকে লোকটির দিকে তাকালাম। স্বীকার করছি,—লোকটিকে আমার মোটেই ভালো লাগেনি। তার বাইরের চেহারা দেখে বলা যায়,—সে কোন ধনী যুবকের উদ্ধত-প্রকৃতি খানসামাই হবে। তার বেশবাসে ফুটে উঠ্‌ছে চাল আর চালিয়াতি। গায়ে তার তামাটে রঙের একটা কোট। নিঃসন্দেহ যে, তার মনিবের বাক্স থেকেই গলিয়ে এনেছে সে। কোটটা গলা পর্যন্ত আঁটা। মাথায় তার সোনালি ফিতে-দেওয়া ভেলভেটের টুপী; সেটা সামনের দিকে টেনে এনে ভ্রূ পর্যন্ত নামানো। তার সাদা সার্টের গোল ও শক্ত কলারটা তার কান দুটোকে ঠেলে তুলে কেটে বসেছে গালের উপর; জামার হাতার কলপ-দেওয়া স্কার্ফ দুটি তার লালচে বাঁকা আঙুলগুলো পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে, আঙুলগুলিতে আবার পীতাভ পীরোজা-মণি বসানো সোনা-রূপোর অনেকগুলি আংটি। নির্লজ্জের মতো তার লাল তাজালো মুখখানা; আমার যতোদূর ধারণা—পুরুষের মনে তা অপ্রীতিই জাগিয়ে তোলে,—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে মেয়েদের কাছে তা ভালো লাগে প্রায়ই। তার রুক্ষ চেহারায় স্পষ্টতই সে চেষ্টা করছিলো অবজ্ঞা ও বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলতে। অনবরত সে তার ছোট্ট চোখ দুটিকে পাকাচ্ছিলো। এবার ভুরু কোঁচকালো সে, মুখখানা বাঁকিয়ে হাই তোলার ভান করলো এবং অমনোযোগের সংগে ও কতকটা কৃত্রিম ঔদাস্যে তার কোঁকড়ানো চুলগুলিকে পিছনের দিকে ঠেলে দিলো, পুরু ঠোঁটের উপরকার হলুদ-রঙের গোঁফগুলি ধ'রে একটু টানলো,—এক কথায় সে যা হাবভাব দেখাতে লাগলো তা অসহ্য। চাষী তরুণীটিকে তার প্রতীক্ষায় ব'সে থাকতে দেখামাত্রই সে এমনি সব ভাব করতে লাগলো। ধীরে, দম্ভভরে মেয়েটির কাছে এগোলো সে, একটু কাল দাঁড়িয়ে রইলো, পকেটে হাত দুটি পুরলো এবং

মেয়েটির দিকে দেখি-কি-না-দেখি ক'রে একবার উদাস দৃষ্টি বুলিয়ে মাটিতে ব'সে প'ড়লো।

তেম্‌নি ভাবেই সামনের দিকে উদাস চোখ মেলে, পা দোলাতে দোলাতে ও হাই তুল্‌তে তুল্‌তে সে বলতে সুরু ক'রলো—"তুমি কি অনেকক্ষণ হয় এসেছো?"

মেয়েটি তখনি উত্তর দিতে পারলো না।

অবশেষে শোনা-যায়-কি-না-যায় এমনি অস্ফুট স্বরে বললো—"হ্যাঁ, অনেকক্ষণ, ভিক্টর!"

—"ও"!—ভারিক্কী চালে সে তার ঘন চুলভরা মাথা থেকে টুপিটা খুলে পদস্থ লোকের মতো চারদিকটা দেখে নিলো একবার ও আবার তার দামী মাথাটা টুপি দিয়ে সযত্ন-হেলায় ঢেকে রাখলো। তারপর বললো—"আর, আমি এবিষয়ে একেবারে ভুলেই গিছ্‌লাম। তা ছাড়া, বৃষ্টিও হচ্ছিলো।" আবারো হাই তুললো সে। "অনেক কিছু, করতে হয় আমাদের, সবকিছু দেখতে দেখতে ব্যস্, সময়টি আর পাওয়া যায় না; আর কর্তা তো বকৃছে সব সময়েই। কাল রওনা হচ্ছি আমরা······"

মেয়েটি বললো—"কালই?" তার শংকিত চোখ দুটি সে লোকটির উপর স্থির ক'রে রাখলো।

"হ্যাঁ, কাল······" মেয়েটির সারা দেহ তখন কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে পড়ছিলো। এ দেখে বিরক্তির ঝাঁঝ নিয়েই আবার সে ব'লে উঠ্‌লো—"চুপ্, চুপ্, একেবারে চুপ, আকুলিনা! কান্নাটা কিসের? তুমি তো জানোই, এটা আমি হজম করতে পারি না।" সে তার মোটা নাকটা সংকুচিত করলো—"চুপ না করলে, এক্ষুনি চলে যাবো······ কি সব বোকামি,—কি রকম নাকে কান্না!"

জোর ক'রে তাড়াতাড়ি অশ্রু চেপে রেখে আকুলিনা ব'লে উঠলো—"এই যে আমি, আর কাঁদবো না।" কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো—"তুমি কাল চ'লে যাচ্ছো? ভগবান যে কখন আবার আমাদের দেখা করিয়ে দেবেন।"

"আবার আমাদের দেখা হবে, আবার হবে। সামনের বছর যদি না হয়,—পরে হবে। মনে হচ্ছে, কর্তা পিটার্সবুর্গে সামরিক কাজে ঢুকবেন"—কথাগুলি সে উচ্চারণ করতে

লাগলো হালকা ভাবে, অনুকম্পার সংগে,—"এবং হয়তো আমরা আরো দূরে যাবো।"

আকুলিনা ব্যথিত গলায় বললো—"আমাকে তুমি ভুলে যাবে, ভিক্টর ?"

—"না, তা কেন ? তোমাকে ভুলবো না। কেবল, তুমি একটু বুদ্ধিমতী হও, বোকার মত কাজ ক'রে ব'সো না,···তোমার বাবার কথা মতো চলবে আমি তোমাকে ভুলতে পারি ?"—শান্ত ভাবে সে হাত-পা ছড়িয়ে হাই তুললো আবার।

মিনতিভরা নরম গলায় বলতে লাগলো মেয়েটি—"আমাকে ভুলোনা ভিক্টর আমার মনে হয়, আমি তোমায় যতো ভালবাসি, আর কেউই তোমায় এতো ভালোবাসতে পারে না। তোমায় আমি সব দিয়েছি···তুমি আমাকে বাবার কথা মতো চলতে বলছো··· কিন্তু কি ক'রে আমি বাবার কথা শুনে চলতে পারি ?···"

"কেন নয় ?"—চিৎ হ'য়ে সে হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে কথাগুলো যেনো পেটের ভেতর থেকে বের করলো।

"কিন্তু, কি ক'রে পারি আমি ; সবি তো তুমি জানো, ভিক্টর।"

এবার কেঁদে ফেললো সে। ভিক্টর তার ঘড়িটার ষ্টিলচেনটা নিয়ে আঙুল দিয়ে খেলা ক'রতে লাগলো।

তারপর বললো সে—"দেখো আকুলিনা, বোকা নও তুমি, কাজেই যা তা বকোনা। আমি তোমার মংগল কামনা করি,—আমার কথাটা বুঝছো ? তুমি বোকা নও, বলতে গেলে একেবারে গেঁয়োও নও, আর তোমার মা তো চাষী ছিলোনা বরাবর। তুমি অবশ্যি শিক্ষা পাওনি কোনো,—তা, তা যেমন বলা হবে তেমনিই চলবে বৈকি।"

—"কিন্তু তা যে ভয়ানক, ভিক্টর।"

—"ও বাজে কথা হে। ভয় খাবার কিছু নেই এতে। তার আরো কাছে স'রে গিয়ে সে আবার বললো—"তোমার হাতে ও কি ? ফুল ?"

"হ্যাঁ"—আকুলিনা নিরুৎসাহের মত উত্তর দিল। "আমি কতগুলো সুগন্ধি বনফুল আর গাছ তুলেছিলাম",—সে একটু খুসী হ'য়েই ব'লে যেতে লাগলো, "এ গাছগুলি বাছুরের বেশ ভাল খাবার। আর এগুলো হচ্ছে কুড়ি গাঁদা। দেখো কি সুন্দর ফুল।

আগে কথনো আমি এমন ফুল দেখিনি। এগুলো হ'চ্ছে ফরগেট-মি-নট আর মাদার-ডার্লিং, আর এগুলো আমি তোমার জন্য তুলেছি,"—এই ব'লে সে ঘাস দিয়ে বাঁধা একগোছা নীল ফুল দেখালো। এগুলো ভালো লাগে তোমার ?"

ভিক্টর আলসভরে হাত বাড়িয়ে ফুলগুলি একবার নিলো, উদাসীন ভাবে গন্ধ শুক্‌লো ও উপর দিকে চেয়ে সেগুলিকে আঙুলে ঘুরোতে লাগ্‌লো। আকুলিনা তাকে চেয়ে দেখ-ছিলো শুধু······। তার ব্যথাভরা চোখদুটিতে কী যে কোমল অনুরাগ, কী গভীর ভালবাসা আর একান্ত আত্মসমর্পণ। ভিক্টরকে ভয় করে সে। তাই সে কাঁদতে সাহস পাচ্ছিলো না। আকুলিনা ভিক্টরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে, ও সারা মুখে তার গুণগান করছে,—আর সে সুলতানের মতো আরামে শুয়ে শুয়ে চমৎকার সহিষ্ণুতা ও অনুকম্পা নিয়ে আকুলিনার প্রশংসাবাণী আস্বাদ ক'র্‌ছে শুধু। যথার্থই স্বীকার কর্‌ছি, আমি তার লাল মুখখানার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে ছিলাম। দেখ্‌তে পেলাম তার মুখে অবজ্ঞাভরা উদাসীনতার অন্তরালে রয়েছে ফাঁপা অহংকার, আর তাই ধীরে ধীরে ফেঁপে উঠ্‌ছে শুধু। সেইখনেই আকুলিনার মুখখানি দেখাচ্ছিলো এমন মিষ্টি। তার কামনা-করুণ সোহাগভরা সমস্ত প্রাণ ভিক্টরের সামনে নিবিড় বিশ্বাসে ও ভালবাসার উচ্ছ্বাসে উন্মুখ হয়ে রইলো। আর, সে···সেই লোকটি তখন ফুলগুলি ঘাসের উপর ফেলে রেখে তার কোটের পাশ পকেট থেকে পিতল-ফ্রেমের একটা চশমা বের করলো ও চোখে পরতে লাগলো। ভ্রুকুটি ক'রে নাক ও গাল দুটি ফুলিয়ে ফুলিয়ে সেটা চোখে লাগাবার যতই চেষ্টা কর্‌ছে সেটা ততই তার হাতের উপর গড়িয়ে পড়ছিল।

"কি ওটা ?" আকুলিনা এবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো। গাম্ভীর্যের সাথে উত্তর এলো,—"চশমা"

"কিসের ?'

'কেনো, ভালো ক'রে দেখবার ?"

"আমাকে দেখাও।"

"ভিক্টর এবার ভ্রূকুটি ক'রলো কিন্তু তাকে দিলো সেটা।'

"সাবধান, ভেঙোনা, চোখে দিয়ে দেখো।"

"ভয় নেই, আমি ভাঙ্‌বোনা"

চশমাটি সে চোখে দিলো,—"আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা যে," সরল মনেই সে বল্‌লো।

"কিন্তু প্রথমে তোমাকে এক চোখ বন্ধ ক'রতে হবে যে," জবাবটি দিলো সে অসন্তুষ্ট শিক্ষকের মতো।

যে চোখটির সামনে কাচখানা ধরা, আকুলিনা সেইটাই বন্ধ করলো।

"ওটা না, ওটা না, আচ্ছা বোকা!— ঐটে" বলেই সে আকুলিনাকে ভুল শোধরাবার সুযোগ না দিয়েই চশমাটা নিয়ে নিলো; আকুলিনা একটু রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো এবং একটু হেসে মুখখানি ফেরালো।

"এ দেখছি, আমাদের মতো লোকের জন্য নয়।"

"আমারও মনে হয় তাই, বাস্তবিকই!"

বেচারী নীরব হ'য়ে রইলো। গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লো সে। তারপর হঠাৎ সে ব'লে উঠলো, "তুমি ছাড়া আমার কি হবে, ভিক্টর।" ভিক্টর কাচখানা কোটের খুঁটে মুছে আবার পকেটে রাখলো। তারপর বল্‌লো, "হাঁ, হাঁ, প্রথমে তোমার কষ্ট হবে বৈকি।" অনুকম্পাভরে সে হাত দিয়ে তার কাঁধটা একবার নেড়ে দিলো। আকুলিনা ধীরে তার হাতখানি নিয়ে ভীরুর মতো একটি চুমু খেলো।

ভিক্টর তৃপ্তির হাসি হেসে ব'লে যাচ্ছিলো, "তুমি ভাল মেয়ে তা নিশ্চয়ই, কিন্তু করা যাবে কি; নিজেই তুমি দেখতে পাচ্ছ—আমি আর মনিব এখানে থাকতে পারি না। শিগগিরি শীত এসে পড়ছে; পাড়াগেঁয়ে শীত, জান তুমি—স্রেফ্‌ বিরক্তিকর। কিন্তু পিটার্সবুর্গে সবি এক্কেবারে অন্যরকম। সেখানে এমন সব আশ্চর্য জিনিষ আছে, তোমার মত বোকা মেয়ে কখনো তা' স্বপ্নেও ভাবতে পারবেনা। কত সব গাড়ী ঘোড়া, রাস্তাঘাট, মেলামেশা করবার জায়গা, আর সভ্যতা……এক্কেবারেই আশ্চর্য…।"

আকুলিনা আগ্রহে ঝুঁকে প'ড়ে শুনে যাচ্ছিলো। তার ঠোঁট দুখানি ঈষৎ ফাঁক হ'য়ে আছে, ঠিক শিশুর মতো।

মাটির উপর মোড় ফিরে শুয়ে আবার সে বলতে লাগলো,—"কিন্তু তোমাকে এসব কথা ব'লে আমার লাভ কি? তুমি এর কিছুই বুঝ্‌তে পারবে না।"

"কেনো ও কথা ব'লছ, ভিক্টর, আমি বুঝি, আমি সব বুঝি।"

"ও আমার বোঝারে! কী বুদ্ধিমতী মেয়েই!"

আকুলিনা চোখদুটি নামালো ও ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগলো, "তুমি এক সময় আমার সাথে এমনভাবে কথা বলতে না, ভিক্টর!"

"এক সময়?······এক সময়! ও!" যেনো ক্রুদ্ধ হয়ে সে মন্তব্য কর্‌লো।

দুজনেই নীরব।

ভিক্টর বললো—"আর দেরী করার সময় নেই"—কথাটা শেষ হ'তে না হ'তেই সে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠ্‌তে যাচ্ছিলো।

আকুলিনা মিনতি ক'রে বলছিলো—"আর একটু কাল থাকো।"

"কিসের জন্য?······তোমাকে আমি আগেই তো বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছি।"

"আর একটু থাকো।"—আকুলিনা আবারো বললো।

ভিক্টর আবার শুয়ে পড়ে শিষ দিতে লাগলো। আকুলিনা একটি পলকের জন্যও তার দিক থেকে চোখ ফেরালো না। আমি দেখছিলাম,—ক্রমে সে ভাবে অভিভূত হ'য়ে পড়ছে, তার ওষ্ঠ দুটি সংকুচিত হ'য়ে উঠ্‌লো, বিবর্ণ গাল দুটি দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো অস্পষ্ট রকম।

শেষে ভাঙা ভাঙা কথায় বলতে লাগলো—"ভিক্টর, তোমার পক্ষে এটা খুবই অন্যায়··· খুবি; বাস্তবিকই তাই।"

"কি অন্যায়?"—ভ্রূকুটি ক'রে জিজ্ঞেস করলো সে এবং শরীরটাকে একটু তুলে আকুলিনার দিকে ফিরলো।

"এটা খুবি খারাপ। বিদায় বেলায় তুমি অন্ততঃ একটা স্নেহমাখা কথাও তো বলতে পারতে; এই হতভাগিনীকে যা খুসী একটা কথাও তো বলতে পারতে······"

"কিন্তু তোমাকে আমার কি বলতে হবে?"

"তা আমি জানিনা ভিক্টর, তুমিই সব চেয়ে ভালো জানো। তুমি চ'লে যাচ্ছো,

শুধু একটি কথা……আমি কি ক'রেছি যে তুমি আমার সংগে এমন ব্যবহার করছো?"

"একটা অদ্ভুত জীব তুমি! আমি তার কি ক'রতে পারি?"

"অন্তত, একটা কথা বলো, ভিক্টর!"

ভিক্টর বিরক্তির সংগে মন্তব্য করলো—"ও ঠিক একই সুর ধরে আছে!" উঠেই দাঁড়ালো সে।

কষ্টে সৃষ্টে অশ্রুচেপে আকুলিনা তাড়াতাড়ি বললো—"রাগ করোনা, ভিক্টর।"

"আমি রাগ করিনি, তুমিই কেবল বোকামি ক'রছো···তুমি কী চাও? তুমি জানো যে আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি না, পারি? তবে তুমি কি চাও, বেশতো!"—ব'লেই সে যেনো উত্তরের আশায় মুখখানা বাড়িয়ে রাখলো ও আঙুলগুলি ছড়িয়ে দিলো।

আকুলিনা থেমে থেমে বলতে লাগলো—"আমি কিছু চাইনা, কিছুই না।" সাহসে ভর ক'রে সে তার কম্পিত হাত দুখানি মিনতির মতো তার দিকে বাড়িয়ে দিলো—"কেবল যাবার বেলায় একটি কথা।"

তার দুচোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু গড়াতে লাগলো। টুপিটা চোখের উপরে নামিয়ে দিয়ে ভিক্টর শান্তভাবে বললো—"তার মানে, এখন কাঁদার পালা।"

দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে আকুলিনা বললো—"আমি কিছুই চাই না, কিন্তু সারা দুনিয়ায় আমার জন্য আছে কী, ভবিষ্যতেই বা রইলো কি আমার? আমার কি হবে? হতভাগিনী আমি, আমার কি হবে? ওরা আমার যা খুসী বিয়ে দেবে একটা··· হতভাগিনী পরিত্যাক্তা আমি···আমার পোড়া কপাল!"

ভিক্টর চাপা গলায় বললো—"বলে যাও, বলে যাও"—দাঁড়িয়ে প'ড়ে সে অসহিষ্ণু ভাবে নড়চড়া করতে লাগলো।

"তুমি আমাকে একটা কথাও বলতে পারতে, একটা কথা……বলতে পারতে—'আকুলিনা···আমি তোমায়……'।"—হঠাৎ একটা বুক-ভাঙা কান্নায় তার কথা শেষ হ'তে দিলো না; ঘাসের উপর উবুড় হ'য়ে প'ড়ে সে গভীর বেদনায় ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো শুধু···তার সারা দেহ থর থর ক'রে কাঁপছে, গলা ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে···নিবিড়

অবরুদ্ধ ব্যথা অবশেষে অবিরল ধারায় বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে এলো। ভিক্টর দাঁড়িয়ে, ক্ষণেক দাঁড়িয়ে রইলো, কাঁধ দুটি সংকুচিত করলো, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে চ'লে গেলো।

কয়েক পলক কাটলো···আকুলিনা প্রকৃতিস্থ হ'য়ে মাথা তুললো এবং হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে চারধারে তাকাতে তাকাতে হাত দুটি মোচড়াতে লাগলো। ভিক্টরের পিছু পিছু সে ছুটে যাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পা দুটি তার শিথিল হ'য়ে এলো, হাঁটুর উপর ব'সে পড়লো সে······তার কাছে আমি তখন ছুটে না গিয়ে আর পারলাম না,—কিন্তু আমাকে দেখতে না দেখতেই সে সভয়ে আর্তনাদ ক'রে অমানুষিক এক শক্তিতে দাঁড়িয়ে পড়লো ও ফুলগুলি মাটিতে ছড়িয়ে ফেলে গাছগুলির আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

আমি মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলাম নিস্পন্দ, নির্বাক। তারপর ফুলগুলি কুড়িয়ে নিয়ে বনের বাইরে চলে এলাম মুক্ত প্রান্তরে।

সূর্য তখন নির্মল-ম্লান আকাশে অনেকখানি নেমে গেছে। রশ্মিজালও যেনো নিস্তেজ শীতল, নিভু-নিভু। একাকার-করা এক নরম আলোয়ে ঢেকে আছে সমস্ত দিক। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সূর্য অস্ত যাবে, বেলা শেষের দীপ্তি নেই বললেই হয়। দমকা হাওয়া ছুটে আসছে সাগ্রহ অভ্যর্থনার মতো; আর তার আগে আগে দূতের মতো উড়ে যাচ্ছে ছোটো ছোটো কুঞ্চিত পাতার রাশি,—সোজা ঝোপের ধার দিয়ে—রাস্তাটা পার হ'য়ে। মাঠের পারে ঝোপের সারি প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে, ছোটো ছোটো আলোক কণা মিলে সেখানটা স্পষ্ট আলোকিত হয়ে আছে, কিন্তু ঝলমল করছে না। লালচে গাছগুলিতে, ঘাসের পাতায়, চারপাশে খড়ের বনে বনে ঝলমল করছে আর কাঁপছে শরতের অসংখ্য মাকড়শা-জাল!

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম···প্রাণে ব্যথা লাগতে লাগলো; একমনে প্রকৃতির উজ্জ্বল হিমল হাসির তলায় দাঁড়িয়ে আসন্ন শীতের শংকাও লাগছিলো। কর্কশ-গম্ভীর শব্দে বাতাসকে ডানায় ঝাপটা মারতে মারতে মাথার অনেক উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো একটা সতর্ক কাক। মাথা ঘুরিয়ে আমাকে সে পাশ থেকে দেখে নিলো, ডানা ঝট্‌পট্‌ ক'র্‌লো এবং হঠাৎ ডাকতে ডাকতে বনের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। শস্য-মাড়ানো এক

আঙিনা থেকে মস্তো বড়ো একটা পায়রার ঝাঁক খুশীর ডানায় উড়ে এলো এবং সারি বেঁধে ঘুরপাক খেতে খেতে হঠাৎ ব্যস্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। সমস্তই শরতের ধ্রুব লক্ষণ! কে যেনো পাহাড়ের রুক্ষ পাশ-পথ দিয়ে হাঁকিয়ে আসছে গাড়ী; তার শূন্য গাড়ীতে শব্দ হচ্ছে ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্!

এবারে ঘরের মুখে ফিরে চললাম আমি। কিন্তু হতভাগিণী আকুলিনার অশ্রুমলিন মুখখানি বহুদিন পর্যন্ত আমার বুকের মধ্যে জেগে রইলো। তার ফুলগুলি অনেকদিন হয় শুকিয়ে গেলেও সযত্নে আমার কাছেই রয়ে গেছে আজো।

বিজয়ী প্রেমের সংগীত

ঘটনাটা পাওয়া গেছে ইটালীর প্রাচীন এক পাণ্ডুলিপিতে।

১

ষোলো শতকের মধ্যভাগ। কাব্য ও শিল্প কলার পৃষ্ঠপোষক নামজাদা আর্ক ডিউকদের রাজত্বকালে ফিরারা ধনৈশ্বর্যে জেঁকে উঠেছে;—এই ফিরারায়ই তখন দুটি যুবক ছিলো,—ফেবিও ও মুজিও। সমবয়সী ও নিকট আত্মীয় এরা, সব সময়েই দুজনে একসংগে থাকে। নিবিড় ভালোবাসা ছোটো বেলা থেকেই এদের পাশাপাশি বেঁধে রেখেছে; দুজনের সমাবস্থা এই রাখী আরো অটুট ক'রে দিয়েছে। দুজনেই বনেদী পরিবারের মানুষ, ধনী ও স্বাধীনচেতা; দুজনেরি কোনো পারিবারিক ঝামেলা নেই. রুচি এবং গতি-প্রকৃতিও একই রকম। মুজিও ভালোবাসে সংগীত, ফেবিও চিত্রশিল্প। তাদের নিয়ে সমস্ত ফিরারাই গর্ব করে, রাজসভার গর্ব তারা, সহর-সমাজের আকর্ষণের ধন। দুজনের চেহারা কিন্তু এক রকম ছিল না,—যদিও লাবণ্য ও যৌবনের ঐশ্বর্যের জন্য দুজনেরি একটা বিশিষ্ট রূপ ছিল:—ফেবিও ছিলো আরো দীর্ঘ, সুন্দর মুখখানা, নরম চুল, নীল দুটি চোখ; মোজিওর মুখ একটু কালো রঙের, চুলও কালো,—এবং তার গভীর ধূসর চোখে ফেবিওর চোখের সেই খুশীর আলো ও তার ওষ্ঠে-

লাগানো সেই প্রীতির হাসিটি মুজিওর নেই। তার চোখের পাতার উপরে ঘন ভ্রূ এসে নেমেছে; আর, ফেবিওর সোনালী ভ্রূ-বিলাস শুভ্র মসৃণ ললাটে প্রথম চাঁদের রেখার মতো লীলায়িত। মুজিওর কথাবার্তায়ও জীবনের উচ্ছলতা কম। সে যাই হোক, নানা কারণেই এই দুটি বন্ধু মেয়ে-মহলে একটা বিশিষ্ট আসন পেয়ে গেলো। আর, পাবারও কথা, সামাজিক বোধ ও উদার ভাবের প্রতীক ব'লেই তারা সর্বত্র পরিচিত।

ঠিক এই সময়েই ফেরারায় ছিলো ভ্যালেরিয়া ব'লে একটি মেয়ে, সমস্ত সহরেরি একটি অপরূপ সৌন্দর্য সে অবশ্যি, সে বড়ো একটা প্রকাশ্যে বেরোতো না; গির্জার দিন ও বিশিষ্ট ছুটির দিন ছাড়া বেড়াতেও যেতো না, লোকচক্ষুর আড়ালেই দিন কাটাতো। তার মা ছিলেন নোব্‌ল পরিবারের বিধবা, সংগতিসম্পদ বেশী নেই, সন্তানের মধ্যেও এই একটি মেয়ে মাত্র। ভ্যালেরিয়া তার মার সংগেই থাকে। একবার এই ভ্যালেরিয়াকে দেখলেই সবার মধ্যে জেগে উঠতো নিরপেক্ষ একটা প্রশংসা ও প্রাণভরা দরদ —এতো শান্ত ছিলো তার রূপ, সে যেনো নিজেও জানতো না তার আকর্ষণী শক্তির মহিমা। কারো কারো মতে তার মুখ একটু মলিন,—চোখ দুটি প্রায় সব সময়েই নীচে নামানো, যেনো একটা সরম, একটু ভীরুতা। ওষ্ঠে হাসি ফুটে উঠতে প্রায়ই দেখা যেতোনা, যদি কখনো বা—তাও একটু আভাস মাত্র। তার কণ্ঠস্বরও কেউ বড়ো একটা শুনতে পায়নি। কিন্তু একটা কথা রাষ্ট্র হ'য়ে পড়েছিলো। খুব ভোরে যখনো সহরের সমস্ত কিছুই ঘুমে-ভরা, আপন মনে সে তখন বীণা বাজিয়ে প্রাচীন দিনের গান করে,—অনিন্দ্যসুন্দর সেই গান! একটু মলিন দেখালেও ভ্যালেরিয়ার তখন বিকাশোন্মুখ রূপ। এমন কি বর্ষিয়ানরাও তাকে দেখে না ব'লে পারতো না—"এখনো পাঁপড়ি ঢাকা এই শুভ্র কুমারী কুড়িটি যার জন্য এ পরিপূর্ণ গৌরবে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে—সেই যুবকটি কী ভাগ্যবান!"

(২)

ফেবিও ও মুজিও জীবনে এই প্রথম ভ্যালেরিয়াকে দেখতে পেলো—একটা সমারোহপূর্ণ বিরাট জন্মোৎসবে। ফরাসীরাজ ষোড়শ লুইর কন্যা আর্ক ডিউকের আমন্ত্রণে রাজ-পরিবারের এক নামজাদা লোক এসেছেন—তাঁরি সম্মানার্থে যশস্বী লুক্রেজিয়া কার্জিয়ার ছেলে আর্ক ডিউক ইউকলের কর্তৃত্বাধীনে এই অনুষ্ঠান। ফেরারার শ্রেষ্ঠ পার্কে মর্যাদাপূর্ণ আসনে ভ্যালেরিয়া তার মার সংগে ব'সে আছে; এদিকের আসনগুলি সহরের বিশিষ্ট মহিলাদের জন্যই বিশেষভাবে সজ্জিত। ফেবিও ও মুজিও দুজনেই সেদিন ভ্যালেরিয়ার প্রতি গভীর প্রণয়ে আসক্ত হ'লো। দুই বন্ধুর মধ্যে কোনো গোপন আড়াল ছিলো না ব'লে দুজনের মনের কথা জানতেও বাকী রইলো না। এবং দুজনের সম্মতি ক্রমে ও যুক্তমতে স্থির হ'লো যে দুজনেই ভ্যালেরিয়ার সংগে পরিচিত হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রবে; আর, সৌভাগ্যক্রমে যদি সে একজনকে বরণ করে, অন্যজনে তার ইচ্ছাকেই বিনা দ্বিধায় বা বিনা আপত্তিতে মেনে নেবে। সপ্তাহ খানেক পরেই (বেঁচে থাকুক ওদের সুনাম!) দুজনেই সেই বিধবা মহিলার বাড়ীতে যাবার সুযোগ পেয়ে গেলো;—তার বাড়ীতে কারো প্রবেশাধিকার পাওয়া অবশ্যি খুবি কষ্টকর ছিলো।

বিধবাটি তার মেয়ের সংগে এদের দেখা করবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। সেই সময় থেকে তারা প্রায় প্রত্যেক দিনই ভ্যালেরিয়ার সংগে দেখাশোনা ও আলাপ আলোচনা করার সুযোগ পেতো। এবং দিনে দিনেই তাদের বুকের মধ্যে কামনার শিখা প্রবলভাবে জ্ব'লে উঠ্‌তে লাগলো। এদের সংগ ভ্যালেরিয়ার কাছে স্পষ্টতই প্রীতিকর লাগতো, কিন্তু তার ব্যবহারে সে কারো উপর বিশেষ কোনো অনুরক্তির পরিচয় দেয় নি। মুজিওর কাছে সে গান নিয়ে থাকতো; কিন্তু ফেবিওর সংগে কথাবার্তা ব'লত বেশী, তার কাছে সহজ ভাবটাও থাকতো বেশী। একদিন শেষে দুই বন্ধু তাদের ভাগ্যের শেষ সমাধানের জন্য সংকল্প ক'রলো এবং চিঠিতে ভ্যালেরিয়াকে অনুরোধ ক'রে জানালো যে সে যেনো সহজভাবেই নিজেকে প্রকাশ করে এবং বলে যে দুই বন্ধুর মধ্যে কাকে সে বরণ করতে চায়।

ভ্যালেরিয়া তার মাকে এই চিঠি দেখিয়ে বললো যে সে নিজে কুমারীই থাকতে চায় কিন্তু তার মা যদি মনে করেন, এখন তার বিয়ে হওয়া উচিত তবে তিনি যাকে উপযুক্ত বলে পছন্দ করবেন, তাকেই সে বরণ করবে। সেই উদারমনা বিধবাটি তার আদরের কন্যার আসন্ন বিরহের ভারে অশ্রু চেপে রাখতে পারলেন না। অবশ্য, এই পানি-প্রার্থীদের ফিরিয়ে দেবারো কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই, তার মেয়ের জন্ত দুজনেই সমানভাবে উপযুক্ত। কিন্তু যেহেতু তিনি মনের অন্তরালে ফেবিওর উপরেই বেশী প্রীত ছিলেন এবং সন্দেহ করতেন যে ভ্যালেরিয়াও তাকেই বেশী পছন্দ করে—তাই শেষ পর্যন্ত তিনি ফেবিওর দিকেই ঝুঁকে পড়লেন। পরের দিনই ফেবিও তার সুখ-সৌভাগ্যের কথা শুনতে পেলো ;—কাজেই মুজিওর জন্ত রইলো শুধুমাত্র কথা রক্ষা করা ও ভাগ্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা।

সে করলোও তাই। কিন্তু তার বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বীর বিজয়ী সৌভাগ্যের একজন দর্শক মাত্র হ'য়ে থাকা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ালো। তাড়াতাড়ি ক'রে সে তার বিষয় সম্পত্তির অধিকাংশই বিক্রী ক'রে ফেললো এবং কয়েক হাজার টাকা নিয়ে পূর্বদিকে কোনো দূর দেশে অভিযানে বেরিয়ে পড়লো। ফেবিওর কাছে বিদায় সম্ভাষণে সে বললো : যে পর্যন্ত না তার মন থেকে কামনার শেষ ক্ষীণ রেখাটি পর্যন্ত মুছে যাবে—ততদিন সে আর ফিরবে না। শৈশব ও যৌবনের এই বন্ধুকে বিদায় দিতে ফেবিওর নিশ্চিতই বেশ কষ্ট লাগলো······কিন্তু স্বাগত শুভ দিনের সানন্দ প্রতীক্ষায় অন্য সমস্ত চিন্তা ভাবনা একেবারে তলিয়ে গেলো এবং সফল প্রণয়ের নেশায় সে মেতে রইলো।

কিছুদিন পরেই ভ্যালেরিয়ার সংগে ফেবিওর বিয়ে হ'য়ে গেলো এবং এবারেই সে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারলো যে কী রত্ন তার ভাগ্যে জুটেছে। ফেরারার কিছুদূরে সুন্দর একটি বাড়ী ছিলো তার, চারপাশে ঘিরে আছে ছায়াভরা বাগান। বিয়ের পরে সে ভ্যালেরিয়া ও তার মাকে নিয়ে সেখানে চ'লে এলো। এই সময় থেকে তাদের সুখের জীবন সুরু হ'লো। পরিণীত জীবন ভ্যালেরিয়ার অন্তরের সমস্ত সৌন্দর্য নতুন ক'রেই যেনো মুগ্ধভাবে বিকশিত ক'রে তুললো। ফেবিও ও ক্রমে ক্রমে নামকরা

একজন শিল্পী হ'য়ে উঠ্‌লো,—এখন আর এই যেমন-তেমন একজন শিল্প-বিলাসী মাত্র নয়, মর্যাদাপূর্ণ একজন প্রকৃত শিল্পী। ভ্যালেরিয়ার মা এই সুখী দম্পতিকে দেখে আনন্দিত হ'লেন এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে থাকলেন। দেখতে দেখতে চার বছর যেনো উড়ে চ'লে গেলো— একটি মিষ্টি স্বপ্নের মতো। দুঃখ করবার মতো এই নবীন যুগলের একটি মাত্র অভাব ছিল,—এ পর্যন্তও কোন শিশু-সন্তান এসে তাদের ঘর আলো ক'রলো না; কিন্তু সে আশাও যে তারা একেবারে ত্যাগ ক'রে রেখেছে তাও নয়। চতুর্থ বছরের শেষের দিকে তারা এবারে মর্মান্তিক একটা শোকে মুহ্যমান হ'য়ে পড়লো,—কয়েকদিনের রোগেই ভ্যালেরিয়ার মার মৃত্যু হ'লো।

ভ্যালেরিয়া কতো চোখের জল ফেললো, অনেকদিন পর্যন্তই এই নিদারুণ শোক সে সামলাতে পারলো না। কিন্তু আরো এক বছর কেটে গেলো; জীবনের বেগ আবার নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা ক'রে নিলো এবং পুরোনো পথেই স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হ'য়ে চললো। আর, তারপরে গ্রীষ্মের এক সুন্দর সন্ধ্যায় সকলের কাছেই একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে মুজিও ফেরারাতে এসে উপস্থিত হ'লো।

(৩)

তার প্রস্থানের পরে এই পাঁচ বছরের মধ্যে কেউ কোনোদিন তার কোনো কথা শুনতে পায়নি, তার প্রসংগের সমস্ত কিছুই মিলিয়ে গিয়েছিলো,—যেনো সে এই পৃথিবীর বুক থেকেই মুছে গেছে। ফেরারার এক রাস্তায় ফোবিও যখন মুজিওকে দেখতে পেলো,—প্রথমে অনেকটা আঁৎকে উঠে, তারপরেই আনন্দের আতিশয্যে সে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো এবং তখনি তাকে তার পল্লীনীড়ে আমন্ত্রণ ক'রে রাখলো। তার এই বাগান বাড়ীতে একটা বিস্তৃত মণ্ডপ আছে, ঘর থেকে পৃথক করা। ফোবিও এখানে থাকবার কথাই বন্ধুর কাছে প্রস্তাব ক'রলো। মুজিও সম্মত হ'য়ে গেলো এবং সেদিনই সেখানে গিয়ে উঠ্‌লো। তার সংগে এলো ভৃত্য বোবা-মালয়, বোবা কিন্তু কালা নয়; আর, তার চেহারার ভাবভংগীর সূক্ষ্মতা বিচারে বোঝা যায় যে লোকটা খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে······তার জিভ কেটে ফেলা হ'য়েছে······মুজিওর সংগে আর এসেছে ডজন খানেক

বাক্সতোরংগ, দূর বিদেশে ভ্রমণ কালে সংগৃহীত নানা জিনিষ। ভ্যালেরিয়া মুজিওর আগমনে খুসীই হলো, মুজিওকে সে অভ্যর্থনা ক'রে নিলো সানন্দেই,—যদিও একটু সংযত ভাবে। মুজিও যে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রে চলেছে তা তার প্রত্যেক আলাপ-আচরণেই স্বতই লক্ষ্য করা যেতো। সমস্ত দিন বসে সে তার ঘরের সমস্ত জিনিষ ফিটফাট্ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলো। যে সমস্ত জিনিষ সে নিয়ে এসেছে, মালয়কে সংগে নিয়ে তার বাঁধাছাদা খুলে ফেললো : কম্বল, সিল্কের জিনিষ, ভেলভেট্, বুটিতোলা পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, পানপাত্র, থালা, এনামেল-খচিত জলপাত্র, স্বর্ণরৌপ্যের জিনিষপত্র, মণি-মুক্তো-খচিত পাত্র, আইভরি-খচিত বাঁকান গোলাকার বাক্স, সুস্বাদু মশলা, গন্ধধূপ, বন্যজন্তুর চামড়া, অজানা পাখীর পালক, আরো নানা বিষয়ের নানা জিনিষ—যার ব্যবহার রীতি পর্যন্ত রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। এই সমস্ত মূল্যবান জিনিষের মধ্যে বিশেষ একটি হ'লো একছড়া মুক্তোর কণ্ঠহার। কোনো একটা গোপন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ ক'রে দেওয়ার জন্য পারস্যরাজ তাকে এটা উপহার দিয়েছেন।

সেটা নিজের হাতেই পরিয়ে দেবার জন্য সে ভ্যালেরিয়ার অনুমতি চাইলো। ওর ভার ও আশ্চর্য উত্তাপ অনুভব ক'রে ভ্যালেরিয়া বিস্মিত হ'য়ে গেলো,— মনে হ'লো যেনো চামড়াই পুড়ে যাবে। খাওয়া-দাওয়ার পরে সন্ধ্যাবেলায় সকলে মিলে ছাইপ্রেস ও লরেলের ছায়ায় ব'সে আছে, তখন মুজিও তার অভিযান কাহিনী আরম্ভ ক'রলো। বিচিত্র দূর-দেশের কথা : সে দেখেছে মেঘ-চুম্বিত পর্বত, মরুদেশ, সাগর সমান নদী ; দেখেছে অসংখ্য প্রাসাদ, অজস্র মন্দির, বনরাজি হাজার বছরের, রামধনু-রঙ্ পাখী ও পুষ্পরাজি ; তারপর কতো সহর, কতো বিচিত্র জাতি, তাদের নামই রূপকথার মতো! সমস্ত পূর্ব-ভূভাগই তার পরিচিত হ'য়ে গেছে ; সে গেছে পারস্যে, আরবে,—যেখানে সৃষ্টির প্রত্যেক কিছু থেকে অশ্বই বেশী সুন্দর, বীর্যবান ; সে গিয়েছে একেবারে ভারতের বুকের মধ্যে,—যেখানে বিরাট পাহাড়ী গাছের মতো বর্দ্ধমান বিচিত্র জাতি ; চীন তিব্বতের সীমান্ত পর্যন্ত সে অভিযান ক'রেছে,—যেখানে নীরবনিশ্চল একটি ক্ষুদ্রচক্ষু মনুষ্যাকারে জীবন্ত দেবতা মহান লামা অধিষ্ঠিত, অদ্ভুত তার সব কাহিনী। ফেবিও ভ্যালোরিয়া দুজনেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে গেলো। মুজিওর চেহারা বড়ো একটা বদলায়নি, ছোটোবেলা থেকেই

তার মুখের রং কালো, অধিকতর জ্বলন্ত সূর্যের তপ্ত রৌদ্রে পুড়ে পুড়ে এবার যেনো আরো কালো হ'য়েছে—এই পর্যন্তই। কিন্তু তার মুখের ভাব তফাৎ হ'য়ে গেছে, আরো সংহত, গম্ভীর মর্যাদায় আরো সম্পূর্ণ। ব্যাঘ্রের গর্জন-ধ্বনিত বনান্ধকারে, শংকিত নির্জন পথে,—যেখানে অসভ্য বন্য মানুষের দল নিশ্চুপে ব'সে থাকে নিঃসংগ পথিককে ধ'রে নিয়ে নররক্ত-লোলুপা লৌহময়ী দেবীর কাছে বলি দেবার জন্য,—এমন কি এই সব বিপজ্জনক অভিযান কাহিনী বর্ণনাকালেও তার মুখের উপরে বেশী কিছু একটা প্রেরণা প্রকাশ পায় নি। মুজিওর কণ্ঠস্বর যেনো আরো গম্ভীর, আরো শান্ত। তার হাত, তার সমস্ত দেহই যেনো ইতালীয় জাতের স্বভাব-স্বাভাবিক ভাব-ভংগীর সহজ-স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। ভারতীয় ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে যে সমস্ত অসাধারণ বিদ্যা সে শিখে এসেছে,—তার দু'একটা প্রদর্শন করলো অনুচর মালয়ের সহযোগিতায়। উদাহরণ স্বরূপঃ একটা পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে সহসা আবির্ভূত হওয়া, আড়া-আড়ি দুটি বংশদণ্ডের উপরে আঙুলের স্পর্শমাত্র রেখে শূন্যে অবস্থান। ফেবিও মোটেই আশ্চর্য হ'লো না, কিন্তু ভ্যালেরিয়া নিঃসন্দেহরূপে বিস্মিত ও ভীত হ'য়ে পড়লো……… লোকটা কি কোনো যাদুকর? তারপরে, সে ছোট্ট একটি বাঁশী বাজিয়ে ঢাকা-ঝাঁপি থেকে ফণাধারী পোষা সাপগুলিকে বাইরে আন্‌তে আরম্ভ ক'রে দিলো; ওদের লক্‌লকে লিক্‌লিকে জিভ্‌গুলো কী ভয়ানক! ভ্যালেরিয়া ভয় পেয়ে অম্‌নি মুজিওকে অনুরোধ করে ঐ জঘন্য জীবগুলিকে সরিয়ে রাখতে। নৈশ ভোজনের সময় মুজিও লম্বা-গলার গোলাকার একটা সুরাপাত্র থেকে সুরা ঢেলে দিয়ে বন্ধুদের আপ্যায়িত করলো। আশ্চর্য তার সুবাস ও ঘনতা,—সোনালি রঙে তার সবুজ ছায়া,—জেস্‌পার পাত্রে ঢালবার সময় এক আশ্চর্য আলোতে যেনো জ্ব'লে জ্ব'লে উঠ্‌ছিলো। আস্বাদও তার ইউরোপীয় কোনো মদের মতোই না: খুব মিষ্টি, মসলাগন্ধী, সমস্ত অংগেই যেনো একটা আরাম-করা ঘুমানো নেশা! ফেবিও এবং ভ্যালেরিয়াকে একপাত্র দিয়ে মুজিও নিজেও নিলো। ভ্যালেরিয়ার পাত্রের উপরে ঝুঁকে প'ড়ে আঙুল নাড়াতে নাড়তে কী যেনো সে বিড় বিড় ক'রলো। ভ্যালেরিয়ার লক্ষ্য এড়ালো না তা। কিন্তু সমস্ত কাজেই, তার সমস্ত ব্যবহারেই কী যেনো একটা অদ্ভুত ও অসাধারণ কিছু ছিলো ব'লে সে শুধু ভাবলো: "মুজিও কি ভারত

থেকে কোনো নতুন ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছে অথবা সেখানকার প্রথাই এম্‌নি ?" কিছুক্ষণ নীরব থেকে ভ্যালেরিয়া জানতে চাইলো : বিদেশ-ভ্রমণের মধ্যেও সে সংগীত-সাধনা অটুট রেখেছে কিনা। উত্তর স্বরূপ মুজিও তার ভারতীয় বেহালাটি আনতে মালয়কে পাঠালো। আধুনিক কালের মতোই তার সবটা, তবে চারটি তারের বদলে তার তিনটা, উপরিভাগ নীলাভ সর্পচর্মে ঢাকা, ঘাটগুলির সরু বাঁক অর্ধচন্দ্রাকার,—শেষ প্রান্তে সূক্ষ্মাগ্র একটি জ্বলন্ত হীরক।

মুজিও প্রথমে জাতীয় সংগীত নামে কয়েকটি ভারতীয় রাগ বাজালো ; ইটালীয় শ্রবণে সেগুলি অদ্ভুত, এমন কি অমার্জিত বলেই ঠেকলো, তারের ধাতব ধ্বনি পর্য্যন্ত ক্ষীণ বিলাপের। কিন্তু, মুজিও এবার যখন সর্বশেষ বাজ্‌না ধরলো,—সহসা যেনো অদ্ভুত জোর নিয়ে অনিন্দ্য সুর দুলে উঠ্‌লো। সেই সুর ফুলে' ফুলে' মুগ্ধভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে বেহালার মাথার সাপের মতই কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রবাহিত হ'তে লাগলো। আর, এম্‌নি উত্তেজনা, আনন্দের এম্‌নি বিজয়ী আবেগ এই সুরের জোয়ারে বাঁধ ভেঙে বের হ'লো যে ফেবিও ও ভ্যালেরিয়ার বুকের গভীর পর্যন্ত দুলে দুলে উঠ্‌লো। মুজিওর মাথা অবনত, বেহালার গায়ে বিন্যস্ত, গণ্ডদেশ ঈষৎ বিবর্ণ, ভ্রূযুগল একটি সরল রেখার মতো সংযুক্ত, —সে যেনো আরো সংহত গম্ভীর রূপ ধারণ ক'রেছে। বেহালার মাথার বাঁক-মুখের হীরকটি থেকে রশ্মি বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে,—ওটাও যেনো স্বর্গীয় সুরে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। মুজিও যখন সমাপ্তি টেনে বেহালা থেকে হাত নামালো,—তখনো তার চিবুক ও কাঁধের মধ্যে বেহালাটি ঘনিষ্ঠভাবে আঁকড়ানো। ফেবিও আবেগ ভরে জিজ্ঞেস করলো—এটা কী, কী গান ? ভ্যালেরিয়া একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারলো না, কিন্তু মুগ্ধ তার সমস্ত সত্ত্বাই স্বামীর প্রশ্নের নীরব প্রতিধ্বনি ক'রতে থাকলো। মুজিও এবার বেহালাটি টেবলের উপর রাখলো এবং চুলগুলি পিছন দিকে একবার একটু সরিয়ে বিনীত হাসির সংগে বলতে লাগলো—"ঐ রাগটি, হ্যাঁ, ঐ সংগীতটি একবার মাত্র শুনবার সৌভাগ্য হ'য়েছিলো সুদূর সিংহলে ; স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে ওটা বিজয়ী প্রেমের সংগীত নামে পরিচিত।" ঐ সংগীতটির জন্য ফেবিও আবারো যেনো অনুরোধ কচ্ছিলো। "না, আবার হওয়া অসম্ভব"—মুজিও বললো,—"আর, তা ছাড়া, এখন বেলাও হ'য়েছে যথেষ্ট ; সিনর ভ্যালে-

রিয়ারও এখন বিশ্রাম নেওয়ার দরকার ;—আমার পক্ষেও দরকার,—আমি পরিশ্রান্ত।"

সমস্ত দিন ভ'রেই মুজিও পুরানো দিনের বন্ধুর মতোই ব্যবহার দিয়ে এসেছে ; কিন্তু সন্ধ্যায় বাইরে যাবার সময় সে ভ্যালেরিয়ার হাতখানি নিজের হাতে চেপে ধরলো ও নিজের আঙুলগুলি তার হাতের পাতে নিষ্পেষিত ক'রে দিলো। আর এমন তীক্ষ্ণভাবে তার উপর চোখ রাখলো যে ভ্যালেরিয়া তার চোখের পাতা উপরেই তুলতে পারলো না ; কিন্তু তার লাল-হ'য়ে-যাওয়া গালের উপর সেই দৃষ্টির দাগ সম্পূর্ণরূপেই অনুভব ক'রলো। মুজিওকে কোনো কথা না ব'লে সে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো এবং যে দুয়ার দিয়ে মুজিও চ'লে গেলো সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। মনে পড়লো : আগেও সে তাকে কেমন একটু ভয় ভয় ক'রতো·· ······ আর, এখন সে একেবারেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে। মুজিও তার ঘরের দিকে চলে গেলো, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের ঘরে।

(৪)

ভ্যালেরিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে পারলো না ; তার সমস্ত রক্তের মধ্যে যেনো একটা ঝিমানো জ্বরভাব, কানের মধ্যে সেই সংগীতের অস্পষ্ট রেশ·········ঐ সুরার জন্যই, অথবা মুজিওর গল্পগুলি, হয়তো বা বেহালার সুর !·········ভোরের দিকে শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়লো সে, ও অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলো।

সে যেনো একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ; ছাদ তার নীচু, এরকম ঘর সে জীবনেও আর দেখেনি। দেয়ালগুলি সোনার রেখা-দেওয়া ছোট ছোট টালি দিয়া সাজানো। সরু সরু বাঁকানো থাম মার্বেল ছাদটাকে ধ'রে রেখেছে ; ছাদ ও থাম দুটোই যেনো অর্দ্ধস্বচ্ছ। আবছা একটা গোলাপী আভা ঘরের সমস্ত দিক থেকে ফুটে বেরুচ্ছে। একটা রহস্যময় আলোতে ঘরের সমস্ত কিছুই একাকার হ'য়ে আছে। আরসীর মতো মসৃন মেজের মাঝখানে পাতলা একটা কম্বলের উপর বুটি-তোলা গদি,—দুই কোণে প্রায় অদৃশ্যভাবে প্রকাণ্ড জন্তুর আকারবিশিষ্ট দুটি ধূপাধারে ধূমের কুণ্ডলী পাকাচ্ছে ; কোথাও কোনো জানালা নেই। পর্দা-ঝুলানো একটা কৃষ্ণবর্ণ দরজা দূর-দেয়ালের প্রান্তে গম্ভীর

ভাবে দাঁড়িয়ে। সহসা ঐ পর্দাটি ন'ড়ে উঠে স'রে গেলো।······ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়লো মুজিও! সে ঝুঁকে প'ড়ে দুহাত বাড়িয়ে হাসছে। তার ভয়ানক দুটি বাহু এসে ভ্যালেরিয়ার কোমর জোর ক'রে জড়িয়ে ধ'রলো। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে ভয়ে একটা গোঙানি দিয়ে জেগে উঠ্‌লো ভ্যালেরিয়া। বিছানার উপরে সোজা ব'সে সে চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলোঃ তখনো বুঝে উঠ্‌তে পারেনি,—সে কোথায় এবং তার কী হ'য়েছে········ সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম ছুটলো·········ফেবিও তার পাশেই শুয়ে আছে, সেও ঘুমে। জানালার দিকে ফেরানো তার মুখখানি উজ্জ্বল পূর্ণিমা-চাঁদের আলোতে মরার মতো মলিন দেখাচ্ছে। মৃতের মুখের চেয়েও করুণ! ভ্যালেরিয়া তার স্বামীকে জাগিয়ে তুললে সে সোজা তাকিয়েই—'কি হ'লো?'—ব'লে আঁৎকে উঠ্‌লো। "আমি, আমি ভয়ানক একটা স্বপ্ন দেখেছি"—চাপা গলায় উত্তর দিলো ভ্যালেরিয়া, তখনো ভয়ে তার সর্বশরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে·········

আর, সেই মুহূর্তেই মুজিওর ঘরের দিক থেকে একটা জোরালো সুর সাপের মতো দুলে দুলে আসতে লাগলো। ফেবিও ও ভ্যালেরিয়া দুজনেই চিনলো—মুজিওর সেই বিজয়ী প্রেমের সংগীত। ফেবিও অনেকটা হতবুদ্ধি হ'য়ে ভ্যালেরিয়ার দিকে তাকালো। ভ্যালেরিয়া চোখ বুজে ফিরে রইলো,—সংগীতের শেষ পর্যন্ত শ্বাস যেনো রুদ্ধ ক'রে শুনলো। শেষ কম্পনটি মিলিয়ে যেতে যেতে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেলো চাঁদ এবং ঘরটাও হঠাৎ অন্ধকার হ'য়ে গেলো। স্বামী-স্ত্রী কেউই একটি কথাও না ব'লে বালিশে মাথা গুঁজে রইলো। কে যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে কেউই তা জানতেও পারলো না।

পরদিন ভোরে প্রাতরাশের জন্য ভিতরে এলো মুজিও, তাকে বেশ প্রফুল্লই দেখাচ্ছিলো। সানন্দেই সে ভ্যালেরিয়াকে ডাক দিয়ে বসালো। ভ্যালেরিয়া যেনো কেমন হ'য়ে গিয়ে উত্তর দিলো, আড়াল চোখে মুজিওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো এবং তার শান্ত মুখ ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী চোখ দেখে ভয় পেয়ে গেলো।

মুজিও আজো কোনো গল্প বলতে যাচ্ছিলো; কিন্তু আরম্ভেই ফেবিও তাকে বাধা দিয়ে বললো—"নতুন জায়গায় তোমার অসুবিধে হ'চ্ছে বুঝি। আমার স্ত্রী ও আমি তোমাকে সেই গানটি বাজাতে শুনছিলাম·········"

"ও, তা হ'লে তোমরাও শুনেছো! হ্যাঁ, বাজাচ্ছিলাম বটে; কিন্তু আগে ঘুমিয়েছিলাম এবং এক আশ্চর্য স্বপ্নও দেখেছি।" ভ্যালেরিয়া চমকে উঠলো। "কি রকম স্বপ্ন?"—ফেবিও জানতে চাইলো। ভ্যালেরিয়ার মুখ থেকে চোখ একটুও না সরিয়ে মুজিও বলতে লাগলো: "স্বপ্ন দেখলাম, যেনো এক প্রশস্ত ঘরের মধ্যে ঢুকছি। ছাদটা ভারতীয় পদ্ধতিতে কারুকাজ করা, মোড়ানো থামগুলি ছাদটা ধারণ ক'রে আছে। দেয়ালগুলি টালি দিয়ে ঢাকা; সেখানে কোনো জানালা বা প্রদীপ ছিলো না, তবু সমস্ত ঘরেই ভরা একটা গোলাপী আলো,—সমস্তই যেনো স্বচ্ছ পাথরে গড়া। কোণে কোণে চীনদেশী ধূপাধার ধূমে কুণ্ডলী পাকানো, মেজেতে পাতল একটা কম্বলের উপরে বুটি-তোলা বালিশ। পর্দা ঝুলানো একটা দুয়ারের পথে আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম, আর অন্য দুয়ারে একটি নারীমূর্তি,—একদিন যাকে আমি ভালোবাসতাম! তাকে এত সুন্দর মনে হ'লো যে পুরোনো দিনের চাপা-ভালোবাসা আগুন হ'য়ে আবার জ্ব'লে উঠ্‌লো।

মুজিও অর্থপূর্ণ ভাবেই হঠাৎ থেমে গেলো। ভ্যালেরিয়া নিস্পন্দ, ক্রমশ যেনো সে সাদা হ'য়ে যেতে লাগলো·········নিশ্বাসও যেন ক্ষীণ হ'য়ে এলো।

মুজিও ব'ললো: "তারপরেই জেগে উঠে আমি ঐ গানটি বাজাতে আরম্ভ করি।"

"কে সেই নারী?"—ফেবিও জানতে চাইলো। "কে সে? একজন ভারতীয় স্ত্রী, মানে দিল্লী সহরে তাকে দেখেছি। সে অবশ্য এখন আর নেই, মৃত সে।"

"তার স্বামী?"—ফেবিও নিজের অজ্ঞাতসারেই যেনো জিজ্ঞেস ক'রে বসলো।

"তার স্বামীও পরলোকে, তাই তো শুনেছি। তারপর থেকে ঐ দুজনকেই আর দেখতে পাইনি।"

ফেবিও ব'লে উঠলো: "আশ্চর্য ঘটনা! আমার স্ত্রীও কালরাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে।"

মুজিও এবার তীক্ষ্ণভাবে ভ্যালেরিয়ার উপরে স্থির-দৃষ্টি রাখলো। "আমাকে অবশ্য এখনও বলা হয় নি"—ফেবিও এটুকুও যোগে ক'রলো।

ঠিক এই মুহূর্তেই ভ্যালেরিয়া উঠে দাঁড়ালো ও হঠাৎ ঘর থেকে চ'লে গেলো।

প্রাতরাশের পরে আর দেরী না ক'রে মুজিও রওনা হ'লো ;—ব'লে গেলো, ফেরারাতে তার জরুরী কাজ আছে, সন্ধ্যার আগে সে ফিরতে পারবে না।

৬

মুজিওর দেশে ফিরবার কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। ভ্যালেরিয়ার উপরে সেণ্ট সেসিলার রূপগুণ আরোপ ক'রে ফেবিও একটি প্রতিকৃতি আঁকতে আরম্ভ ক'রেছিল। বিখ্যাত লিউনি,—লিওনার্ডো দ্য ভিন্সি-র সুযোগ্য শিষ্য,—তিনি ফেরারায় ফেবিওর কাছে আসতেন ও নিজের জ্ঞানমতো উপদেশ দেবার সংগে সংগে তার মহান শিক্ষকের চিত্রপদ্ধতির আদর্শও ধরিয়ে দিতেন। প্রতিকৃতিটি প্রায় সম্পূর্ণ হ'য়ে এসেছে, বাকী শুধু মুখের উপরে কয়েকটি বিশিষ্ট তুলির টান। তা হ'লেই ফেবিওর গর্ব ক'রবার মতো একটা জিনিষ হ'য়ে দাঁড়াবে। মুজিওকে ফেরারার দিকে রওনা হ'তে দেখে সে তার ষ্টুডিওতে এসে দাঁড়ালো ;—এখানেই ভ্যালোরিয়া সাধারণত তার জন্য প্রতীক্ষা করে। কিন্তু ভ্যালোরিয়া তো এখানে নেই! তাকে ডাকা সত্ত্বেও কোনো সাড়া এলোনা। ফেবিও একটা গোপন অস্বস্তিতে মুহ্যমান হ'য়ে পড়লো ও চারদিক খুঁজতে লাগলো। ঘরে কোথাও সে নেই! ফেবিও বাগানের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সেখানে নিরালা একটা পথের প্রান্তে তাকে একলা দেখতে পেলো। বেঞ্চিতে ব'সে আছে সে, মুখখানি ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর ; হাঁটুর উপরে দুই হাত একত্র করা। তার পিছনে ছাইপ্রেসের গভীর সবুজের মধ্য থেকে উঁকি মেরে আছে মার্বেলের এক নরছাগমূর্তি, তার মুখে দাঁত-বের-করা বিকৃত একটা শয়তানির হাসি! একটা বাঁশীর মুখে তার বিদ্বেষভরা ফুলানো ওষ্ঠ! ভ্যালেরিয়া তার স্বামীকে দেখে স্পষ্টতই স্বস্তিলাভ করলো এবং ফেবিওর ব্যস্তসমস্ত প্রশ্নের উত্তরে বললো যে তার সামান্য মাথা ধরছে ; ও কিছুই না, এখনি সে এসে ব'সছে। ফেবিও তাকে ষ্টুডিওতে নিয়ে গেলো ও মনের মতো ভংগীতে বসিয়ে ব্রাস ধরলো, কিন্তু বারবারই খুব অসুবিধে বোধ ক'রতে লাগলো,—মুখখানি কিছুতেই মনের মতো ক'রে সম্পূর্ণ কর'তে পারছে না। মুখখানি কিছুটা মলিন ও ক্লান্ত দেখায় ব'লে নয়,—না, তা না ; পবিত্র যে দেবোপম লাবণ্য,—ঐ মুখের যেটুকু তাকে

বিশেষ ক'রে মুগ্ধ করতো, যেটুকু ভ্যালেরিয়াকে সেণ্ট সেসিলা রূপে আঁকতে প্রেরণা জুগিয়েছে—তাই সেদিন ওমুখে সে খুঁজে পায় নি। ব্রাসটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ফেবিও তার স্ত্রীকে বললো—আঁকবার মতো অবস্থায়ই নেই সে; এখন তার বরং শুয়ে থাকাই ভালো, কারণ শরীরও মোটেই ভালো দেখাচ্ছেনা। সংগে সংগেই ক্যানভ্যাসটিকে ফেবিও দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে রাখছিলো। ভ্যালেরিয়াও সায় দিয়ে বললো যে সত্যই তার এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার, এবং বারবার মাথা ধরার কথা উল্লেখ ক'রে শোবার ঘরে চ'লে গেলো।

ষ্টুডিওতে ব'সে আছে ফেবিও একা। অদ্ভুত একটা বিভ্রান্ত অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো। সে নিজে তার কোনো অর্থই বুঝে উঠতে পারলোনা। তার বাড়ীতেই মুজিওর থাকা, তারি,—ফেবিওর নিজেরি সানন্দ অনুরোধের জন্য থাকা এখন কেমন বিস্বাদজনক লাগছিলো। তার যে ঈর্ষা হ'য়েছে তা নয়; ভ্যালেরিয়ার প্রসংগে ঈর্ষার কথা ভাবাও চলে না। কিন্তু তার বন্ধুর মধ্যে সে আগের দিনের সেই মানুষটি যেনো আর চিনতে পারছে না। মুজিও যেনো ঐ দূর দেশ থেকে অদ্ভুত, অজ্ঞাত ও অভিনব সমস্ত কিছু তার সংগে একাকার ক'রে নিয়ে এসেছে,—শুধু এসেছে নয়, তার সমস্ত রক্তে মাংসে তা মিশে গেছে;—যতো সব যাদুগুণের কাজ, বিচিত্র সংগীত-সুরা, এই মুক মালয়,—এমনকি, মুজিওর পোশাক থেকে বিসৃত উগ্র সুগন্ধ, তার চুল, তার নিশ্বাস পর্যন্ত!—এই সমস্ত মিলে ফেবিওর মধ্যে একটা সন্দেহ, এমনকি শংকার মতো কিছুও জাগিয়ে তুললো। মালয়ই বা টেবলের পাশে সাপের মতো অমন অপ্রীতিকর চোখে এই ফেবিওর দিকেই তাকিয়ে থাকে কেন? সে যে ইতালী ভাষা জানে,—প্রত্যেক কাজেই তা ধরা পড়ে। তার প্রসংগেই মুজিও একদিন বলেছে: লোকটা জিভ্ হারিয়ে যে বিরাট্ ত্যাগ সহ্য ক'রেছে তার বিনিময়ে সে এখন আশ্চর্য শক্তির অধিকারী। সে কেমন প্রকৃতির শক্তি? আর, জিভের বিনিময়েই বা কেমন ক'রে তা সে লাভ করলো······এই সমস্ত ব্যাপারই একেবারে অদ্ভুত ধরণের······একেবারেই দুর্বোধ্য। ফেবিও তার স্ত্রীর ঘরে গেলো; তখনো সে শুয়ে আছে কিন্তু ঘুমোয় নি। ফোবিওর পায়ের শব্দ শুনেই সে চমকে উঠলো কিন্তু তাকে দেখে খুশীই হলো,—বাগানে সেই দেখা হবার মতোই!

ফেবিও বিছানার একপাশে ব'সে ভ্যালেরিয়ার হাতটুকু নিজের হাতের মধ্যে নিলো ও কিছুক্ষণ নীরব থেকে তাকে জিজ্ঞেস ক'রলো,—গতরাতে এমনকি স্বপ্নে সে অমন ভয় পেয়ে ব'সেছে। তাও কি মুজিওর বর্ণিত স্বপ্নের মতোই? ভ্যালেরিয়া আরক্ত হ'য়ে উঠে তাড়াতাড়ি বললো—"ও, না, না, সে না, আমি দেখেছি—দেখেছি যে ভয়ানক একটা জীব এসে আমাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিড়ে ফেলতে চেষ্টা ক'রছে।" "একটা ভয়ানক জীব, মনুষ্যাকারে?"—ফেবিও ঝুঁকে রইলো। "না, একটা জন্তু, একটা,—সে একটা জন্তু!"—ভ্যালেরিয়া পাশ ফিরে তার আতপ্ত মুখখানি বালিশের মধ্যে লুকালো। ফেবিও আরো কিছুক্ষণ তার হাতখানি ধ'রে রাখলো, নিঃশব্দে তুলে ওষ্ঠ স্পর্শ করালো তারপর চ'লে গেলো।

এই দুটি যুবক যুবতীই সমস্ত-দিন হৃদয়ে একটা ভার নিয়ে কাটালো। তাদের মাথার উপরে যেনো কৃষ্ণবর্ণ কিছু ঝুলছে······কিন্তু সে যে কি—কেউই ব'লতে পারে না। তারা আরো ঘনিয়ে এসে এক হ'য়ে থাকতে চায়,—যেনো কোনো অমংগলই তাদের শাসিয়ে ফিরছে! কিন্তু একজন আর জনের কাছে বলবে কি জানে না। ফেবিও ফিরে প্রতিকৃতিটা ধরতে চেষ্টা ক'রলো,—একবার 'এরিষ্টো' খুলে পড়তে—অল্পদিন হ'লো এঁর প্রকাশিত কবিতা সমস্ত ইটালীকেই মুখর ক'রে তুলেছে—কিন্তু কিছুতেই মন লাগলো না······সন্ধ্যার শেষে ঠিক নৈশ ভোজনের সময় ফিরে এলো মুজিও।

তাকে আরো শান্ত, আরো প্রফুল্ল দেখাচ্ছিলো কিন্তু এখানকার বিশেষ কোনো কথাই বলছিলো না সে, দৈনন্দিন বিষয় নিয়েই ফেবিওকে নানা কথা জিজ্ঞেস ক'রে কাটালো: জার্মাণ যুদ্ধ, সম্রাট চার্লসের কথা, তার নিজের রোম ঘুরে আসবার ইচ্ছা, নতুন পোপাকে দর্শন করার সংকল্প······ইত্যাদি······। এবার সে ভ্যালেরিয়াকে আবারো কিছুটা সিরাজ দিলো। কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান ক'রলে, নিজের মনেই যেনো বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে বললো: "এখন আর দরকার হবেনা নিশ্চয়ই।"

ঘরে ফিরে এসে ফেবিও শিগগিরি ঘুমিয়ে পড়লো, ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ জেগে উঠলে,—একান্ত বিশ্বাসের মতোই যেনো মনে হ'লো যে কেউ'ই শুয়ে নেই তার সংগে,—ভ্যালেরিয়া পাশে নেই তার! তৎক্ষণাৎ উঠে বসতেই ফেবিও দেখলো: তার স্ত্রী রাতের

পোশাকে বাগানের দিক থেকে ঘরে এসে ঢুকছে। উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে চাঁদ; আগেই সাধারণ বিষ্টি হ'য়ে গেছে। ভ্যালেরিয়ার চক্ষু বোঁজা, পাথরের মতো নিস্পন্দ মুখে ভয়ের বিস্মিত ছাপ। বিছানার দিকে সে এগিয়ে আসছে,—বাড়িয়ে-দেওয়া দুহাত দিয়ে বিছানা খুঁজে নিয়ে তাড়াতাড়ি অথচ নিঃশব্দে সে শুয়ে প'ড়লো। তার দিকে ফিরে ফেবিও কিছু জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু উত্তর এলোনা কোনো; মনে হ'লো গভীর ঘুমে সে অচেতন। গায়ে হাত দিয়ে ফেবিও তার পোষাক ও চুলের উপরে ফোঁটা ফোঁটা বিষ্টি অনুভব ক'রলো, আর খালি পায়ে লাগানো বালুর কণা। ফেবিও এক লাফে বিছানা থেকে উঠে আধোখোলা দরজা দিয়ে বাগানের মধ্যে দৌড়ে এলো। চাঁদের আলোয় সমস্ত কিছুই উজ্জ্বল। ফেবিও তার চারদিকে লক্ষ্য ক'রে দেখলো: পথের বালুর উপরে দুই জোড়া পায়ের দাগ; একজোড়া খালি, এবং এই দাগগুলিই হেনার একটা কুঞ্জের দিকে চ'লে গেছে। হতবুদ্ধির মতোই সে দাঁড়িয়ে রইলো। এমন সময় সহসা আগের রাতে শোনা সেই সংগীতের সুর কান ভ'রে বেজে উঠলো। ফেবিও আঁৎকে উঠে মুজিওর বাড়ীর মধ্যে দৌড়ে এলো.........ঠিক ঘরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে মুজিও, বেহালা বাজাচ্ছে। তার কাছে ধেয়ে গেলো ফেবিও:—"তুমি এই বাগানের মধ্যে ছিলে? তোমার পোশাকও যে বর্ষায় ভিজা!"

"না, আমি জানি না, মনে হয়, আমি তো বাইরেই যাইনি!"—মুজিও আস্তে আস্তে উত্তর দিলো। ফেবিওর আবির্ভাব ও উত্তেজনা দেখে সে যেনো বিস্মিত হ'য়ে গেছে। ফেবিও সজোরে তার হাত ধরলো,—"আবার কেনো ঐ গান বাজাচ্ছো! এবারেও কি স্বপ্ন দেখেছো?"

মুজিও তেমনি বিস্মিত ভাবে কেবিওর দিকে তাকিয়ে রইলো,—কোনো কথাই ব'ললো না।

"কথার উত্তর দাও?"

মুজিও শুধু গুন গুন ক'রে; প্রলাপ বিকারের মতো নিজের মনেই ব'লতে আরম্ভ ক'রলো:

"রূপোর একটী থালার মতন
আকাশে নীরব চাঁদ,
সাপের সমান চিক চিক ক'রে
নদী বয় সারা রাত ;
শত্রুরা সব ঘুমে অচেতন,
বন্ধুরা জেগে আছে ;—
বাজের নখরে ভীরু পাখী ডরে
বলো, কে কোথায় কাছে !"

ফেবিও দুপা পিছিয়ে গিয়ে মুজিওর দিকে আড়চোখে চেয়ে রইলো, এক পলক কী ভাবলো·········তারপরে ঘরে চলে এলো তার বিছানায়।

নিজের কাঁধের উপরেই ভ্যালেরিয়ার মাথা গোঁজা, হাত দুটি মরার মতো দুপাশে প'ড়ে আছে, গভীর ঘুমে সে নিষুপ্ত। ফেবিও তখনি তাকে জাগাতে পারলো না, অথচ ভ্যালেরিয়ার চোখ কিন্তু তার দিকেই স্থির ভাবে চেয়ে আছে! সহসা সে স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বিমূঢ় আলিংগনে তাকে জড়িয়ে ধ'রলো। তখনো সমস্ত শরীর তার থর থর ক'রে কাঁপছে। "কি, কি হ'য়েছে ? মনি আমার, ভয় নেই, কি হ'য়েছে বলো"—ফেবিও তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বার বার বলতে লাগলো। কিন্তু ভ্যালেরিয়া তখনো স্বামীর বুকে অবশ হ'য়ে লেগে আছে। "ওঃ কী ভয়ানক স্বপ্ন!"—ফেবিওর গায়ে মুখ চেপে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলছিলো সে। ফেবিও কি যেনো ব'লতে যাচ্ছিলো কিন্তু ভ্যালেরিয়া তখনো ভয়ে কাঁপছে·········ভোরের প্রথম আলোকে কাচের জানালা ক্রমে ক্রমে সোনা হ'য়ে উঠ্তে লাগলো,—ভ্যালেরিয়াও স্বামীর দুই বাহুর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো।

(৮)

পরের দিন ভোর থেকেই বাইরে রইলো মুজিও। ভ্যালেরিয়া তার স্বামীকে ব'লে কাছাকাছি গির্জায় তার সন্ন্যাসী-গুরুদেব লরেঞ্জোর কাছে চ'লে এলো ;—তার উপদেশ ও

আশীর্বাদ নিয়ে এই আকস্মিক অশান্তি ও ক্লান্তির একটা কিনারা খুঁজে পাবে—এই আশায়। * * * দুপুর বেলায় ভ্যালেরিয়া সন্ন্যাসীকে সংগে নিয়ে এলো, আগেই সে সব কিছু খুলে ব'লেছে, মনের প্রত্যেক অলিগলির অশান্তির কথা পর্যন্ত বুঝিয়ে ব'লেছে। ফেবিওকে এক সময় একা পেয়ে সব আলাপ-আলোচনার শেষে সন্ন্যাসী তাকে ব'ললেন: প্রথমে যতো শিগগির সম্ভব তার ঐ বন্ধুটিকে বিদায় দেওয়া দরকার। কারণ, তার গল্প, গান, তার সমস্ত অদ্ভুত আচার ব্যবহারের প্রভাবে সে ভ্যালেরিয়ার মনকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলেছে। এ ছাড়া, সন্ন্যাসীর মতে,—মুজিও এতোদিন তার প্রতিজ্ঞাও ঠিক মতো রক্ষা করে নি। খৃষ্টধর্মের আলো-বঞ্চিত নানা দেশে এতোদিন কাটাবার ফলে কতোগুলি বিকৃত ধর্মবিশ্বাসের বিষাক্ত বীজও সে দেশ থেকে সংগে নিয়ে এসে থাকবে, গোপন যাদুশক্তিও হয়তো আয়ত্ত ক'রে এনেছে·········কাজেই, বহুদিনের বন্ধুত্বের যদিও একটা দাবী থাকা স্বাভাবিক, তবু বিজ্ঞ দূরদর্শিতা তফাৎ হ'য়ে থাকবার প্রয়োজনের দিকেই অংগুলি নির্দেশ করে।

ফেবিও সন্ন্যাসীর প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজী হ'য়ে গেলো। তার উপদেশ শুনে ভ্যালেরিয়া এমন কি খুসীই হ'য়ে উঠ্‌লো।

ফেবিও স্থির ক'রলো,—নৈশ ভোজনের পরেই মুজিওর সংগে একটা বোঝাপড়া ক'রে নেবে; কিন্তু তার অদ্ভুত বন্ধুটি তখন পর্যন্তও ফিরলো না। ফেবিও ঠিক করলো, কাল পর্যন্ত মুজিওর সংগে এবিষয়ে কথা হবে। তারপর, স্বামী-স্ত্রীতে মিলে শুতে গেলো।

(৯)

ভ্যালেরিয়া শিগগিরি ঘুমিয়ে পড়লো, কিন্তু ফেবিও ঘুমোতে পারলো না। এই রাত্রির নীরবতায় মধ্যে সে যা কিছু দেখেছে ও অনুভব করেছে সমস্তই আরো স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠ্‌লো। ব্যগ্র একাগ্রভাবে সে নিজের সামনে কতগুলি প্রশ্ন খাড়া ক'রে রাখলো,—কিন্তু তার উত্তর আগের মতোই সে খুঁজে পেলো না। মুজিও কি সত্য সত্যই যাদুকর হ'য়েছে? আর, ইতিমধ্যেই কি ভ্যালেরিয়ার উপরে তার বিষাক্ত প্রয়োগ চালায় নি?······ভ্যালেরিয়া অসুস্থ, কিন্তু তার অসুখটাই বা কী? হাত

দিয়ে মাথা ধ'রে নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে ফেবিও শুয়ে আছে,—নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে নানারকম গ্লানিময় চিন্তার মুখে।

নির্মল আকাশে চাঁদ উঠেছে আবার। মুজিওর ঘরের দিক থেকে সামনের অর্ধস্বচ্ছ জানালার কাচের মধ্য দিয়ে চাঁদের আলোর সাথে সাথে—একি, ফেবিও কি স্বপ্ন দেখছে! আলোর সাথে সুরভি হাল্‌কা হাওয়ার মতো একটা নিশ্বাস যেনো ব'য়ে আসতে লাগলো ······তার পরেই আকুল আগ্রহের ফিস্‌ ফিস্‌ শব্দ······এবং সেই মুহূর্তেই সে লক্ষ্য করলো যে ভ্যালেরিয়া যেনো ধীরে ধীরে নড়ে উঠছে। চমকে চেয়ে রইলো ফেবিও : উঠে সে প্রথমে এক পা বাড়ালো বিছানার উপর, তারপরে আর এক পা বিছানার বাইরে। তাকে যেনো পরীতেই পেয়েছে। তার লক্ষ্যহীন দৃষ্টি, পাথরের মতো নিস্পন্দ,—হাত দুটি সামনে বাড়িয়ে দেওয়া······অগ্রসর হচ্ছে বাগানের দিকে। ফেবিও তখনি অন্য দুয়ার দিয়ে ঘরের বাইরে দৌড়ে এলো এবং ঘরের কোন ঘুরে এসে বাগানে বেরিয়ে যাবার দরাজার বাইর থেকে খিল দিয়ে দিলো······খিলে হাত দিয়েছে মাত্র এমন সময় পিছন থেকে কে যেনো ঠেলা দিয়ে······দোর খুলতে চেষ্টা করছে বারবার······আর সংগে সংগে সে কী ব্যাকুল গোঙানি !······

কিন্তু মুজিও তো এখনো সহর থেকে ফিরে আসে নি···

হঠাৎ এই কথাটা ফেবিওর মাথায় খেলে যেতেই বেগে সে মুজিওর ঘরের দিকে ছুটে গেলো।

আর, সেখানে?

তীব্র জ্যোছনায় উজ্জ্বল পথ দিয়ে তার দিকেই আসছে মুজিও, তাকেও যেনো কিসে পেয়েছে! দুই হাত সামনে এগিয়ে দেওয়া, খোলা দুই চোখে দৃষ্টি নেই······ফেবিও তার কাছে দৌড়ে গেলো; কিন্তু সে কিছুই খেয়াল না ক'রে তেমনি এগিয়ে আসছে—আস্তে আস্তে একটির পর একটি পা ফেলে। তার সংহত মুখখানা চাঁদের আলোয় হাসছে,—মালয়ের মুখের মতোই! ফেবিও তাকে নাম ধ'রে ডাক দেবে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই পিছনে তার ঘরের দিক হ'তে জানালার খড়্‌ খড়্‌ শব্দ সে শুনতে পেলো······চারদিকে লক্ষ্য ক'রলো সে······ঠিক শোবার ঘরের জানালাটা আগাগোড়া খোলা এবং ভ্যালেরিয়া

এক পা বাইরে দিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে······তার হাত দুটি যেনো মুজিওকে খুঁজছে······ সে যেনো তার দিকে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে ·····

অসহ্য ক্রোধে ফেবিওর বুক হঠাৎ যেনো জ্ব'লে উঠ্‌লো—"জঘন্য যাদুকর!"—ভয়ানক একটা চীৎকার দিয়ে উঠে সে এক হাতে মুজিওর ঘাড় চেপে ধরলো; আর হাতে নিজের কোমরের তরবারি খুঁজে নিয়ে তার পার্শ্বদেশে আগাগোড়া ঢুকিয়ে দিলো······

মুজিও তীক্ষ্ণ চীৎকারে দুই হাত দিয়ে ক্ষতটা চেপে ধ'রে নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেলো······আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভ্যালেরিয়াও ঐরূপই একটা তীক্ষ্ণ চীৎকারে সোজা একেবারে ঘাসের উপরে পড়ে গেলো ছাইপ্রেস গাছটার কাছে·· ফেবিও দৌড়ে গেলো, তাকে বিছানায় তুলে নিয়ে কথা বলতে লাগলো······

অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে রইলো সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চক্ষু মেলে চাইলো এবং গভীর অথচ ভগ্ন একটা স্বস্তির নিশ্বাস নিলো····· যেনো আসন্ন মৃত্যু থেকে এইমাত্র উদ্ধার পেলো······সে তার স্বামীকে সামনে দেখতে পেয়ে দুহাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে তার কাছে আরো ঘনিয়ে শুলো। "ও তুমি, তুমি!"—থেমে গেলো ভ্যালেরিয়া, ধীরে ধীরে তার হাতের বাঁধন খুলে গেলো, মাথা এলিয়ে দিলো সে এবং স্বস্তির হাসিমুখে আস্তে আস্তে বলতে লাগলো—"বাঁচলাম, সব চ'লে গেছে·····কিন্তু, কি যে ক্লান্ত আমি!" এবারে সে ঘুমিয়ে পড়লো, কিন্তু ঘুম গভীর হ'লো না।

(১০)

পাশেই ভ্যালেরিয়া ঘুমিয়ে আছে। একটু বসে-যাওয়া হ'লেও আগের চেয়ে আরো শান্ত তার মলিন মুখখানি। এইদিকে লক্ষ্য ক'র্‌তে ক'র্‌তে ফেবিও এই সদ্য ঘটনার বিষয় চিন্তা কর্‌তে থাক্‌লো······এখন সে কর্‌বে কী? ···কী ভাবেই বা অগ্রসর হওয়া উচিত? যদি সে মুজিওকে হত্যা ক'রে থাকে,—মনে ক'রে দেখ্‌লো কতো গভীর পর্যন্ত তরবারি চালিয়ে দিয়েছে, তবে তো লুকিয়ে ফেলাও অসম্ভব, আর্ক ডিউক ও জজের সাম্‌নে সমস্তই প্রকাশ কর্‌তে হবে।······কিন্তু এমন দুর্বোধ্য ব্যাপার কী ভাবেই বা বুঝিয়ে বল্‌বে, কীই বা বল্‌বে ফেবিও,—সে নিজেই, তার

বাড়ীর ভিতরে নিজেরি আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হত্যা ক'রেছে ? .....তারা জান্‌তে চাইবে কেনো ?—কিসের জন্য ? কিন্তু, মুজিও যদি ম'রে না থাকে ? আর বেশীক্ষণ অনিশ্চিতের মধ্যে থাকা অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌লো, ভ্যালেরিয়াকে ঘুমে দেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সে সাবধানে বিছানা থেকে উঠে বাইরে গেলো এবং কাছারী ঘরের পথ ধরে অগ্রসর হ'লো। সব কিছুই নিঃশব্দ, জানালায় একটি মাত্র আলো। কম্পিত ভীত বুকে সে বাইর দরজা খুল্‌লো। তখনো সেটাতে রক্তমাখা আঙুলের দাগ, পথের বালুতে রক্তের কালো কালো ফোঁটা। প্রায় অন্ধকার একটা ঘরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলো সে,—চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে সে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো...... ঘরের ঠিক মধ্যিখানে একটা পারসী কম্বল, তার ওপর কালো রঙের নানা ছবি-আঁকা, লাল একটা শাল গায়ে-জড়ানো অবস্থায় মুজিওকে শুইয়ে রাখা হ'য়েছে, মাথার তলে একটা বুটিতোলা বালিশ, মুখখানা মোমের মত ফ্যাকাশে, সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ সোজা ছেড়ে-দেয়া, বোজা চোখ ও নীলাভ চোখের পাতা ছাদের দিকে ফেরানো, নিঃশ্বাসের কোনো লক্ষণই নেই,—একেবারে মরার মতো। তার পায়ের কাছে বাম হাতে ফার্ণের মতো একটা অজানা গাছ-গাছড়ার ডাল নিয়ে সামনে ঝুঁকে আছে মালয়, তার প্রভুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ছোট একটি সবুজ প্রদীপ মেজের উপরে, ঘরের মধ্যে তাই একমাত্র আলো। শিখাটি অকম্পিত, ধুঁয়োহীন। মালয় ফেবিওকে প্রবেশ করতে দেখে একটুও নড়লো না,—তার দিকে একটিবার চোখ ফিরিয়ে মুজিওর উপর ন্যস্ত রাখ্‌লো......মাঝে মাঝে সে ডালটি হাওয়ায় দোলাতে লাগ্‌লো। তার মূক ওষ্ঠ দুটি নড়্‌তে নড়তে ফাঁক হয়ে কী যেন নিঃশব্দ বাণী উচ্চারণ করছে। মেজেতে মালয় ও মুজিওর মাঝখানে ফেবিওর সেই তরবারি। মালয় সেই রক্তমাখা তরবারির উপর ডাল দিয়া জোরে একটা বাড়ি মারলো, কয়েক পলক কেটে গেলো, আরো কয়েক পলক। ফেবিও অগ্রসর হ'য়ে মালয়ের কাছে ঝুঁকে চাপা-গলায় জিজ্ঞেস করলো—"একি মৃত ?" মালয় মাথা নীচের দিকে নামিয়ে জড়ানো শালের মধ্য থেকে হাত বের ক'রে আদেশের ভঙ্গীতে দরজা দেখিয়ে দিলো। ফেবিও আবার জিজ্ঞেস কর্‌তে যাবে,—কিন্তু আবার ঐ উদ্ধত ইংগিত দেখে বেরিয়ে গেলো ক্রোধে, বিস্ময়ে—কিন্তু বাধ্য জীবের মতো! দেখিল, ভ্যালেরিয়া আগের

মতোই ঘুমুচ্ছে, মুখের ওপরে শান্ত ভাবের নম্রতর ছায়া, ফেবিও পোশাক খুললো না, জানালার পাশে ব'সে পড়লো, হাতে মাথা রেখে আবার ভাবনায় ডুবে গেলো। সূর্য ওঠার পরেও সে এক ঠাঁয়ে সেই জায়গায়ই ব'সে রইলো। ভ্যালেরিয়া তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি।

(১১)

ফেবিও ভেবে রাখ্‌লো, ভ্যালেরিয়া জেগে ওঠা পর্যন্ত দেরী ক'রে সে ফেরারার দিকে রওনা হবে। হঠাৎ শোবার ঘরের দুয়ারে টক্‌ টক্‌ শব্দ ক'রে কেউ ডাক্‌লো। ফেবিও বেরিয়ে দেখ্‌লো তারি পুরাতন ভৃত্য এণ্টনিও। বৃদ্ধটি বল্‌তে আরম্ভ করলো, "মালয় এইমাত্র খবর পাঠিয়েছে যে তার প্রভু মুজিও পীড়িত হ'য়ে পড়েছেন এবং তিনি তাহার সমস্ত কিছু নিয়ে সহরে চ'লে যেতে ইচ্ছে করেন। আপনার কাছে তিনি বাক্স-বিছানা বাঁধার জন্য কয়েকটি ভৃত্যের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন এবং কয়েকটি মালবাহী ঘোড়া ও যাত্রী-ঘোড়া এবং পথের সঙ্গী কয়েকজন অনুচর। এ বিষয়ে আপনার কি অনুমতি হয়?" "মালয় তোমাকে এই খবর পাঠিয়েছে"—ফেবিও জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু কি রকম? মানে, সে তো বোবা।" "এই দেখুন, এই কাগজে আমাদের ভাষায় এবং বিশুদ্ধ ভাবেই সব কথা লিখে দিয়েছে।" "তাহ'লে, মুজিও পীড়িত?" "আজ্ঞে, তিনি খুবই পীড়িত, কিছুই আর দেখ্‌তে পান না।" "তারা কি কোনো ডাক্তার দেখিয়েছে?" "না, মালয় বারণ ক'রে দিয়েছে", তুমি বল্‌ছ, মালয়ই নিজে ওটা লিখে পাঠিয়েছে?" "আজ্ঞে, সে-ই।" ফেবিও মুহূর্তকাল চুপ ক'রে রইলো। শেষে ব'লে দিলো—"তবে সব প্রস্তুত ক'রে দাও।"—তা হ'লে মরেনি সে··· ···বুঝে উঠতে পারলো না যে খুসী হবে কি দুঃখিত হবে? পীড়িত?—কিন্তু কয়েক ঘণ্টা আগেও তো তাকে একটা মড়ার মতোই দেখিয়েছে শুধু!

ভ্যালেরিয়ার কাছে গেলো ফেবিও;—সজাগ হ'য়ে সে মাথা তুলে দেখলো একবার। স্বামীস্ত্রী দুজনেই দুজনের দিকে দীর্ঘ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলো। "সে একেবারে গেছে তো?—ভ্যালেরিয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো। শিউরে উঠলো ফেবিও। "একেবারে গেছে? তুমি কি বলতে চাও······"

"সে কি চ'লে গেছে" ভ্যালেরিয়া আবারো বললো। ফেবিওর বুক থেকে এবার যেনো মারাত্মক একটা বোঝা খ'সে পড়লো।

"না, এখনো যায়নি, আজি অবশ্যি চ'লে যাবে।"

"আমাদের সংগে তার আর—আর কোনো-দিন দেখা হবে না তো?"

"না, আর কক্ষনো না।"

"তা হ'লে ওরকম স্বপ্নও আর দেখবো না?"

"না।"

ভ্যালেরিয়া আবার একটা স্বস্তির নিশ্বাস নিলো। শান্ত একটি হাসির রেখা এবার তার ওষ্ঠে আবার ফুটে উঠলো। সে তার দুটি হাত স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিলো। "আমরা তার কোনো কথা ভুলেও আর কোনোদিন বল্‌বো না। প্রিয় আমার, তুমি, তুমি আমাকে বলো।"……লোকটা যে পর্যন্ত না চলে যায় আমি এই ঘর থেকে বেরুচ্ছি না …. তুমি এখন আমার ঝিদের পাঠিয়ে দাও। আচ্ছা শোনো, আগে ঐটি নিয়ে যাও।"—সে বিছানার পাশে ছোট্ট একটি টেবিলের উপরকার মুক্তোর হারটি দেখিয়ে দিলো,—মুজিওর উপহার-দেওয়া হার। "এই এখনি, খুব গভীর একটা কুয়োর ভিতরে দূর ক'রে ফেলে দাও। এবার তুমি আমার কাছে আসো, আমাকে আদর ক'রে আলিংগন করো। আমি তোমারি—তোমারি ভ্যালেরিয়া। তুমি এসো, হ্যাঁ, ঐ লোকটা চ'লে যাওয়ার পরে।" ফেবিও কণ্ঠহারটি তুলে নিলো, মুক্তোগুলো যেনো নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিলো। স্ত্রীর নির্দেশ মতো সে কাজ ক'রলো। তারপর বাগানের মধ্যে পায়চারি ক'র্‌তে ক'র্‌তে মণ্ডপের দিকে দূর হ'তে সে লক্ষ্য করছিলো—তখন জোগাড় যাত্রা সোরগোল সবে সুরু হ'য়েছে। ভৃত্যেরা বাক্স-পেটারা এনে ঘোড়ার গাড়ী বোঝাই করতে ব্যস্ত……কিন্তু মালয় কোথায়? মণ্ডপের মধ্যে কি ঘট্‌ছে তা দেখ্‌বার জন্য একটা অদম্য ইচ্ছা তাকে সেখানে টেনে নিলো। তার মনে পড়্‌লো যে ঘরের পিছনে গোপন একটা দোর আছে, সে পথ দিয়েও মুজিওর শুয়ে থাক্‌বার জায়গায় যাওয়া যায়। চাপা-পায়ে কাছে এসে দেখ্‌তে পেলো সেই দোরটিতে খিল নেই। ভারী পর্দাটা দুই দিকে হাত দিয়ে সরিয়ে ঘরের মধ্যে একটা থতমত দৃষ্টি ফেল্‌লো।

(১২)

মুজিও কম্বলের উপর শুয়ে নেই। যাত্রার জন্য প্রস্তুত-ভাবেই একটা আরাম-কেদারায় ব'সে আছে। ফেবিও প্রথম যখন তাকে দেখে এসেছে, সেইরূপই মরার মতো। তার অবশ মাথা চেয়ারের পেছনে ঝুলে পড়েছে, বাড়ানো দুই হাত মরার মতো শক্ত হ'য়ে দুই দিক ঝুলছে, বুকে নিশ্বাসের ওঠা-নামা নেই। মেজের উপর চেয়ারের কাছে শুষ্ক নানান গাছ-গাছড়া ছড়ানো, তা থেকে একটা তীব্র দম-আট্‌কানো রকম গন্ধ, কস্তুরীর গন্ধ বেরুচ্ছে। প্রত্যেকটি পান-পাত্রের গলায় কুণ্ডলী-পাকানো পিতলরঙ্‌ ছোটো এক একটি সাপ, তার সোনালী চোখ মাঝে মাঝে চক্‌চক্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ছে। মুজিওর দিকে সোজা মুখ রেখে হাত দুই দূরে মালয়ের দীর্ঘ-দেহটি দাঁড়িয়ে, একটা আল্‌গা বড়ো পোষাক গায়ে, বাঘের একটা লেজ দিয়ে কোমর বাঁধা। বড়ো একটা কালো টুপি মাথায়, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। নিষ্পন্দভাবে সে শুধু মাত্র দাঁড়িয়ে ছিলো না। এক এক সময় সে ভক্তিভরে মাথা নুইয়ে যেনো প্রার্থনা কর্‌ছিলো, তার পরক্ষণেই আবার আঙুলের ওপর ভর রেখে সোজা একেবারে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। তারপরে, তালে তালে দুলে দুলে হাত দুটি সম্পূর্ণভাবে বাড়িয়ে দিলো এবং মুজিওর দিকে ধেয়ে গিয়ে আদেশের ও ভয় দেখাবার ভংগীতে কপালে ভ্রূকুটি কেটে মেজেতে পদাঘাত কর্‌লো। এই সব করার ফলে তার যেনো খুব পরিশ্রম, এমন কি কষ্টই হ'চ্ছিলো—জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিলো, সমস্ত মুখ দিয়ে দর দর ক'রে ঘাম পড়্‌ছিলো। তক্ষুনি সে মেজেতে ব'সে প'ড়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা পুরো নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে আপ্রাণ চেষ্টায় নিজের দৃঢ়-বদ্ধ মুষ্টি নিজের দিকে বল্গার মতো টেনে আন্‌তে লাগ্‌লো—যেনো সত্যিই কতগুলি রশি ধ'রে আছে সে। ফেবিও এবার ভয়ংকর ভয় পেয়ে গেলো—মুজিওর মাথাও যে আস্তে আস্তে চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ ছেড়ে মালয়ের হাতের অনুসরণে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে……মালয় সেগুলি ছেড়ে দিলো, মুজিওর মাথাটাও আবার একটা বোঝা মতোই পিছনে প'ড়ে গেলো। মালয় বার বার বাধ্যের মতো তার গতির অনুসরণ ক'র্‌লো। পান-পাত্রের গাঢ় কৃষ্ণ তরল পদার্থটা এবার ফুটে উঠেছে। পাত্রগুলি হ'তে যেনো ক্ষীণ

ঘণ্টা-ধ্বনির শব্দ হ'তে লাগ লো, পিতল সাপগুলি প্রত্যেকে এক একটি পাত্রেকে আরামে জড়িয়ে আছে। মালয় এবার একপা অগ্রসর হ'লো, ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বে তুলে চক্ষু দুটি আগাগোড়া বিস্ফারিত ক'রে মুজিওকে মাথা নুইয়ে প্রণাম ক'র্‌লো······মরার চোখের পাতাও যেনো নড়ে উঠ্‌লো, অনিশ্চিত ভাবে খুলে গেলো। সীসার মতন ঘোলাটে চোখের তারা ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। বিজয়ী গর্বে ও আনন্দে মালয়ের মুখ একটা হিংসুক হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো ; এবার সে পুরোপুরি হা ক'রে বুকের গভীর তলদেশ থেকে বহু কষ্টে একটানা আওয়াজ বের ক'রলো······ঐ অমানুষিক জান্তব ধ্বনির উত্তরে মুজিওর ওষ্ঠও ফাঁক হ'য়ে একটা ক্ষীণ গোঙানি উঠ্‌লো।······এরপরে আর ফেবিও স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌লো না। সে যেনো কোন শয়তানের ভেল্কির মধ্যেই এসে পড়েছে। সে একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার ক'রে বেগে বের হয়ে পড়লো এবং যতো শীঘ্র পারে, বাড়ী দৌড়িয়ে গেলো, নাম জপ্ কর্‌তে কর্‌তে।

(১৩)

তিন ঘণ্টা পরে এণ্টনি তার কাছে খবর নিয়ে এলো যে সব কিছুই ঠিক হ'য়ে আছে। জিনিষগুলি বাঁধা হ'য়ে গেছে, সিনর মুজিও রওনা দেবার জন্য তৈরী হ'চ্ছেন। ভৃত্যের কাছে কোন কথা না বলে ফেবিও বারান্দায় এলো ; সেখান থেকে কাছারি ঘর দেখা যায়। কয়েকটি মাল-ঘোড়া সামনে দাঁড় করানো, দুইজনের জন্য সজ্জিত একটা শক্তিশালী ঘোড়া সিঁড়ি পর্য্যন্ত এগোনো, চাকরেরা অস্ত্রশস্ত্রধারী অনুচরদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের দরজা খুলে গেলো এবং মুজিও মালয়ের ওপরে ভর রেখে উপস্থিত হ'লো। একটা সাধারণ পোষাকই মালয়ের গায়ে। মুজিওর মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাশে, হাত দুটিও মড়ার মতোই দুপাশে ঝুলানো,—তবে হাঁটছে সে!······ হ্যাঁ, ঠিক্ হেঁটেই আস্‌ছে। ঘোড়ার উপরে তাকে তুলে দিলে সোজা হ'য়ে ব'সে সে বল্‌গার রাশগুলি হাতড়িয়ে খুঁজে নিলো। মালয় পা-দানিতে পা দিয়ে এক লাফে তার পিছনে ব'সে হাত দিয়ে তাকে ধ'রে রাখ্‌লো। তারপরে, সমস্ত দলই যাত্রা কর্‌লো এবার। ঘোড়াগুলি হেঁটে অগ্রসর হ'য়ে ঘরের পাশ ঘুরে এলো······ফেবিও যেনো

দেখ্‌তে পেলো,—মুজিওর কৃষ্ণবর্ণ মুখে কেমন একটা······তবে কি সে তার উপরে দৃষ্টি দিয়েছে? মালয় শুধু একবার মাথা নোয়ালো—বরাবরের মতোই বক্র সমালোচনার ভংগীতে। ভ্যালেরিয়া কি এসব দেখ্‌তে পেয়েছে? তার জানালার পর্দা তখনও খোলা······হয়তো সে পিছনে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে।

(১৪)

দুপুরের খাবার সময় ভ্যালেরিয়া খাবার ঘরে এলো। তাকে বেশ শান্ত ও কমনীয় দেখাচ্ছিলো—যদিও সে তখনো তার দুর্বলতার কথা বলছিলো। তবে তার মধ্যে আগের মতো কোনো বিত্রস্ততা, আগের সেই অবিরাম বিমূঢ় ভাব ও গোপন আশংকা এখন আর নেই। মুজিও চলে যাওয়ার পরের দিন ফেবিও যখন তার সেই প্রতিকৃতিতে ফিরে হাত দিলো—ভ্যালেরিয়ার মুখের সেই শুভ্র ভাবটি আবার যেনো সে ফিরে পেলো—যার উপরে সাময়িক যবনিকা পড়ায় তার খুবি অসুবিধা হ'য়েছিলো। তার তুলি নিপুনভাবে ক্যানভাসের উপর চল্‌তে লাগ্‌লো, স্বামী-স্ত্রী আবার তাদের সেই স্বচ্ছন্দ জীবন ফিরে পেলো। মুজিও তাদের সমুখ থেকে এমন ভাবেই দূরে সরে গেলো, কোনোদিন যেনো তাদের সাথে পরিচয়ই ছিল না তার। ফেবিও ও ভ্যালেরিয়া একমত হ'য়ে স্থির করলো যে তারা মুজিওর প্রসঙ্গে বিন্দুবিসর্গও ভুলেও আর মনে আন্‌বে না, তার ভবিষ্যত জীবনের কথা একটিবারও জান্‌তে চাইবে না। মুজিওর জীবন নাটক সকলের কাছেই একটা রহস্য হ'য়ে প'ড়ে রইলো।······মুজিও এমন ভাবেই উধাও হ'য়ে গেলো,—যেনো সে পৃথিবী থেকেই একেবারে স'রে গেছে। একবার ফেবিও সংকল্প করলো যে সেই ভয়ংকর রাতের ঘটনাটা ভ্যালেরিয়াকে খুলে বলবে······কিন্তু ভ্যালেরিয়া বোধ হয় তার সংকল্প বুঝতে পেরে চক্ষু মুদে শ্বাস বন্ধ ক'রে রইলো, যেনো সে একটা আঘাতের জন্য তৈরী হ'চ্ছে। ফেবিও তাকে ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌লো এবং তার ওপরে সে আর এ আঘাত দিলো না।

শরতের এক মধুর ভোরে ফেবিও তার সেইণ্ট সেসিলার ছবিতে শেষ স্পর্শগুলি বুলিয়ে দিচ্ছে, ভ্যালেরিয়া অর্গানের কাছে ব'সে মাঝে মাঝে ঘাটগুলির ওপরে খুসীমতো আঙুল চালাচ্ছে······সহসা তারি অজ্ঞাতে হাতের নীচে থেকে একটা সুর বেজে

উঠ্‌লো—আশ্চর্য, মুজিওর সেই বিজয়ী প্রেম-সংগীতের প্রথম চরণ! আর সেই মুহূর্তেই ভ্যালেরিয়া তার বিবাহিত জীবনে এই প্রথমবারই অনুভব কর্‌লো যে তার মধ্যে যেনো একটি নতুন জীবন ন'ড়ে উঠ্‌ছে… …ভ্যালেরিয়া চম্‌কে উঠে থেমে গেলো……
"তার মানে ?…… তা হ'লে কি আমার…"

পাণ্ডুলিপিটি এইখানেই শেষ হ'য়েছে।

মফস্বলের ডাক্তার

তখন শরৎকাল। কোনো এক দূর জায়গা থেকে ফিরবার পথে সর্দি লেগে আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়ি। সৌভাগ্যবশত, জ্বরটা আমাকে আক্রমণ করে মফঃস্বল-সহরের এক সরাইখানায়। সেখানকার ডাক্তারটিকে ডেকে পাঠাই এবং আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি এসে উপস্থিত হন। লোকটি শীর্ণ, মধ্যমাকার। মাথার চুলগুলি কালো। আমাকে দেখে তিনি ব্যবস্থাপত্র দেন ও শুষ্কভাবে কাশতে কাশতে, অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে পাঁচ-রুবলের নোটখানি নিখুঁত সতর্কতার সংগেই পকেটস্থ করেন। তারপর তিনি বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু কোনো রকমে আলাপ-সালাপ আরম্ভ ক'রে দিয়ে থেকে যান।

জ্বরালো নেশায় আমি ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়ে ছিলাম; বুঝতে পারলাম যে রাতে কোনোমতেই ঘুম হবে না, তাই একজন সদানন্দ সংগীর সাথে গল্প-গুজবে খুশীই হ'য়ে উঠ্‌লাম।

চা দেওয়া হোলো। আমার ডাক্তারটিও প্রাণ খুলে কথা বলতে লাগলেন। লোকটি বিচক্ষণ; তিনি রসালো ক'রে এবং জোর দিয়ে দিয়ে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। সত্যই, সংসারে বহু অদ্ভুত ঘটনাই ঘটে। আপনি কতগুলি লোকের সংগে দীর্ঘকাল একত্রে থাকতে পারেন, তাদের সংগে বন্ধুত্বও হ'তে পারে, কিন্তু কখনোও তাদের কাছে মনের ভেতরটা প্রকাশ করেন না। অথচ,—যাদের সংগে

আপনি ঠিক পরিচিত হবারই অবসর পান নি—তাদেরি কাছে আপনি বা তিনি যেদিক থেকেই হোক, সারা প্রাণ উজাড় ক'রে দিতে, সমস্ত গোপনটুকু মেলে দিতে আরম্ভ করেন অসংকোচে ;—ঠিক যেনো পুরুত পাদ্রীর কাছে আপনার সব গোপন কথা খুলে বলছেন। জানি না, কেমন ক'রে যে আমার নতুন এই বন্ধুটির শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করলাম,—তা যেমন ক'রেই হোক, এরূপ অহেতুক ভাবেই তিনি একটি মজার কাহিনী আমার কাছে বর্ণনা করতে লাগলেন। গল্পটি এখানে পাঠকদের কাছে নিবেদন ক'চ্ছি ; ডাক্তারের নিজের ভাষায়ই ব'লবার চেষ্টা ক'রব।

নস্য নেবার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ দুর্বল কম্পিত সুরে তিনি ব'লতে লাগলেন—

"এখানকার জজ, পাভেল লুকিচ্‌কে আপনি চেনেন ? ······আপনি তাকে চেনেন না ? ······তা কথা একই"। তিনি গলা পরিষ্কার ক'রে নিলেন ও চোখ মুছলেন। —"একটুও ভুল না ক'রে সঠিক বলতে গেলে ব্যাপারটা ঘটে—লেন্‌টে, তুষার গলার সময়। আমি তার বাড়িতে ব'সে আছি—আমাদের জজেরা, বুঝলেন না ? —তাস খেলেন। জজটি আমাদের বেশ লোক ; তাস খেলতে বেশ ভালোবাসেন। হঠাৎ "—ডাক্তার "হঠাৎ" কথাটি ঘন ঘন ব্যবহার ক'রতে লাগলেন—"হঠাৎ তাঁরা আমাকে বললেন, একটি লোক আপনাকে খুঁজছে।"

"বললাম, সে কী চায় ?"

"তারা বললেন—'সে একখানা চিরকুট এনেছে,—নিশ্চয়ই কোনো রোগীর কাছ থেকে।'

বললাম—'চিরকুটখানা আমাকে দিন।'

"তা সেখানা এসেছে এক রোগীর কাছ থেকেই,—ভালো কথা, তাই তো আমাদের বাঁচার কড়ি······কিন্তু ব্যাপারটা যা হ'চ্ছে তা এই—একজন মহিলা, বিধবা, আমাকে লিখছেন। লিখছেন—'আমার মেয়ে মরণাপন্ন, ঈশ্বরের দোহাই, একবার আসুন ! ঘোড়ার গাড়ি পাঠানো হ'লো আপনার জন্য'···বেশ কথা, তা তো হ'লো ! কিন্তু তিনি ছিলেন কুড়ি মাইল দূরে। বাইরে নিশুতি রাত, পথেরও যা দশা ! আর তিনি

গরীব; রুবল-এর বেশি আশা করা পাগলামি! আর তাও অনিশ্চিত! হয়তো, একগাঁট কাপড় এবং এক থালা ময়দা দিয়েই খালাস!

"যাই হোক, বুঝলেন, সকল কিছুর আগে হ'চ্ছে কর্তব্য! হয়তো, গোটা মানুষটাই মারা যাচ্ছে। আমি তখনই আমার তাসগুলো আর এক জনের হাতে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম। সেখানে সিঁড়ির কাছে একটা ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে, যা বিশ্রী দেখতে! ঘোড়া দুটো চাষীর ঘোড়া, মোটা কী মোটা,—গায়ের লোমও ঘন কম্বলের মতো। কোচবাক্সে ব'সে আছে সহিস, সম্ভ্রম ভরে সে মাথায় টুপি খুলে আছে। তা, আমি ভাবলাম—'এটা তো পরিষ্কারই, টাকায় এরা গড়াগড়ি দিচ্ছেন না।' ...আপনি হাসছেন; কিন্তু আপনিই দেখুন না, আমার মতো একজন গরীবের পক্ষে সব দিকই বিবেচনা ক'রতে হয়...এই গাড়োয়ানটাই যদি রাজার চালে ব'সে থাকে, মাথার টুপিটা ছোঁয়াও দরকার মনে না করে, এমন কি পেছন থেকে, তার গোঁফদাড়ির আড়াল থেকে আপনাকে অবজ্ঞা দেখায়, আর চাবুকটা ঝাঁকায়, তবে বাজি রাখতে পারেন যে ছ-রুবল পাওনা আপনার মারে কে? কিন্তু গাড়োয়ানটাকে দেখলাম সে রকমেরি না। যা হোক, ভাবলাম, উপায় নেই,—সব কিছুর আগেই হ'চ্ছে কর্তব্য। বিশেষ দরকারী অষুধগুলো নিয়ে রওনা হলাম।

আপনি বিশ্বাস ক'রবেন কি? সেখানে গিয়ে তো কোনোরকমে উপস্থিত হ'লাম। জঘন্য রাস্তা,—জলস্রোত, তুষার, নালা,—বাঁধটাও হঠাৎ সেখানে ভেঙে গেছে,—সেটাই হলো সবচেয়ে বিশ্রী! যা হোক, শেষ পর্যন্ত পৌছলাম গিয়ে! খড়ের ছোটো বাড়ি, জানালায় জ্ব'লছিলো আলো। তার অর্থ, তাঁরা আমার প্রতীক্ষায় আছেন। একজন বৃদ্ধা মহিলা অভ্যর্থনা ক'রলেন এসে। খুবই প্রাচীন তিনি, মাথায় তার টুপি, বললেন,—"মেয়েটিকে বাঁচান! মরণাপন্ন সে!"

"বললাম—'বিচলিত হবেন না,—রোগী কোথায়?"

"এই দিকে আসুন!"

"দেখলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোটো একখানি ঘর, কোণে জ্ব'লছে একটি প্রদীপ; বিছানায় শুয়ে আছে বছর বিশেকের একটি তরুণী, অচেতন অবস্থা; গা খুব গরম,

হাঁপাচ্ছে সে,—জ্বরে। আরো দুটি মেয়ে ছিলো, তারা বোন, ভয় পেয়ে কাঁদছিলো। তারা আমাকে বললো—'দিদি কালকেও ছিলো সুস্থ, ক্ষিদেও ছিলো বেশ; আজ সকালে বলছিলো মাথা ব্যথা ক'রছে, আর সন্ধ্যায়ই হঠাৎ এরকম!'

"আমি আবার বললাম—'অস্থির হবেন না'। জানেন, এটা হ'লো ডাক্তারের কর্তব্য;—তার কাছে গিয়ে শরীর থেকে কিছুটা রক্ত ক্ষরণ করালাম। তার সর্বাংগে শর্ষের প্রলেপ লাগাতে বললাম, আর মিকশ্চারের ব্যবস্থাপত্রও লিখে দিলাম। এই ফাঁকে আমি তার দিকে একবার তাকালাম। বুঝলেন, তার দিকে আমি তাকালাম! তা আপনার গা ছুঁয়ে বলছি,—তেমন মুখ আমি কখনো আর দেখিনি!—এক কথায় সে ছিলো যাকে বলে সুন্দরী! করুণায় আমার সমস্ত অন্তর ভ'রে উঠ্‌তে লাগলো। এমন সুন্দর মুখখানি! এমন দুটি চোখ! কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ! তার অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হ'য়ে এলো। ঘাম হ'তে লাগলো, মনে হ'লো জ্ঞান ফিরে আসছে। চারধারে তাকালো সে, মৃদু হাসলো এবং মুখের উপর হাতখানি বুলালো···তার বোনেরা তার মুখের উপর নুয়ে জিজ্ঞেস ক'রলো—"দিদি কেমন আছো?"—ভালো আছি ব'লে সে পাশ ফিরলো।

''আমি তাকে আবার দেখলাম। ঘুমিয়ে পড়েছে সে। বললাম,—'এখন রোগীকে একা থাকতে দিতে হবে।' পা টিপে টিপে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দরকার হয় যদি,—একজন ঝি তাই ঘরে রইলো।

বৈঠকখানায় টেবলের উপরে ছিলো একটা ষ্টোভ, এক বোতল পানীয়। আমাদের যা পেশা তাতে কেউ ও জিনিষটা ছাড়তে পারে না। আমাকে তারা চা দিলেন, রাতটা সেখানে থাকতে ব'ললেন···আমিও রাজি হ'লাম। নইলে অতো রাতে যাই বা কোথায়? বৃদ্ধ মহিলাটি আর্তনাদ করছিলেন, বললাম—'কি হ'য়েছে? ও বাঁচবে; চিন্তিত হবেন না। আপনি নিজে বরং একটু বিশ্রাম নিন। এখন রাত প্রায় দুটো।'

তিনি বললেন—'কিন্তু কিছু যদি ঘটে জাগিয়ে দেবেন আপনি।'

বৃদ্ধা মহিলা চ'লে গেলেন, মেয়ে দুটিও তাদের ঘরে চ'লে গেলো। আমার জন্য

বৈঠকখানায় একটা বিছানা ক'রে দেওয়া হ'লো। আমি শুতে গেলাম,—কিন্তু কি আশ্চর্য! ঘুমোতে পারলাম না। কারণ, যথার্থই বড় ক্লান্ত হ'য়েছিলাম। আমার রোগিণীকে আমি কিছুতেই মনের মধ্য থেকে সরাতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত আর স'য়ে থাকা অসম্ভব হ'লো। হঠাৎ উঠে প'ড়লাম। মনে মনে ভাবলাম,—গিয়ে শুধু দেখবো রোগিণী কেমন আছে। তার শোবার ঘরখানা ছিলো বৈঠকখানার ঠিক পরেই। আলগোছে দরজাটা খুললাম,—হৃৎপিণ্ডটা যে কি রকম স্পন্দিত হ'তে লাগলো। ভিতরে দেখলাম তাকিয়ে; ঝিটা ঘুমোচ্ছে। মুখটা তার হাঁ ক'রে আছে, শুধু তাই নয়, নাকও ডাকছে, আস্তো লক্ষ্মীছাড়া! কিন্তু রোগী শুয়ে আছে আমার দিকে ফিরে, হাত দুখানা মেলে,—বেচারী!

"আমি তার কাছে গেলাম···তখন হঠাৎ সে চোখদুটি খুললো ও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো! 'কে? কে?'—আমি তো একেবারে বিহ্বল হ'য়ে পড়লাম; বললাম,—'ভয় পাবেন না, আমি—আমি ডাক্তার। আপনি কেমন বোধ করছেন, আমি আপনাকে দেখতে এসেছি।'

'আপনি ডাক্তার?'

'হ্যাঁ, ডাক্তার। আপনার মা আমাকে সহরে খবর পাঠিয়ে এনেছেন। আপনার শরীর থেকে খানিকটা রক্ত বের ক'রে দিয়েছি,—এখন অনুগ্রহ ক'রে একটু ঘুমান তো। ভগবানের কৃপায় দু একদিনের মধ্যেই আমরা আপনাকে সুস্থ ক'রে তুলবো।'

"হাঁ, হাঁ ডাক্তার, চেষ্টা করুন, বাঁচান,···আমাকে মরতে দেবেন না।"

"আপনি ওভাবে কথা বলছেন কেন? ভগবান আপনার মংগল ক'রবেন।" ভাবলাম, আবার জ্বর এসেছে বুঝি। নাড়ী দেখলাম, হাঁ জ্বর এসেছে। সে আমার দিকে তাকালো, তারপর আমার হাত ধরলো।

"আমি আপনাকে বলবো, কেন আমি মরতে চাই না; আপনাকে আমি বলবো··· এখন আমরা দুজনে একা; কেবল আপনাকে, আর কাউকে···কাউকেই না···শুনুন।"

শরীরটা তার দিকে নুইয়ে রাখলাম। সে একেবারে আমার কানের কাছে তার

ঠোঁট দুখানা সরিয়ে আনলো। তার মাথার চুলগুলো আমার গালে এসে লাগছে,—স্বীকার করছি আমি,—আমার মাথা তখন ঘুরে গেলো—তারপর সে ফিস ফিস ক'রে ব'লে যেতে লাগলো···আমি তার কিছুই বুঝতে পারলাম না···হায়! প্রলাপ বকছিলো সে! আমার কানে কানে সে কথা ব'লে যেতে লাগলো, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে মনে হ'লো তা মাতৃ রুশভাষাই নয়। অবশেষে তার কথা সে শেষ ক'রলো ও কাঁপতে কাঁপতে বালিশে মাথাটা রাখলো,—তারপর আঙুল তুলে আমাকে নিষেধ ক'রলো—'মনে রেখো ডাক্তার, আর কাউকে না।'

"আমি তাকে কোনো রকমে শান্ত করলাম, পান ক'রতে দিলাম কিছু এবং দাসীকে জাগিয়ে রেখে বাইরে চ'লে এলাম।"

ডাক্তারটি এখানে প্রবল উৎসাহে আবার নস্য নিলেন এবং মনে হ'লো তার ফলে খানিকক্ষণ যেনো হতবুদ্ধি হ'য়ে রইলেন।

তারপর ব'লে যেতে লাগলেন—"যা হোক পরদিন, আমি যা ভেবেছিলেম হ'লো তার বিপরীতটা। রোগিণীর অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হ'লো না। আমি ভাবতে লাগলাম, কেবলি ভাবতে লাগলাম এবং হঠাৎ স্থির ক'রে ফেললাম যে সেখানেই থাকবো,—যদিও আমার অন্যান্য রোগীরা আমার অপেক্ষায় ছিলো।···আর আপনি জানেন সেটা কারো উপেক্ষা করা উচিত না, ক'রলে ব্যবসার ক্ষতি হয়। কিন্তু, প্রথমত, এই রোগীর অবস্থা ছিলো সাংঘাতিক; দ্বিতীয়তঃ, সত্য কথা বলতে কি, আমি তার প্রতি প্রবল আসক্তিই অনুভব করছিলাম। তা ছাড়া, সমগ্র পরিবারটিকেই আমার ভালো লেগেছিলো। অবশ্যি তাদের অবস্থা ভালো ছিলো না, তবুও একথা বলতে পারি তাঁরা ছিলেন বিশেষ ক'রে শিক্ষিত পরিবার···তাদের পিতা ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি, একজন গ্রন্থকার! অবশ্যি, দারিদ্র্যের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়, কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিতে সক্ষম হ'য়েছিলেন; তিনি অনেকগুলি বইও রেখে গেছেন। হয়তো আমি রোগিণীকে যত্ন নিয়ে দেখছিলাম তাই, অথবা অন্য কিছুর জন্য, যেদিক দিয়েই হোক, এটুকু সাহস ক'রে বলতে পারি যে তাঁদের বাড়ির সকলেই আমাকে ভালবাসলেন, যেনো আমি তাঁদের সংসারেরই একজন···

ইতিমধ্যে রাস্তাগুলো আরও খারাপ হ'য়ে উঠ্‌লো; বলতে গেলে যাতায়াতের পথ সব একেবারেই নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিলো,—এমন কি ওষুধও সহর থেকে খুব কষ্টে স্বষ্টেই পাওয়া যেতে লাগলো।···

"এদিকে, রোগিণীর অবস্থার কোনই উন্নতি হচ্ছিলো না·· দিনের পর রাত, আবার রাতের পর দিন···কিন্তু···তারপর···" ডাক্তার কিছুক্ষণ মৌন হ'য়ে রইলেন।—"কিভাবে যে বর্ণনা করতে হবে বুঝতে পাচ্ছিনা"···আবার তিনি নস্য নিলেন, কাশলেন ও একটুখানি চা খেয়ে নিলেন।

"বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে এবারে আমি সোজাসুজি বলবো। আমার রোগিণী··· কিভাবে যে কথাটা বলি?···দেখুন, সে যে ··আমাকে ভালোবেসেছিলো·· অথবা··· না, ঠিক তা নয়···তার মনে ভালোবাসা জেগে উঠেছিলো·· যা হোক ··তা— কথাটা কিভাবে বলা যায়?"

ডাক্তার এখানে দৃষ্টি নত ক'রলেন, লাল হ'য়ে উঠলেন এবং তাড়াতাড়ি ক'রে ব'লে যেতে লাগলেন—"না, বাস্তবিকই সে ভালোবেসেছিলো···নিজেকে অতিরিক্ত মূল্যবান মনে করা উচিত নয়। মেয়েটি ছিলো শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, পড়াশুনাও ছিলো তাঁর যথেষ্ট; আর আমার লাতিন ভাষার যা জ্ঞান ছিলো তাও গিয়েছিলাম একেবারে ভুলে। চেহারার কথা—" ডাক্তার সহাস্যে নিজের দেহের দিকে তাকালেন—"সে বিষয়েও আমার অহংকার করার ছিলোনা কিছুই। কিন্তু সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর আমাকে নির্দোষ ক'রে গড়েন নি। কালোকে আমি সাদা মনে করি না; কিন্তু দু একটা বিষয় জানি আমি, যেমন, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম যে আলেক্‌জান্দ্রা,—(তাই নাম তার) তার অন্তরে আমার প্রতি ভালোবাসা অনুভব করেনি, ঠিক বলতে গেলে—সেখানে ছিলো বন্ধুপ্রীতি—আমার উপর শ্রদ্ধা বা আর কিছু,—যদিও হয়তো সেও তার মনের ভাবটি ভুল বুঝেছিলো—তবুও এই ছিলো তার মানসিক অবস্থা। আপনি নিজেই এ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া ক'রতে পারেন।"

ডাক্তার এক নিশ্বাসে এই সব ছাড়া ছাড়া কথাগুলি একটা সুস্পষ্ট বিহ্বলতার সংগে ব'লে নিয়ে আবার সুরু ক'রলেন—"যেনো আসল কথা থেকেই দূরে গিয়ে

পড়ছি—আপনি এ রকম কিছু বুঝবেন না···আপনার অনুমতি নিয়ে এবার আমি শৃংখলার সংগে সঙ্গেই বর্ণনা ক'রে যাবো।"

এক পেয়ালা চা পান ক'রে আরো শান্ত গলায় বলতে লাগলেন।—

"তারপর, আমার রোগিণীর অবস্থা ক্রমে আরো খারাপ হ'তে লাগলো। মশায়, আপনি তো ডাক্তার নন! আপনি বুঝতে পারবেন না, বেচারা ডাক্তারের মনের মধ্যে কি হয়, বিশেষত, প্রথমে সে যখন জানতে পারে রোগটা তাকে শেষ ক'রে আনছে। তখন হঠাৎ সে এমন ভীরু হ'য়ে পড়ে যে তা বোঝানো যায় না। তার মনে হয়, যা কিছু সে জানতো সব ভুলে গেছে, তার উপরে রোগীর আর আস্থা নেই, সবাই লক্ষ্য ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে যে সে কেমন বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ছে; তারা অনিচ্ছার সংগে হলেও কেমন ভাব প্রকাশ করছে! তখন সে ভাবে, লোকে তাকে দেখে সন্দেহের চোখে, কানাঘুষো করে···ওঃ এ অবস্থাটা কী ভয়ানক! তখনি ধারণা হয়—সেই রোগের নিশ্চয়ই একটা অষুধ আছে,—শুধু যদি তার নামটা জানা যায়। তাই নয়? চেষ্টা ক'রছেন আপ্রাণ,—না, ওটা নয় অষুধ। অষুধটাকে রোগ উপশমের প্রয়োজনীয় সময়টুকুও দিতে আপনার দেরী সয়না···আপনি একবার এটা ধরছেন, তার পরেই আর একটা। কখনো কখনো আপনি ব্যবস্থাপত্রের ডাক্তারী বইও ঘাঁটেন,—আপনি মনে করেন,—এই যে পাওয়া গেছে! কখনো কখনো আপনি একটা ওষুধ বেছে নেন,—ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দিয়েই···কিন্তু ইতিমধ্যে যে একটা মানুষই মারা যাচ্ছে! তাকেই বাঁচাতে পারতো আর একজন ডাক্তার। তখন আপনি বলেন—'আমার আর একজনের সংগে পরামর্শ করা দরকার। এমন দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেবোনা আমি।'

"তখন আপনাকে যে কেমন বোকার মতো দেখায়। সময়ে আপনি এটাও সহ্য করতে শেখেন, তখন এটা আপনার কাছে আর কিছুই নয়। একটা মানুষ মারা গেলো?—কিন্তু সে তো আপনার দোষ নয়,—আপনি তার চিকিৎসা করেছেন বিধি-মতই। কিন্তু তখনি আপনার উপরেই রয়েছে সকলের অন্ধ বিশ্বাস এবং আপনি যে কিছুই ক'রতে পারছেন না তার অনুভূতিটা আরও যন্ত্রনার। আমার রোগিণীর সমগ্র পরিবারটিরও

আমার উপর ছিলো এই অন্ধবিশ্বাস। তারা ভাবতেই ভুলে গিয়েছিলো যে তাদের মেয়েটির বিপদ যাচ্ছে। আমিও আমার দিক থেকে তাদের আশ্বাস দিচ্ছিলাম,—ভাবনার কিছু নেই; কিন্তু তখনি আমার বুক যে দমে যাচ্ছিলো।

কষ্ট আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য পথের দশা হ'য়ে উঠলো এমন যে গাড়োয়ান সহরে ওষুধ আনতে গিয়ে সারাদিনের মধ্যে আর ফিরে আসতে পারে না। রোগিণীর ঘর ছেড়ে কোথাও যাইনা আমি; নিজেকে সেখান থেকে কিছুতেই টেনে আনতে পারিনা। আমি কাছে ব'সে তাকে মজার গল্প বলি, তার সঙ্গে তাস খেলি। রাত্রে আমি পাশে ব'সে তার উপর দৃষ্টি রাখি। বৃদ্ধা মা আমাকে চোখের জলে ধন্যবাদ দেন; কিন্তু আমি ভাবি—'আপনার কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত নই আমি।"

আপনার কাছে আমি অকপটে স্বীকার করছি,—এখন আর একথা গোপন করার কারণ থাকতে পারেনা—আমার রোগিণীকে আমি ভালোবেসেছিলাম। আর সেও আমার প্রতি আসক্ত হ'য়ে পড়েছিলো। কখনো কখনো কেবল আমাকে ছাড়া কাউকেই তার ঘরে আসতে দিতো না। সে আমার সংগে কথা বলতে লাগলো, আমাকে নানা কথা জিজ্ঞেস ক'রতে লাগলো—কোথায় পড়াশুনো করেছি, কিভাবে দিন কাটাই, কাদের সংগে দেখাশোনা করি।

"আমি বুঝতে পারছি যে বেশী কথা বলা তার উচিত নয়—কিন্তু তাকে বারণ করা, বুঝলেন মশায়, তা আমি কিছুতেই পারতাম না। সময় সময় আমি হাতে মাথা রেখে শুধু ভাবতাম—'শয়তান, তুমি করছো কি?...এবং সে আমার হাতখানা ধ'রে রাখতো, হাতখানা ধ'রে আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো ও গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতো—"তুমি কতো ভালো।" তার হাতদুখানি এতো গরম, চোখ দুটি এতো বড়ো, এতো অলস ঘুমে ভরা!..."হ্যাঁ, তুমি ভালো, সদাশয় তুমি, আমাদের প্রতিবেশীদের মতো নও...এর আগেই কেনো তোমার সাথে আমার আলাপ হয়নি!"

"আমি তাকে বোঝাই—'তুমি স্থির হও...বিশ্বাস করো, আমি কি রকম ভাগ্যবান মনে করছি আমাকে...শান্ত হও।...সব ঠিক হ'য়ে যাবে;' আবার তুমি সুস্থ হবে।'

আর এখানে আপনাদের ব'লে নেবো—ডাক্তার সামনের দিকে ঝুঁকে, ভ্রূ জোড়া একটু তুলে ব'লে যেতে লাগলেন—"তাঁরা প্রতিবেশীদের সংগে মিশতেন খুবই কম; কেননা তারা তাদের সমপদস্থ ছিলো না। আবার ধনীদের সংগে মিশতেও তাদের আত্ম-সম্মানে লাগতো। আমি আপনাকে বলছি,—তাঁরা ছিলেন যারপরনাই শিক্ষিত পরিবার। কাজেই বুঝতে পারছেন, সেটা হ'লো আমার পক্ষে সুখের। রোগিণী ওষুধ খেতো কেবল আমার হাতেই···বেচারী আমার গায়ে ভর ক'রে উঠে ওষুধটা নিয়ে তাকিয়ে থাকতো আমার মুখে···আমার প্রাণ অনুভব ক'রতো, তার বুক যেনো ফেটে যাচ্ছে।

"ইতিমধ্যে তার অবস্থা হ'য়ে পড়লো আরো খারাপ, ক্রমেই খারাপের দিকে। মনে মনে ভাবলাম. সে মারা যাবে, নিশ্চয়ই মারা যাবে। বিশ্বাস করুন, তার আগে আমারি মারা যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। আর, সেখানে তার মা ও বোনেরা আমার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন···আমাকে লক্ষ্য করছেন···আর আমার উপরে তাদের বিশ্বাস শিথিল হ'য়ে আসছে।"

"দেখুন? ও কেমন আছে?"

"ও, তা, ভালো আছে!"

ভালোই বটে! আমার মন ভেঙে পড়ছে। একরাতে আমি আবার তার পাশে ব'সে আছি একা; ঝিটিও ব'সে আছে, আর পুরোদমে নাক ডেকে যাচ্ছে। সে বেচারীকে আমি দোষ দিই না; কেননা সেও ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো। আলেক্‌জান্ড্রা সমস্ত সন্ধ্যেটাই বড়ো অস্বস্তি বোধ করছিলো, জ্বর আসছিলো তার। মাঝরাত পর্যন্তই সে ছটফট্ করতে লাগলো; শেষে মনে হ'লো ঘুমিয়ে পড়েছে। একটুও না নড়ে সে নিঃসাড়ে প'ড়ে রইলো। ঘরের এক কোনে যিশুর মূর্তির সামনে দীপ জ্বলছে। মাথা নীচু ক'রে আমি ব'সে আছি, এমন কি আমার একটু তন্দ্রাও এসেছে। হঠাৎ মনে হ'লো কে যেনো আমার গা স্পর্শ করলো। মুখ ফিরালাম আমি···ভগবান! আমার দিকে সে অপলক চোখে চেয়ে আছে···তার ঠোঁট দুখানি ঈষৎ ফাঁক হ'য়ে আছে, গাল যেনো তাপে পুড়ে যাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম "কি ?"

সে বললো—'ডাক্তার, আমি কি মারা যাবো ?'

"হা, ভগবান !"

"না, ডাক্তার, না ; বলো যে আমি বাঁচবো···অমন কথা বলো না···তুমি যদি জানতে···শোনো, ঈশ্বরের দোহাই ! আমার প্রকৃত অবস্থা গোপন ক'রো না।" তার এতো ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো···'যদি নিশ্চিতই জানি যে আমি মারা যাবো··· তা হ'লে, আমি সব বলবো···সব।'

"মিনতি করি তোমায়, আলেক্‌জান্দ্রা···"

"শোনো, আমি একটুও ঘুমোই নি···আমি বহুক্ষণ ধ'রে তোমার দিকে তাকিয়ে আছি···ভগবানের নাম ক'রে বলছি···তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, তুমি ভালো. জগতে যা কিছু ভালো আছে সবার নামে মিনতি করছি তোমাকে—আমার কাছে সত্য কথা বলো ! যদি জানতে আমার কাছে তার মূল্য কতোখানি···ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বলো···বলো আমার জীবনের কি আশা নেই কোনো ?"

"তোমাকে কি যে বলবো ?"

"ভগবানের দোহাই !···মিনতি কচ্ছি।"

"তোমার কাছ থেকে আমি কিছুই গোপন ক'রতে পারি না, আলেক্‌জান্দ্রা ! সত্যই, জীবন তোমার বিপন্ন ; কিন্তু, জগদীশ্বর করুণাময়।

"আমি মারা যাবো ; মারা যাবো।"

"মনে হ'লো সে যেনো খুসী হ'য়েছে, এমন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো তার মুখখানি ; আমি তো শংকিতই হ'য়ে পড়লাম।"

"ভয় পেওনা, ভয় পেওনা তুমি, মরণকে তো আমি একটুও ভয় করিনা।"

এবং হঠাৎ সে উঠে বসলো ও আমার গায়ে তার দেহ এলিয়ে দিলো।

'এখন হ্যাঁ, এখন আমি বলতে পারি ···বলতে পারি যে তুমি ভালো, খুব ভালো,. তুমি দরদী, তোমাকে আমি বুক ভরে ভালোবাসি।'

অভিভূতের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। আমার পক্ষে সে অবস্থা সাংঘাতিক।

"শুনছো, তোমায় আমি ভালোবাসি।"

"আলেকজান্দ্রা, আমি কি তোমার ভালোবাসার—

"না, না, তুমি—তুমি আমার কথা বুঝতে পারছোনা।'

এবং হঠাৎ সে এবারে হাত বাড়িয়ে আমার মাথাটি দুহাতে জড়িয়ে ধ'রে চুমো খেলো···বিশ্বাস করুণ আমি প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলাম···বালিশে মুখ গুঁজে রইলাম। একটি কথাও সে বলছিলোনা, তার আঙুলগুলি নীরবে আমার চুলের মধ্যে কাঁপছিলো শুধু। কান পেতে ছিলাম আমি—সে কাঁদছে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম···সত্যিই জানিনা, তখন তাকে যে কি বলেছিলাম! সম্ভবত বলেছিলাম—'তুমি ঝিটার ঘুম ভাঙিয়ে দেবে। আমি তোমাকে প্রাণের ধন্যবাদ জানাছি···আমাকে বিশ্বাস করো···শান্ত হও।'

সে বলতে লাগলো—'থাক, থাক, ওদের কথা ভাববার দরকার নেই; উঠুক ওরা জেগে, আসুক ওরা ঘরে—কোন ক্ষতি নেই, আমি তো মারা যাচ্ছি, তুমি কিসের ভয় কচ্ছো? তুমি কেনো ভয় পাচ্ছো? মাথা তোলো, আমার দিকে চাও···তা, হয়তো তুমি আমাকে ভালোবাসো না,—হয়তো আমারি ভুল···তা যদি হয়, ক্ষমা করো আমাকে।'

বললাম—"কি বলছো তুমি!···আমি তোমাকে ভালোবাসি।" সে সোজা আমার চোখে চোখ মেলে তার হাতদুখানি বাড়িয়ে দিলো—'তা হ'লে তুমি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরো।' আমি আপনাকে সরলভাবেই বলছি, সে রাতে যে কেন আমি পাগোল হ'য়ে যাইনি জানিনা। আমি অনুভব করলাম, রোগিণী নিজেই বুক ফেটে মরছে। দেখলাম সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয়, এটাও বুঝলাম,—সে যদি নিজেকে মৃত্যু-যাত্রী না ভাবতো তা হ'লে আমার কথা ভাবতোই না···ভালোবাসা যে কি তা না জেনে বিশ বছর বয়সে ম'রে যাওয়া বাস্তাবিকই বড়ো কষ্টের। এটাই তাকে মর্মান্তিক আঘাত দিচ্ছিলো। এই কারণেই, নৈরাশ্যের বেদনায় সে আমাকে জড়িয়ে ধ'রেছিলো,—এবার আমার কথাটা বুঝতে

পারছেন? সে আমাকে দুহাতে নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধ'রে রইলো, কিছুতেই ছেড়ে দিতে চাইলো না। বললাম—'আমাকে বাঁচাও, তোমার নিজেকে বাঁচাও।'

সে বললো,—'কেন, ভাববার কি আছে? তুমি জানো, আমি মরবোই···'এই কথাগুলি বলতে লাগলো সে বারবার ক'রে। 'যদি জানতাম, জীবন ফিরে পাবো, আবার হ'য়ে উঠ্‌বো এক তরুণী, · তা হ'লে আমার লজ্জা পাবার কথা···সত্যিই লজ্জা পাবার কথা···কিন্তু এখন কি।'

'কিন্তু কে তোমাকে বলেছে, মরবে তুমি?'

'না, না, রাখো ও কথা। আমাকে তুমি ঠকাতে পারবে না; কি ক'রে মিছে কথা বলতে হয় তুমি জানোনা, নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো।···'

"না, তুমি বাঁচবে, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবো। আমরা দুজনে তোমার মায়ের আশীর্বাদ চেয়ে নেবো···আমাদের দুটি জীবন এক হবে—আমরা দুজনে সুখী হবো।"

'না, না, তুমি কথা দিয়েছো আমি মরবোই···আমি মরবোই···তুমি আমার কাছে শপথ ক'রে বলেছো,···তুমি আমাকে বলেছো······।"

ব্যাপারটা আমার কাছে হ'য়ে উঠ্‌লো নির্মম, মর্মান্তিক···নানা কারণেই মর্মান্তিক। দেখুন, সামান্য জিনিষও কখন কখন কি না করতে পারে? মনে হয় তা কিছুই না, তবু কতো কষ্টের। আমার নাম জানবার কথা মনে পড়লো তার,—আমার ডাকনাম···সে বাড়িতে সকলেই আমাকে ডাকতেন ডাক্তার ব'লে। আমাকে কিন্তু এর কাছে ডাকনামই ব'লতে হ'লো। শু'নে সে ভুরু কোঁচকালো, মাথা নাড়লো এবং ফরাসী ভাষায় অস্ফুট স্বরে কি যেনো বললো,—অপ্রীতিকর কিছু, অবশ্যি! তারপর হাসলো, তাও তেমনি অপ্রীতিকর সুরে।

এই ভাবে তার সংগে সারাটা রাত কাটাই। ভোর হবার আগেই আমি তার ঘর থেকে চ'লে আসি, আমি যেনো পাগোল হ'য়ে গেছি। তারপর আবার যখন তার ঘরে যাই, তখন দিনের আলো ফুটে উঠেছে। ভগবান! এ যে কী চেহারা হ'য়েছে তার! লোককে যখন কবর দেওয়া হয়, তখনো তাকে এর চেয়ে ভালো দেখায়! আমার সম্মানের দোহাই দিয়েই বলছি আপনার কাছে—আমি বুঝিনা এখন, একেবারেই বুঝে

উঠ্‌তে পারিনা—কী ক'রে যে দিন কাটাচ্ছিলাম। তিন দিন তিন রাত্রি আমার রোগিণী জীবিত রইলো। আর সেই রাত্রিগুলি! তখন সে আমাকে কি সব কথাই বলেছিলো।

শেষের রাতটা,—মনে মনে কল্পনা করুন,—আমি ব'সে আছি তার কাছে, ভগবানের কাছে নিয়তই প্রার্থনা করছি—'একে নাও প্রভু, একে নাও, আর সেই সাথে আমাকেও নাও।'

বৃদ্ধা মা অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন। আগের সন্ধ্যায় আমি তাঁকে ব'লেছিলাম,—আশা নেই এখন আর, পাদ্রীকে ডেকে পাঠানো ভালো। রোগিণী এবার মাকে দেখে ব'লে উঠলো—'তুমি এসেছো মা, ভালোই হ'য়েছে। আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখো, আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসি,—আমরা দুজনেই কথা দিয়েছি।'

তিনি বললেন,—'ও কি বলছে, ডাক্তার? ও কি বলছে?' ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলাম আমি,—বললাম—'ও প্রলাপ বকছে, জ্বরে।' রোগিণী ব'লে উঠ্‌লো—'চুপ, চুপ করো তুমি, ওকথা ব'লোনা। এই একটু আগেই তুমি বলেছো অন্য কথা, আর আমার আংটি নিয়েছো তোমার হাতে। ছলনা ক'রছো কেন? আমার মা খুব ভালো,—উনি ক্ষমা করবেন,—উনি সব বুঝবেন,—আমি মারা যাচ্ছি··· · আমায় মিছে বানিয়ে বলার দরকার নেই। তোমার হাতখানা আমাকে দাও।'

আমি লাফিয়ে উঠে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বৃদ্ধা অবশ্যি ব্যাপারটা অনুমান ক'রলেন।

আরো ব'লে আপনাকে বিরক্ত ক'রবোনা; আর আমার পক্ষেও সে কথা মনে আনা বেদনার। আমার রোগিণী পরের দিনই মারা যায়। "ভগবান তার আত্মাকে শান্তিদান করুণ!"—ডাক্তার কথা কয়টি তাড়াতাড়ি ক'রে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'লে গেলেন—"তার মৃত্যুর আগে আমাকে তার কাছে একা রেখে সে বাড়ীর আর সবাইকে ঘর থেকে বাইরে যেতে ব'লেছিলো।"

তখন সে বলেছিলো—'আমাকে ক্ষমা করো···আমার রোগের জন্য হয়তো তোমাকেই আমার দায়ী ক'রতে হবে···কিন্তু বিশ্বাস করো তুমি···তোমার চেয়ে বেশী ভালো আমি আর কাউকেই বাসিনি······আমাকে ভুলো না তুমি···আমার আংটিটা রেখে দিও।'

ডাক্তার মুখ ফেরালেন, আমি নীরবে তাঁর হাত ধরে রইলাম।

তিনি বললেন—"অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা করা যাক্; সামান্য কিছু বাজি রেখে তাস খেলবেন আপনি? আমার মতো লোকের পক্ষে এমন অদ্ভুত আবেগে অভিভূত হ'য়ে পড়া ঠিক নয়। আজকাল আমার কেবল একটি বিষয়ই ভাববার আছে,—কেমন ক'রে ছেলেমেয়েরা পেট ভ'রে খেতে পাবে আর স্ত্রীর মেজাজটি ঠাণ্ডা থাকবে! ও, তারপর আমি বিয়ে করি,—এক ব্যবসায়ীর মেয়েকে…সেজন্যে যৌতুক নিয়েছি নগদ সাত হাজার। নাম তার আকুলিনা। আমার নামের সংগে মিল রয়েছে বেশ। মেজাজটি তার বড্ডো কড়া, কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশত, সারাদিনই পড়ে ঘুমোয় শুধু…তা এখন একটু তাস খেলবেন কি?

আমরা এবার তাস খেলতে ব'সলাম। ডাক্তার আমার কাছ থেকে আড়াই রুবল জিতে অনেক রাতে বাড়ীর মুখে ফিরলেন; বিজয়ের আনন্দে তখন তিনি একেবারেই আত্মহারা!

লিয়ো নিকোলেভিচ্ টলষ্টয়

(১৮২৮—১৯১০)

তুলার অন্তর্গত ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় জমিদার বংশে এঁর জন্ম, ২৮শে আগষ্ট ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয় অতি অল্প বয়সেই। মস্কো ও কাজানে শিক্ষার পরে যদৃচ্ছা জীবন যাপন করেন এবং নিজের উপর বিরক্ত হ'য়ে ককেশাশ সৈন্য বাহিনীতে যোগ দান করেন; ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সিবাষ্টোপোল ধ্বংসকালে ইনি ছিলেন সৈন্য বিভাগে। এর পরে যুদ্ধবিভাগ থেকে পদত্যাগ ক'রে কিছুদিন বাস করেন মস্কোর সাহিত্য-ক্ষেত্রে। পরে মস্কোর কাছেই তাঁর নিজের জমিদারীতে কিষাণদের মধ্যে কিষাণের মতো সরল জীবন যাপন স্থুরু করেন, এবং প্রচার ক'রতে থাকেন তার নিজস্ব এক মতবাদ,—অহিংসা, দীন জীবন যাপন ও আত্মসমর্পণই তার মূলমন্ত্র। নিজের জমিদারী স্ত্রীকে দান করে ভৃত্যের মতো ইনি জীবন যাপন ক'রতে থাকেন নিজেরি ঘরে; কিন্তু ঘরে বাইরে, বিশেষ ক'রে গার্হস্থ ব্যাপারে বিরক্ত ও দুঃখিত হ'য়ে উঠেন,—কটু সমালোচনাও সহ্য ক'রতে হয় যথেষ্ট। ১৯১০এ একদিন শেষে তার ষোলো বছরের মেয়ের সংগে গৃহ ত্যাগ করেন নির্জনে সন্ন্যাসী-জীবন যাপনের জন্য, কিন্তু পথেই আষ্টাপাভো ষ্টেশনে পীড়িত হন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর সেখানেই তার বিভিন্নমুখী বিচিত্র জীবনের অবসান ঘটে।

ইনি জগদ্বিখ্যাত রুশলেখক। জীবনের বিভিন্ন পরিবেশে ও পরিবর্তনশীল মতবাদে এঁর রচনা বিচিত্র। রচনার সংগে জীবনের মতবাদ অংগাগীভাবে জড়িত, তাই এঁর জীবনের পর্যালোচনা বিশিষ্টভাবেই প্রয়োজন।

বিখ্যাত রচনা: "চাইল্ড হুড্, বয়হুড্ এ্যাণ্ড ইউথ"; "সিবাষ্টোপোল টেল্স"; "ওয়ার এণ্ড পিস", "আনা কারিনিনা", "রিজারেকশন"; "ক্যাপ্টিভ্ ইন্ দি ককেশাশ"; "টু পিলগ্রিম্স", "ইন্ আর্ট" ইত্যাদি······

তিন ঋষি

আর্ক এঞ্জেল থেকে একজন বিশপ জাহাজে ক'রে যাচ্ছিলেন—সোলোভ্‌কির মুখে। কয়েকজন তীর্থযাত্রীও চলেছে এই জাহাজেই।

অনুকূল বাতাস; শান্ত আকাশ। তীর্থযাত্রীরা শুয়ে শুয়ে খেতে খেতে, কখনও বা ভিড় ক'রে বসে আলোচনায় জ'মে ছিলো।

বিশপ ডকের উপরে ওঠানামা ক'রে বেড়াতে বেড়াতে জাহাজের মাথার দিকে এগিয়ে এসে দেখলেন: অনেকগুলি লোক সেখানে ভিড় জমিয়ে আছে। বেঁটে এক জেলে সমুদ্রের দিকে কী যেন নির্দেশ ক'রে দেখাচ্ছে, আর কথা ব'লছে; আর সবাইও এক মনে তাই শুন্‌ছে।

বিশপ স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন এবং জেলেটি যেদিকটা দেখাচ্ছিলো সেই দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু কিছুই ত দেখা যাচ্ছে না। রৌদ্রের মধ্যে সমস্ত সমুদ্র শুধু ঝলমল ক'রছে।

বিশপ আরও এগিয়ে এসে শুনতে লাগলেন। জেলেটি বিশপকে দেখতে পেয়েই টুপি খুলে নিলো এবং সসম্ভ্রমে চুপ ক'রে গেলো। আর সবাইও টুপি-খুলে নিয়ে সম্মান দেখালো।

"আমাকে দেখে সঙ্কোচ ক'রো না, ভাইরা" বিশপ বল্‌লেন! "আমি এসেছি, তুমি কি ব'লছ তাই শুন্‌তে।"

"এই জেলেটি কয়েকজন সন্ন্যাসীর কথা আমাদের কাছে ব'লছিলো।"—একজন বণিক সাহস ক'রেই বললো।

"সন্ন্যাসীদের কি কথা?"—বিশপ জানতে চাইলেন ও জাহাজের এক পাশে উঁচু মতো জায়গায় এসে একটা বাক্সের উপর ব'সে নিলেন।

"আমাকেও বলো : আমারো শুনতে ইচ্ছা ক'রছে। ওদিকে কি দেখাচ্ছিলে ?"

"হ্যাঁ, বলছি শুনুন। দূরান্তে ঐ যে ছোট্ট দ্বীপটি চোখের উপরে ভুলে উঠ্ছে"—বেঁটে জেলেটি ব'ললো ও বন্দরের দিকে আঙ্‌ল দিয়ে দেখালো,—"ঠিক ঐ দ্বীপটিতেই তিনজন সন্ন্যাসী থাকেন, তারা মুক্তি-সাধনা ক'চ্ছেন।"

"কোথায় সেই ছোট্ট দ্বীপটি ?"—বিশপ জিজ্ঞেস ক'রলেন।

"ঐ যে, আমার হাতের সোজা একবারটি তাকান। ঐ ছোট্ট মেঘটুকুর বাঁ দিক দিয়ে দূরে, দেখ্‌তে পাচ্ছেন ?"

বিশপ বারবার ক'রে তাকালেন : সূর্যালোকে জল শুধুই ঝলমল ক'রে উঠছে। তিনি নতুন কিছুই দেখতে পেলেন না।

"দেখছি না তো !—ঐ ছোট্ট দ্বীপটিতে যাঁরা থাকেন তাঁরা কিরকমের সন্ন্যাসী ?"

"ঋষি"—জেলেটি উত্তর দিলো। অনেক অনেক দিন ধ'রে তাঁদের কথা শুনে আস্‌ছি ; কিন্তু এই গত গ্রীষ্মের আগে আর কখনো দেখতে পাইনি।"

জেলেটি এবার বর্ণনা সুরু ক'রলো : কেমন ক'রে সে একবার মাছ ধ'রতে গিয়েছিলো এবং কি ক'রে সেখানে গিয়ে পড়্‌ল, চিন্‌তেই পারলো না কোথায় যে সে এসেছে। ভোর বেলায় চারিদিকটা দেখবার জন্য সে ঘুরতে আরম্ভ ক'রে হঠাৎ দেখলো, সামনেই ছোট্ট একটা মাটির কুটির। ভেতরে একজন সন্ন্যাসী ব'সে আছেন। তারপর, আর দুজনও তার ভিতরে এলেন। তারা তাঁকে খাবার দিলেন, সব কিছু গরম ক'রে দিলেন এবং তার নৌকোটা সারতেও যথেষ্ট সাহায্য ক'রলেন।

"কি রকম তারা ?"

"একজন একটু খাটোই, পিঠে কুঁজ, একেবারে খুব বেশী বুড়ো : শত ছেঁড়া একটা আলখাল্লা পরা ; বয়স তার নিশ্চয়ই একশ বছরের উপর। অনেক আগেই তার দাড়ি রূপোর মত শাদা হ'য়ে গেছে ; কিন্তু সব সময় তার মুখে হাসিটি লেগেই আছে ; এতো শান্ত তিনি—আকাশ থেকে যেনো দেবদূত নেমে এসেছেন। দ্বিতীয় জন আরো দীর্ঘ, তিনিও বুড়ো—ছেঁড়া একটা কাপ্তান-পরা ; তার লম্বা দাড়ি একটু হলদে ছাঁটের ; কিন্তু বেশ শক্তিশালীই তিনি, আমার নৌকো একাই উল্টে নিলেন, সে যেনো

একটা বাল্‌তি—এবং এমন কি আমি একটু সাহায্যও করিনি ! বেশ হাসি খুসী তিনি, কিন্তু তৃতীয় জন লম্বা, দাড়ি হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার লম্বা দাড়ি তুষারের মতো শাদা কিন্তু বিষণ্ন তার মুখ ; ঝুলে-পড়া ঘন ভুরুর নীচ দিয়ে চোখ ছুটো জলজল ক'চ্ছে ; নগ্ন সে, শুধু মাত্র একটু চওড়া ন্যাকড়া কোমড়ে জড়ানো।"

"তাঁরা কি ব'ললেন তোমাকে ?" বিশপ জিজ্ঞেস ক'রলেন।

"তারা সব কিছুই কচ্ছিলেন নীরবে এবং নিজেদের মধ্যেও কথা বলছিলেন খুবই কম ; একজনে একবার চোখ তুলে চাইতেই অন্যজন বুঝে নিতেন। আমি লম্বা জনকে জিজ্ঞেস ক'রলাম যে তাঁরা অনেকদিন ধ'রে সেখানে আছে কিনা। তিনি ভুরু কুঁচকে কি যেনো বিড়্‌বিড়্‌ করলেন, যেনো রেগেই উঠলেন। খাটো বুড়ো লোকটি তথন তার হাত ধ'রে একটু হাসলেন এবং দীর্ঘ লোকটি কিছু আর ব'ল্‌লেন না। কিন্তু বুড়ো লোকটি বললেন, 'ক্ষমা করবেন'—আর তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

জেলেটি কথা বলছে আর এদিকে জাহাজটা ক্রমেই সেই দ্বীপের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

"ঐ যে সোজা দেখতে পাচ্ছেন", বণিকটি বল্‌লো। "দেখুন, এবারে দেখুন একবার"—সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো। বিশপও দেখতে চেষ্টা ক'রলেন, কালো একটা বিন্দুর মতোই যেনো দেখলেন—সেই ছোট্ট দ্বীপটা।

বিশপ অপলক চোখে শুধু তাকিয়ে রইলেন এবং জাহাজের সুমুখ থেকে পেছনে হালের-দিকটার কাছে এলেন।

"ঐ ছোট্ট দ্বীপটা"—তিনি বললেন—"ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওটার নাম কি ?"

"যত দূর জানি ওর কোনো নাম নেই : অমন তো কতোই র'য়েছে।"

"ওরা যে ব'লছে, কয়েকজন সন্ন্যাসী থাকেন ওখানে, তা' কি সত্যি ?"

"দেখুন, লোকে তো বল্‌ছে তো সবি, কিন্তু আমি ঠিক জানিনে। জেলেরা সবাই তো বলে নিজেরা তাদের দেখেছে। তবুও লোকে তো কতোই বলে !"

"ঐ ছোট্ট দ্বীপটিতে নেমে সন্ন্যাসীদের দেখতে খুবই ইচ্ছে হ'চ্ছে আমার",—বিশপ ব'ল্‌লেন। কি ক'রে ব্যবস্থা হ'তে পারে ?"

"জাহাজে ক'রে তো ওখানে যাওয়া অসম্ভব।"—হালের লোকটা ব'ললো। "একটা নৌকোয় উঠে যেতে পারেন, তা কাপ্তেনকে ব'লতে হবে আপনার। কাপ্তেনকে ডাকোতো।"

"ঐ সন্ন্যাসীদের একবার দেখতে হবে", বিশপ ব'ললেন,—"কাজেই ওখানে যাওয়ার ব্যবস্থা কি সম্ভব হবে?"

কাপ্তেন চেষ্টা ক'রলো তাঁকে বিরত ক'রতে।

"হ্যাঁ, সম্ভব কেন, খুবই সম্ভব, কিন্তু অনেক সময় চ'লে যাবে। এবং আমি নিজেই জোর দিয়ে আপনাকে বলতে পারি, তাদের দেখতে যাওয়ার মতো সময় এবং কষ্ট বৃথাই যাবে আপনার। অনেকের কাছ থেকে শুনেছি যে ঐ বুড়ো লোক ক'টি ঠিক মূর্খের মতোই জীবন কাটায়; বোঝে না কিছু এবং ব'লতেও পারে না। ব'লতে গেলে এক প্রকার সামুদ্রিক জীবই আর কি!"

"আমার খুবই আগ্রহ হ'চ্ছে," বিশপ ব'ললেন। "আমাকে ওখানে পৌছে দিলে সে পরিশ্রমের জন্য টাকা দিচ্ছি আমি।"

অন্যথা করার কিছু নেই। নাবিকদের সব বন্দোবস্ত ঠিক। পালের মুখ ফিরানো হ'লো; হালের লোকটা জাহাজটা ঘুরিয়ে দিলো। এবার দ্বীপের দিকে যাত্রা সুরু। জাহাজের সামনের দিকে বিশপের জন্য একটা চেয়ার পাতা হ'য়েছে; সেখানে ব'সে তিনি তাকিয়ে রইলেন। জাহাজের আগায় তখন সমস্ত লোকের ভিড়, সবাই ছোট্ট দ্বীপটির দিকে চেয়ে আছে। বিশ্বাসে তীক্ষ্ণ চোখ যাদের তারা ইতিমধ্যেই দ্বীপের উপরকার পাহাড় দেখতে পেলো, এবং কুটিরগুলিও আঙুল দিয়ে দেখালো। একজনে এমন কি তিনজন সন্ন্যাসীকে পর্যন্ত দেখলো। কাপ্তেন দূরবীন বের ক'রে একবার দেখে নিয়ে সেটা বিশপের হাতে দিলো।

"সত্যই,"—ব'ললো সে—"সাগরতীরে ঐ ডানদিকে বড়ো একটা পাহাড়ের উপর তিনজন মানুষ!"

বিশপও দূরবীনের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি ফেললেন,—ঠিক যে জায়গায়টা দেখবার কথা: তিনজন লোক সত্যই দাঁড়িয়ে ওখানে,—একজন লম্বা, দ্বিতীয়জন একটু খাটো,

তৃতীয়জন একেবারেই খাটো। সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন তারা, হাতে হাত ধ'রে। কাপ্তেন বিশপের কাছে এলেন :

"এখানে জাহাজ থামিয়ে নোঙর ক'রতে হবে। আপনি ব'ললে, একটা নৌকোয় ক'রে আপনাকে তীরে তুলে দেওয়া যায়; আমরা এখানে নোঙর ক'রে অপেক্ষা করি।"

তখনি তারা দড়ি-শেকল প্রস্তুত রেখে নোঙর নামালো, পাল গুটিয়ে ফেললো,—জাহাজটাও উপরে জেগে উঠে দুলতে লাগলো। একটা নৌকো নামানো হ'লে দাঁড়ি মাঝিরা গিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে বসলো এবং বিশপ পাশের সিড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। বাহকেরা দাঁড় তুললো ও দ্বীপের দিকে সোজা এগিয়ে চললো। তীরে তিনটি বুড়ো দাঁড়িয়ে,—লম্বাজন নগ্ন, একটু ন্যাকড়াই শুধু জড়ানো; খাটো-জনের পরণে ছেঁড়া কাফ্‌তান; আর বুড়ো জনের পুরোনো একটা আলখাল্লা। তিনজন মিলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, হাত ধরাধরি ক'রে। নাবিকরা তীরে এসে পড়লো, নৌকোটাকে নোঙর ফেলে আটকে রাখা হ'লো এবং বিশপও নামলেন।

সন্ন্যাসীরা তার সামনে মাথা নোয়ালেন; আশীর্বাদ করলেন তিনি; তারা মাথা আরো নত ক'রে রাখলেন। এবার বিশপ তাদের বলতে আরম্ভ করলেন :

"শুনতে পেলাম,—আপনারা এখানে কয়েকজন সন্ন্যাসী মানে কয়েকজন খৃষ্টের অনুচর বাস কচ্ছেন ও মুক্তি সাধনা কচ্ছেন; আপনারা ভগবানেরি পূজো করেন তো! আমিও ভগবানের একজন অযোগ্য সেবক, তাঁর পালের একটি মেষশিশু, এবং ভগবানেরি অনুগ্রহে এখানে এসে পড়েছি। আর, আমারো আগ্রহ হ'চ্ছে—যদি পারি আপনাদের কিছু নির্দেশ-উপদেশ দিয়ে যাই, আপনারাও তো ভগবানেরি সেবক।"

সন্ন্যাসীরা নীরব। তারা মৃদু একটু হাসলেন ও এ ওর দিকে দৃষ্টি বিনিময় করলেন শুধু।

"আচ্ছা, বলুন দেখি, কিভাবে আপনারা মুক্তি সাধনা করেন, কিভাবে ভগবানকে সেবা করেন?"—বিশপ জানতে চাইলেন।

মধ্যম সন্ন্যাসীটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং বৃদ্ধ-প্রাচীনের দিকে,—প্রশান্তটির দিকে

তাকালেন: দীর্ঘ লোকটির ভুরু কুঁচকে গেলো এবং তিনিও বৃদ্ধ-প্রাচীনের দিকে তাকালেন। বুড়ো সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হেসে বললেন:—

"ভগবানের সেবক আপনি! আমাদের ভগবানকে সেবা করার মতো ক্ষমতা নেই: কিছু খেয়ে দেয়ে আমরা নিজেদেরি সেবা করি।"

"কিভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন?"—বিশপ জিজ্ঞেস ক'রলেন। এবং প্রশান্ত সন্ন্যাসীটি ব'ললেন,—"এই রকম প্রার্থনা করি: তুমি তিন, আমরা তিন, আমাদের দয়া করো।"*

প্রশান্ত সন্ন্যাসীটি যেই এই কথা ব'ললেন, তিনজন সন্ন্যাসীই অমনি ঊর্দ্ধে চোখ তুললেন এবং তিনজনেই ব'ললেন, "তুমি তিন, আমরা তিন, আমাদের দয়া করো।"

বিশপ একটু হাসলেন ও ব'ললেন—"আপনারা Holy trinity বা পবিত্র-ত্রিমূর্তির বিষয়ে একথা শুনেছেন; কিন্তু এ ভাবে আপনাদের প্রার্থনা করা উচিত নয়। আমি আপনাদের দিকে একটু সুনজরই দিয়েছি, ভগবানের সন্তানই তো সব! বুঝতে পেরেছি যে আপনারা ভগবানকে খুশী করতে চান, কিন্তু জানেন না তাকে যে কী ক'রে সেবা করে। ও রকম ক'রে প্রার্থনা করে না। এবারে আমার দিকে মনোযোগ দিন; আমি এক্ষুনি আপনাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। আমার নিজের কথা আপনাদের শেখাচ্ছি না, ভগবানের ধর্ম-গ্রন্থ থেকেই বলছি—ভগবান সকলের জন্য যে রকম প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন।"

বিশপ সন্ন্যাসীদের বুঝিয়ে ব'লতে লাগলেন,—ভগবান কেমন ক'রে পৃথিবীর মানুষের কাছে দেখা দিলেন। শেখালেন: ভগবান পিতা, ভগবান সন্তান, ভগবান আত্মা—এই ত্রিরূপের কথা এবং ব'ললেন—

"ভগবান সন্তানরূপে পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিলেন মানুষকে বাঁচাবার জন্য এবং ঠিক এইরূপে সবাইকে তিনি প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন,—মন দিয়ে শুনুন ও আমার পরে আবৃত্তি করুন।"

বিশপ ব'লতে লাগলেন—"আমাদের পিতা"—এবং একজন সন্ন্যাসীও আবৃত্তি

---

* Tróc Vas, Troe nas, Promilúe nas

ক'রলেন—"আমাদের পিতা", আর একজন সন্ন্যাসীও আবৃত্তি ক'রলেন—"আমাদের পিতা",—তারপর, আর জনেও "আমাদের পিতা" ;—"যিনি স্বর্গে বিরাজমান" এবং সন্ন্যাসীরাও ফিরে বলতে চেষ্টা ক'রলেন—"যিনি স্বর্গে বিরাজমান।"

কিন্তু মধ্যম সন্ন্যাসীটি শব্দ ক'টি জড়িয়ে ফেললেন, তিনি ঠিক ঠিক আবৃত্তি ক'রতে পারলেন না। দীর্ঘ নগ্ন সন্ন্যাসীটি আবৃত্তিই ক'রতে পারলেন না; জিভ তার জড়িয়ে গেছে—স্পষ্ট কথা বলা অসম্ভব। দন্তহীন প্রশান্ত সন্ন্যাসীটি তোতলিয়ে যা বললেন কিছুই তা বোঝা গেলো না।

বিশপ দ্বিতীয়বার ব'ললেন: সন্ন্যাসীরাও ফিরে বললেন, বিশপ এবার গোলাকার একটা পাথরের উপরে ব'সে নিলেন, সন্ন্যাসীরা তার পাশে ঘিরে দাঁড়ালেন এবং বিশপের ওষ্ঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এবং তার পরেই আবৃত্তি ক'রতে ক'রতে শেষ পর্যন্ত তারা ব'লতে পারলেন। সমস্ত দিন ধ'রেই বিশপ তাঁদের নিয়ে পরিশ্রম ক'রলেন; দশবার, বিশবার, শতবার এক একটা শব্দ তিনি ফিরে ফিরে ব'ললেন এবং সন্ন্যাসীরাও মুখস্থ ক'রে নিলেন। ভুল ক'রে জড়িয়ে ফেললে বিশপ আবার ঠিক ক'রে দিলেন, আবার প্রথম থেকেই বারবার দেখিয়ে দিলেন।

"প্রভুর প্রতি প্রার্থনা"-র সবটাই সন্ন্যাসীদের তিনি শিখিয়ে তবে ছাড়লেন। তারা প্রথম শুনে আবৃত্তি করলেন, তারপরে নিজেরাই।

প্রথমে শিখলেন মধ্যম আকারের সন্ন্যাসীটি এবং তিনি আগা থেকে গোড়া আবৃত্তি ক'রে গেলেন; এবং বিশপ তাকে বলতে বললেন, এবং আবার ফিরে ফিরে। অন্য দুজনেও প্রার্থনার সমস্তটা শিখে ফেললেন।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে গেছে, সাগর থেকে উপরে উঠে আসছে চাঁদ। বিশপ তাদের গায়ে হাত রেখে করুণায় চুম্বন ক'রলেন, তার শিখানো নিয়মে প্রার্থনা ক'রতে নির্দেশ দিলেন, তারপর নৌকোয় এসে আসন নিয়ে জাহাজে ফিরে চললেন।

নৌকোতে ক'রে জাহাজের দিকে যেতে যেতে তিনি ব'সে শুনছিলেন,—সন্ন্যাসীরা গলা খুলে প্রভুর কাছের প্রার্থনা বারবার আবৃত্তি ক'রে যাচ্ছে।

জাহাজে ফিরে এলো সকলে। এবার আর সন্ন্যাসীদের গলা শোনা যাচ্ছিলো না,

তবু তখনো তারা দেখতে পাচ্ছিলো : বালু তীরে সেই জায়গায় তিনজন সন্ন্যাসী চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে আছে, খাটো-জন মধ্যখানে, লম্বা-জন তার ডান দিকে এবং অন্যজন বাঁয়ে।

বিশপ জাহাজে ফিরে এলেন, ডেকে উঠে গেলেন। নোঙর তো হোলো, পাল খাটানো হোলো পালটা হাওয়ায় গোল হ'য়ে ফুলে উঠ্‌লো—জাহাজ নড়ে উঠে চলছে এবার—এবং অনেক দুর পথ এগিয়ে এসেছে।

বিশপ জাহাজের পেছনে এসে একটা জায়গায় ব'সলেন, ঐ ছোট্ট দ্বীপটিরও দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রথমে সন্ন্যাসীদের দেখা যাচ্ছিলো, তারপর চোখের আড়ালে তারা হারিয়ে গেলেন—এবারে দ্বীপটি শুধু দেখা যাচ্ছে। তারপরে, দ্বীপটিও আর দেখা গেলো না : চাঁদের আলোতে সমস্ত সাগরই শুধ্ ফেনিল খেলায় পাগোল।

তীর্থযাত্রীরা ঘুমুবার জন্য শুয়ে প'ড়েছে। ডেকের উপরটা একেবারে নিঃশব্দ। কিন্তু বিশপের ঘুমুতে ইচ্ছা হ'লো না। একা তিনি হালের কাছে ব'সে আছেন,—দ্বীপটি যেদিকে দৃষ্টি থেকে সমুদ্রের মধ্যে মিলিয়ে গেছে—সেদিকে তিনি এক মনে চেয়ে আছেন, ভাবছেন সেই সাধু-সন্ন্যাসীরদের কথা।

প্রার্থনায় যে সব কথা তারা আজ জানলো তাতে নিশ্চয়ই খুব খুসী হয়েছে তারা ; ভগবানকে ধন্যবাদ জানালেন যে তাকে দিয়েই তিনি ঐ সন্ন্যাসীদের কাছে ভগবানের বাণী শেখাতে পাঠিয়েছেন।

বিশপ ব'সে ব'সে ভাবছেন, আর ক্রম-বিলীন দ্বীপটির দিকে শুধু চেয়ে আছেন। চাঁদের আলো ঢেউয়ে ঢেউয়ে নেচে বেড়াচ্ছে, তার চোখও সে আলোতে ভ'রে গেছে। হঠাৎ দেখলেন জ্যোছনা-পথে সমুদ্রে শাদা শাদা উজ্জ্বল কি যেনো ঝলমল ক'রে উঠ্‌ছে। এমন শুভ্রোজ্জ্বল সে !—পাখী, সাগর-চিল, না নৌকোর পাল ? বিশপ তীক্ষ্ণ চোখে নজর ক'রে দেখলেন।

"একটা পালের নৌকো"—ভাবলেন তিনি—"আমাদের এদিকে আসছে। হ্যাঁ, খুব দ্রুতই এসে আমাদের ধ'রে ফেলবে। ছিলো কতো দূরে, বহু দূরে—আর এখন

এতো কাছে আমাদের! কিন্তু ঠিক পালের নৌকোর মতো দেখাচ্ছে না যে। যা হ'ক, একটা কিছু আমাদের দিকে আসছে, এখনি আমাদের ধ'রে ফেলবে।"

বিশপ স্থির ক'রতে পারলেন না যে ওটা কি,—নৌকো? না, নৌকো না; পাখী? পাখী নয়; মাছ? না ঠিক মাছও না,—কিন্তু মস্তো বড়ো? তা ব'লে সমুদ্রের মধ্যে মানুষ হওয়াও অসম্ভব।

বিশপ উঠলেন এবং হালের লোকটার কাছে গেলেন।

"ঐ দেখো"—ব'ললেন তিনি,—"ওটা কি? ওটা কি, বলো, কি ওটা?"—বিশপ ব'লছিলেন। কিন্তু এবারে তিনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। এ যে সন্ন্যাসীরাই সমুদ্রের উপর দিয়ে দৌড়ে আসছে! তাদের ধূসর দাড়ি শুভ্র-উজ্জ্বল দেখাচ্ছে; সোজা এগিয়ে আসছে তারা এই জাহাজের কাছেই—এটা যেনো স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে।

হালের লোকটা তাকিয়ে দেখলো। ভয়-বিমূঢ়ের মতো সে হালটা ছেড়ে দিয়ে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লো:

"এ কি! সন্ন্যাসীরা সমুদ্রের উপর দিয়েই ছুটে আসছে,—সবি যেনো শুকনো মাটি!"

এ শুনে সকলে লাফ দিয়ে ছুটে এলো জাহাজের পেছন দিকে। সবাই দেখতে পেলো যে সন্ন্যাসীরা হাতে হাত ধ'রে দৌড়ে আসছে। সমুখের জনতা হাত বাড়িয়ে আছে। তিনজনে জলের উপর দিয়ে চ'লে এলেন।—পায়ের নীচে যেনো শুকনো মাটি; আর তাদের কারো পা-ই একটুও নড়ছিলো না!

সন্ন্যাসীরা পৌঁছে যাবার আগে জাহাজটাকে কোনো দিকে নিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। তারা জাহাজের ডেকে উঠে এসে, মাথা তুলে তিন জনেই সমস্বরে ব'ললেন:

"হে ভগবানের সেবক! ভুলে গেছি আমরা, যা শিখিয়েছিলেন, সব ভুলে গেছি। যখন শিখলাম, তখন মনে ছিলো; কিন্তু ঘণ্টাখানেক চুপ ক'রে থাকার পরে আবৃত্তি করতে গিয়ে দেখি, একটা শব্দও মনে নেই; ভুলে গেছি; সবি হারিয়ে গেছে। একটা কথাও মনে নেই এখন! আবার আমাদের শিখিয়ে দিন।"

বিশপ নিজের উপরে ক্রুশ-চিহ্ন বুলিয়ে সন্ন্যাসীদের কাছে মাথা নীচু ক'রলেন

এবং বললেন :—“হে ঋষিগণ, আপনাদের প্রার্থনা ভগবান অনেক আগেই গ্রহণ ক'রেছেন। আপনাদের শেখাতে পারি—এমন শক্তি আমার নেই। আমাদের—এই পাপীদের জন্যই প্রার্থনা করুন।”

সংগে সংগেই বিশপ সেই ঋষিদের পায়ে মাথা নোয়ালেন। ঋষিরা নীরব হ'য়ে রইলেন এবং সমুদ্রের উপর দিয়ে ফিরে চ'লে গেলেন। পরদিন ভোরে দেখা গেলো,—ঋষিরা জাহাজের তক্তার উপর যেখানে পা রেখেছিলেন—সেখানটা উজ্জ্বল হ'য়ে আছে !

এ্যাণ্টন প্যাভলোভিচ শেখভ

(১৮৬০—১৯০৪)

আজব সাগরের তীরে টাগানরগে লেখকের জন্ম; পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী। শেখভের প্রথম শিক্ষা হয়েছে নিজ জিলা সহরের শিক্ষায়তনে, পরে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে। লেখক এম-ডি উপাধি লাভ করেন কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসা করেন না;—একবার মাত্র (১৮৯২—৯৩) ভয়ংকর কলেরা প্রকোপের সময় চিকিৎসা বিভাগে কাজ ক'রেছিলেন।

ছাত্র অবস্থায়ই ইনি সাহিত্যজীবন সুরু করেন এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তার প্রথম বয়সের গল্পগুলি প্রকাশিত হ'লে খ্যাতি হয় যথেষ্ট।

১৮৯৮ থেকে মস্কো থিয়েটারের সংগে সসম্মানে সংযুক্ত থাকেন। প্রসংগত রচনা;—"আংকল ভানিয়া," "থ্রি সিষ্টারস্," "চেরি অর্চারড্"। শেষোক্তটি একটি বিখ্যাত রূপকনাট্য।

লেখকের প্রথম বিখ্যাত গল্প—কোরাস গার্ল (১৮৮৪)। এঁর রচিত গল্প-সংগ্রহ বিরাট ও ব্যাপক। ডার্লিং, স্কুল মাষ্টার, স্কুল মিষ্ট্রেস, নাইটমেয়ার, ডুয়েল, বিশপ, পার্টি, হ্যাপিনেস্,……এঁর বিখ্যাত গল্প সংখ্যায়ও অনেক। অন্তত বিশখানাই আছে এঁর গল্পের বই—জীবনের বিচিত্র মুহূর্ত ও বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে।

স্বচ্ছ সচ্ছল সংযত এঁর গল্প রচনা। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ব্যক্তি গৌণ,—যে কোনো নারী বা পুরুষের আশ্রয়েই হ'ক না চরিত্রই মূল কথা। জীবনের একটি বিশিষ্ট 'মুড্'-ই এঁর গল্পের কেন্দ্রমূল—অবস্থা বৈগুণ্যে বিচিত্র অনুভূতির আবেশে প্রকাশিত হ'য়ে ওঠে মাত্র। শেখভের সহানুভূতি বরাবরই উৎপীড়িত দীন দুর্বলের উপর—তাদেরই তিনি সকলের চেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ক'রে দেখেছেন ও এঁকেছেন।

শেখভের বিশিষ্ট উপন্যাস "আমার জীবন"—এঁর সক্রিয় জীবন দর্শনের সবল সুন্দর উদাহরণ.—চমৎকার বই।

রাশিয়ার বাইরে শেখভের গল্প স্বদেশের চেয়েও সবিশেষ জনপ্রিয় এবং পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক হিসেবেই ইনি বিখ্যাত।

শিক্ষয়িত্রী

সাড়ে আটটার সময় তারা গাড়ী ক'রে রওনা হ'লো সহরের বাইরে।

বড় রাস্তা বেশ শুকনোই; নতুন বসন্তের মিষ্টি রোদে চারদিক উজ্জ্বল, এখনো তবু ডোবার মধ্যে ও বনে-প্রান্তরে বরফ জ'মে আছে। আলোহীন বিশ্রী শীত এবার শেষ হ'য়ে এসেছে,—সাথে সাথেই বসন্তের আকস্মিক আবির্ভাব। চারিদিকেই আদরের মতো আতপ্ত আলো আর বসন্তের সুরভি নিশ্বাস-লাগা স্বচ্ছ-কোমল বনশ্রী। লেকের মতো বড়ো হ'য়েছে কূল-ছাপানো ডোবাগুলি, তারি উপর দিয়ে দল বেঁধে উড়ে আসছে কালো কালো পাখী; দিগন্তে এলিয়ে পড়েছে নীলিমাময় অসীম আকাশ—খুসীর ডানা মেলে সেখানে মিলিয়ে যেতে সাধ জাগে!

কিন্তু এর কিছুই মেরিয়া ভেসিলিভানার কাছে একটুও নতুন বা উৎসাহজনক মনে হ'লো না। গাড়ীতে সে ব'সেই আছে শুধু। এই তের বছর পর্যন্ত সে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজ ক'রছে,—মনে ক'রেও আনতে পাচ্ছে না যে এই ক' বছরের মধ্যে কতোবার যে তাকে মাইনের জন্য সহরে ছুটতে হ'য়েছে। তখন আজকের মতো নববসন্ত, না শরতের এক বর্ষা-ভিজা সন্ধ্যা, না শীতকাল—তার কাছে সবই সমান। প্রত্যেক বারেই তার কেবল মাত্র একটি প্রতীক্ষা—কখন গিয়ে পথের শেষে পৌছবে। মনে হ'লো সে যে কতো বছর থেকে,—যুগ যুগ ধ'রেই যেনো সে এখানে এই গাঁয়ে থেকে এসেছে! সহর থেকে স্কুলপথের প্রত্যেকটি পাথরের টুকরো, গাছপালা সবই তার চেনা। তার অতীত এখানে, বর্তমান এখানে,—আর তার ভবিষ্যতও যে স্কুল ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে তা তার ধারণায়ই এলো না। সহরের রাস্তা, আবার ফিরে আসা, আবার স্কুল, আবার সেই

স্কুল-শিক্ষয়িত্রী হবার আগে থেকেই সে পেছন দিনের কথা ভাবা ছেড়ে দিয়েছে, প্রায় ভুলেই গেছে। একদিন তার বাবা ছিলো, মা ছিলো,—সবাই তারা মস্কোতে "রেড্-গেটের"

কাছে একটা ফ্লাটে থাকতো। সেই জীবনের সব মিলে স্মরণের কোণায় অস্পষ্ট স্বপ্ন-কুয়াশার মতো একটু স্মৃতি শুধু জেগে আছে। বাবা মারা গেছে যখন তার দশ বছর, তার মাও তার পরেই·········

একজন ভাই ছিলো,—অফিসার। প্রথম দিকে দুজন তারা এ-ওর কাছে রীতিমত লিখতো; তারপর, তার ভাই চিঠির উত্তর দেওয়া ছেড়ে দিলো, কাগজ-কলমের ধারও আর ধারলো না। পুরোনো স্মৃতির মধ্যে তখনও ছিলো শুধু মাত্র মার একটা ছবি,—চুল ও চোখের ভুরুটুকু ছাড়া কিছুই এখন আর চেনা যায় না।

········ কয়েক মাইল এগোবার পর গাড়ীর সহিস বুড়ো সাইমন মাথা ঘুরিয়ে বললো—

"জানেন, সহরে একজন সরকারী কেরানীকে ধ'রে নিয়ে গেছে। ঘটনাটা হ'লো; কয়েকজন জার্মানকে নিয়ে সে মস্কোর মেয়র লিনিয়েভ-কে খুন ক'রেছে।"

"কে ব'ললে তোমাকে?"

"আইভান আইওনভ-এর রেস্তোরাঁয় কারা পত্রিকা পড়ছিলো।"

তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ ক'রে রইলো তারা। মেরিয়া ভেসিলিভানা ভাবছিলো তার স্কুলের কথা,—পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে, এবারে পাঠাতে হবে একটি মেয়ে ও চারিটি ছেলেকে। পরীক্ষার বিষয় চিন্তা কচ্ছিলো সে, এবং ঠিক তখনি হ্যানভ, তার প্রতিবেশী জমিদার, একটা চারঘোড়ার গাড়ীতে ক'রে তাদের কাছে এসে প'ড়লেন। এই ভদ্রলোকই গেলো-বছরে তার স্কুলের পরীক্ষক ছিলেন। কাছাকাছি এসেই তিনি মেয়েটিকে চিনতে পেরে নমস্কার জানালেন—"ভালো তো? বাড়ীর দিকে যাচ্ছেন বোধ হয়?"

এই হ্যানভ, চল্লিশ বছর বয়স, দেহময় একটা নির্জীব ভাব ও ক্লান্তির ছাপ,—বুড়িয়ে এসেছেন, কিন্তু তখনও তাঁকে সুন্দর দেখাচ্ছিলো, মেয়েদেরও নজর দেবার মতো! তাঁর বিরাট বাড়ীতে একা থাকেন তিনি, কাজকর্ম করেন না কোনো, এবং লোকে বলে যে বাড়ীতে ব'সে শুধু ঘরের মধ্যে শিস্ দিয়ে দিয়ে এদিক ওদিক পায়চারি ক'রে বেড়ান ও বুড়ো চাকরটার সংগে দাবা খেলেন; এই মাত্র, আর কিছুই করেন না। দুষ্ট লোকে আরও বলে,—খুব মদও নাকি চলে তাঁর। আর, সত্য সত্যই আগের বছরে তাঁর সংগে

নিয়ে-আসা সেই পরীক্ষার খাতাগুলিতে পর্যন্ত মদের গন্ধ ভুর ভুর কচ্ছিলো। সেই দিন তিনি আগাগোড়া সিল্কের পোষাক পরে এসেছিলেন এবং মেরিয়ার চোখে তাকে খুব সুন্দর লেগেছিলো! তার পাশে ব'সে সবটুকু সময় নিজেকে তার কেমন যেনো আচ্ছন্নের মতো মনে হ'য়েছিলো। স্কুলে বরাবর সে গম্ভীর মেজাজী, কড়া-প্রকৃতির পরীক্ষক দেখতেই অভ্যস্ত হ'য়ে এসেছে; অথচ এই লোকটি ভুলেও গির্জামুখো হন না, পরীক্ষায় প্রশ্নের বিষয় কি তাও জানেন না; নিজে তিনি অত্যন্ত ভদ্র, উদার,—প্রাণ ভ'রে শুধু খাতায় নম্বর দেন।

"ব্যাকৃভিষ্টের সংগে একটু দেখা ক'রতে যাচ্ছি!"—মেরিয়া ভেসিলিভানার কাছে ব'ললেন তিনি,—"কিন্তু শুনেছি, আজ তিনি বাড়ী নেই।"

বড় রাস্তার একটা ডাল ধরে তারা গ্রামের দিকে মোড় নিলো,—হ্যানভ আগে আগে, সাইমন তাকে অনুসরণ ক'রে চলছে। চার-ঘোড়ার ভারী গাড়ী কাদার মধ্য দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে এগোচ্ছিলো পায়-হাঁটা গতিতে। রাস্তার কিনারা দিয়ে এদিক ওদিক ক'রে চলছিলো সাইমন,—কখনো তুষার বাঁধের পথে, কখনো বা ডোবার উপর দিয়ে এবং বার বার গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নেবে ঘোড়াটাকে ঠিক ক'রে নিচ্ছিলো। মেরিয়া ভেসিলিভানা তখনো ভেবে চ'লেছে সেই এক স্কুলের কথাই: বুঝে উঠতে পাচ্ছিলো না সে অংকের প্রশ্ন এবার আরো কঠিন হবে, না সহজ হবে। গতকাল সে জেলাবোর্ডে এসে কাউকেই দেখতে পায়নি! কি বিরক্তির ব্যাপার! কিরকম দায়িত্বহীন! পাহারাওয়ালাকে বরখাস্ত করার জন্য এই গত দুবছর থেকে সে ব'লে আসছে; কোনো কাজেই আসেনা লোকটা, তার সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করে এবং স্কুলের ছেলেমেয়েদের ধ'রে মারধর করে।—কিন্তু কিন্তু সেদিকটায় খেয়াল ক'রলো একবার? অফিসঘরে প্রেসিডেণ্টকে খুঁজে পাওয়া ভাগ্যের কথা। আর, কেউ যদি তাকে খুঁজে পায়ও বা,—করুণ চোখে তিনি কায়দা ক'রেই ব'লবেন যে একটু সময়ও ছাড়া পান না। তিন বছরে একবার যদি ইনস্পেক্টর স্কুল দেখতে আসেন তো সেই সাত-জন্মের পুণ্যফল! তার এই কাজের বিষয় তিনি মাথামুণ্ড কিছুই বোঝেন না। পেছনে কারণও আছে,—এর আগে ছিলেন আবগারী বিভাগে এবং মামার জোরেই শুধু একাজ বাগিয়ে নিয়েছেন। স্কুল-পরিষদ একটা বসেনা বড়ো, কোথায় যে বসে তারো ঠিকঠিকানা

নেই! স্কুলের কর্তা প্রায়-নিরক্ষর এক কৃষক,—সে আবার পাহারওয়ালার একজন অন্তরংগ।—মা বিদ্যাদেবীই জানেন কার কাছে অভাব-অভিযোগ নিয়ে এগোবে সে!

"সত্যিই, ভদ্রলোক দেখতে বেশ!"—হ্যানভের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি ভাবছিলো।

পথ ক্রমেই অসম্ভব রকম কদর্য হ'য়ে দাঁড়ালো।......বনের মধ্য দিয়ে গাড়ী চ'লেছে এবার, এখানে আর ঘুরিয়ে নেবারো জায়গা নেই; চাকাগুলি কাদার মধ্যে ব'সে গেছে, সেখান থেকে জলের ফেনিল ঝাপটা আসছিলো; মুখের উপর সূক্ষ্ম সরু সরু ডালের আঘাত এসে লাগছিলো বারবার।

"ইস্, কী বিশ্রী রাস্তা!"—হ্যানভ বলছিলো আর হাসছিলো।

শিক্ষয়িত্রী মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে রইলো: এই বিচিত্র লোকটি এখানে আছেন কেনো সে বুঝে উঠ্তে পাচ্ছিলো না। এখানে এই কাদাজলের মধ্যে, ঈশ্বর-ত্যাজ্য এই ধূসর দেশে ব'সে তাঁর ঐ প্রচুর অর্থ, তাঁর ঐ সুন্দর চেহারা ও মার্জিত রূপ দিয়ে হয় কি? জীবন থেকে পাননা তিনি কোনো বিশিষ্ট সুযোগ সুবিধে; এবং এখানে এই সাংঘাতিক রাস্তায় সাইমনের মতোই তিনি ঢিমে-তেতালায় গাড়ী চালাচ্ছেন, সমানে ভোগ ক'রে চলেছেন যতো সব অসুবিধে! পিটার্সবার্গে বা বাইরে কোথাও যদি থাকার সুবিধে আছে তবে এখানে থাকা কেনো? এবং যে কোনো লোকেরই মনে উঠ্বে একথাটা যে,—এই দুর্ভোগ না ক'রতে চাইলে—তার সহিস ও সাইমনের মুখের এই হতাশার ভাব চোখ মেলে সত্যিই না দেখতে চাইলে—তার মতো একজন বড়োলোক তো ইচ্ছে ক'রলেই এই খারাপ রাস্তার যায়গায় একটা ভালো রাস্তা ক'রে দিতে পারেন; কিন্তু তিনি হাসছেন শুধু! দৃশ্যতই কিছু লাগেনি তাঁর, আরো ভালো জীবনে বাঁচবার ইচ্ছাই নেই তাঁর। লোকটি দয়ালু, কোমল-সরল,—তাঁর এই স্থূল জীবনটাকে তিনি বোঝেনই না,—পরীক্ষা ব্যাপারে যেমন প্রার্থনার যোগ বোঝেন না! স্কুলের জন্য তিনি একমাত্র গ্লোভ ছাড়া আর কিছুই দান করেন না এবং নিজেকে শিক্ষা-বিস্তার ব্যাপারে সত্য সত্যই একজন দরকারী লোক এবং বিশিষ্ট কর্মী ব'লে বিশ্বাস করেন। আর তাঁর গ্লোভ লাগে কোন কাজে?

"ঠিক হ'য়ে বসো"—সাইমন বললো। গাড়ীটা ভয়ানক রকম ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে দুলছিলো, প্রায় উল্টে যায় যায়! মেরিয়া ভেসিলিভানার পায়ের কাছে কিছু একটা

গড়িয়ে এলো—তার কেনা জিনিষের মোড়কটা! কাদার মধ্য দিয়ে খাড়া পথ সোজা উঠে গেছে পাহাড়ের উপর: এখানে বাঁকাচোরা পরিখার মধ্যে ঝর্ণা-স্রোতগুলি হ'য়ে উঠেছে ঘূর্ণী ফেনিল,—রাস্তাটাকে যেনো গ্রাস ক'রে নিয়ে চলেছে। এখানটা কী ক'রে পেরোনো যাবে? ঘন ঘন হাঁপাচ্ছিলো ঘোড়াগুলি। তার লম্বা ওভারকোট গায়ে হ্যানভ রাস্তার পাশে হাঁটতে লাগলেন, ঘামিয়ে গেছেন তিনি।

"ইস্, কী রাস্তার ছিরি!"—বলছিলেন আর হাসছিলেন,—"কারো গাড়ী একেবারে জন্মের মতোই খতম্ ক'রে দেওয়ার মতো।"

"এমন দুর্যোগে বেরিয়ে পড়তে বলেনি কেউ"—সাইমন একটু বাঁকা ক'রেই ব'ললো, "বাড়ীতে ব'সে থাকলেই হ'তো!"

"গাড়ীতে বড়ো একঘেয়ে লাগে, বুড়ো! ব'সে থাকা ভালো লাগে না।"

বুড়ো সাইমনের পাশে তাঁকে দেখাচ্ছিলো বেশ তরুণ সুন্দর; তবু তার চলার ভংগীর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিলো,—যাতে তার অন্তর্নিহিত জীর্ণশীর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখ জীবনী-শক্তির স্বরূপ ধরা প'ড়ে যাচ্ছিলো। তখন হঠাৎ একটা হাওয়ার ঝাপটা বনের মধ্য দিয়ে ব'য়ে গেলো, এবং কীজানি কেনো এই লোকটির জন্য মেরিয়া ভেসিলিভানার দুঃখ ও আশংকা জেগে উঠ্লো: কোনো বিশেষ কারণ বা যুক্তি নেই, অথচ সে যেনো শেষ হ'তে চ'লেছে! মেরিয়ার মনে হ'লো, সে নিজে যদি তাঁর স্ত্রী বা বোনও হ'তো তাহ'লে তাকে এই ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে নিজের জীবন দিয়ে প'ড়ে থাকতো।

তার স্ত্রী! দুনিয়ার এমনি বিচিত্র বাঁধা নিয়ম যে এখানে হ্যানভ থাকেন তার বিরাট বাড়ীতে একেলা,—আর সে নিজে নিঃসংগ-নির্বাসিত এক গাঁয়ে; কিন্তু তবু তারা দুজনে যে কাছাকাছি এবং সসম্মানে পাশাপাশি ঘনিয়ে আসবে—কী জানি কোনো এমন ভাবনা পর্যন্ত অসম্ভব একটা ব্যাপার,—বাতুলতাই মাত্র। বস্তুত, জীবন এমন ভাবে গড়া, মানুষে মানুষে সম্বন্ধ এতো জটিল-প্যাঁচালো যে তার একটু কোনের অর্থ পর্যন্ত বুঝে ওঠা ভার। কেউ যখন এনিয়ে ভাবে কেমন যেনো বিষন্ন রহস্যের মধ্যে ডুবে গিয়ে মন একেবারে খারাপ হ'য়ে যায়।

সে ভাবতে লাগলো :—"আর, এটা কোনো রকমেই ভেবে পাইনা, দুর্বল দুর্ভাগা অকেজো লোকদের ভগবান কেনো এমন রূপ, এমন কোমলতা, এমন ব্যথা ভরা নরম চোখ দেন—তারা এতো সুন্দর হয় কেনো ?"

"আমাকে এবার ডানদিকে মোড় নিতে হবে"—হ্যানভ তার গাড়ীতে উঠে ব'ললো—"নমস্কার !"

সে আবার তার ছাত্রছাত্রীদের ভাবনা নিয়ে ব'সলো—পরীক্ষার কথা, পাহারাওয়ালা, স্কুল-পরিষদ ; এবং বাতাসে দূর-ধাবন্ত গাড়ীর শব্দ কানে আসার সংগে সংগে এ ভাবনার মধ্যে আরো অনেক ভাবনা ভিড় ক'রে এসে ঘিড়ে দাঁড়ালো। তৃষিতের মতো সে আবার ভাবতে লাগলো : সেই সুন্দর চোখ, ভালোবাসা আর সুখ—জীবনেও যা কোনদিন আর...... ..

তাঁর স্ত্রী ? সে কী ঠাণ্ডা ভোর, উনুন ধরানোর কেউ নেই, পাহারাওয়ালা উধাও হ'য়েছে। আলো ফুটতেই ছেলেরা কাদা আর তুষার নিয়ে সোরগোল ক'রতে ক'রতে এসে জুটেছে। কোনোদিকেই এতোটুকু সুবিধে, এতোটুকু শান্তি নেই ! ছোট্ট একটি ঘর তার থাকবার যায়গা, পাশেই লাগানো রান্নার ঘর। প্রত্যেক দিনই কাজের পরে মাথা কামড়ায়, খাবার পরে বুক জ্বালা করে। স্কুলে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কাঠ ও পাহারাওয়ালার বাবদ পয়সা জোগাড় করা, তারপর স্কুলের কর্তার কাছে পৌছিয়ে দিয়ে, তারি কাছে ভগবানের নাম ক'রে আবার অনুনয় বিনয় ক'রতে হয় সেই দামের কাঠই পাঠিয়ে দেবার জন্য,—সেই ভুঁড়ি-ওয়ালা জঘন্য লোকটার কাছে ! আর সমস্ত রাত ভরে স্বপ্নদেখা : পরীক্ষা, কৃষকদের কথা, বরফের স্তূপ ··এই এমন ধারা জীবনই তাকে বুড়িয়ে এনেছে, স্থূল ক'রে দিয়েছে, কদাকার, কাঠ—কাঠ, বিশ্রী,—যেনো সে কাঠেরি তৈরী। সব সময়েই তার ভয় ভয় !

জিলাবোর্ডের কোনো সভ্য বা স্কুলের কর্তার সামনে সে তার আসন থেকে দাঁড়িয়ে উঠে ফিরে আর বসার সাহস পায় না ! তাঁদের কারোর নাম উল্লেখের সময় সে নিয়ম-মাফিক সম্মান দেখিয়ে তবে কথা বলে। কেউই তাকে সুন্দর দেখে না। ধূসর মরু পথে যেনো তার নির্জীব ভগ্ন জীবন একেলা গড়িয়ে চ'লেছে, সেখানে কোনো বন্ধুর সবুজ উৎসাহ

বা পরিচিত জনের বিচিত্র ভিড় নেই। তার এই অবস্থায় সে যদি কাউকে ভালোবেসে ব'সতো, তাহ'লে—তাহ'লে যে কী ভয়ানক হ'তো!

"ভেসেলিভানা, ঠিক হ'য়ে ব'সো।"

আবার সোজা খাড়া পাহাড়ী পথ.........

ঠেকায় পড়েই সে স্কুল-শিক্ষয়িত্রী হ'য়েছে। এটাই জীবনের পথ ব'লে তার আগ্রহ ছিলোনা কোনো। কোনোদিন সে যে চাকরী ক'রবে, শিক্ষার সেবায় লাগবে তা ভাবেও নি। সব সময়েই তার মনে হয়, তার কাজের মধ্যে সবচেয়ে জরুরী বিষয় হচ্ছে,—ছেলেরা নয়, শিক্ষা-সংস্কৃতিও নয়,—পরীক্ষা, শুধু পরীক্ষা। তা ছাড়া, নিজের জীবন-পথের কথা, শিক্ষা-সংস্কৃতির ভাবনার বা সে কোন সময়টা পেয়েছে? যতো সব শিক্ষক, কম-ভিজিট-দেওয়া ডাক্তার ও তাদের সহকারীরা কঠিন কাজের বিষম ভারে বিপর্যস্ত, তারা যে একটা ভাব-আদর্শ বা জনগণের সেবা উদযাপন করছে—এই ভাবনাটুকুর সান্ত্বনা পাবারো তাদের পথ নেই;—সব সময়েই তাদের মাথার মধ্যে ভিড় ক'রে ঘুরছে নিত্যকার অন্নচিন্তা, রান্নার কাঠ, কদর্য রাস্তা ও রোগ-পীড়া। বৈচিত্রহীন হাড়-ভাঙ্গা জীবন! শুধু মেরিয়ার মতো ধৈর্য-ধরা ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়াগুলিই এমন ক'রে চালাতে পারে এতোদিন; প্রাণবন্ত ঝোঁকমুখী ও সাহসী লোকেরা জীবনের একটা উদ্দেশ্যপথ ও ভাবাদর্শের কথা ব'লে সত্য, কিন্তু শিগগিরি ক্লান্তবিরক্ত হ'য়ে কাজ ছেড়ে দেয়।

সাইমন সোজা সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নিয়েছে! প্রথমে মাঠ ধ'রে, তারপরে পল্লীকুটিরগুলির পিছন দিয়ে; কিন্তু এক জায়গা দিয়ে কৃষকেরা যেতে দেবেনা তাদের, কোথাও বা সেটা পুরুতের জমি,—কাজেই পেরিয়ে যাওয়াটি চলবেনা, কোথাও বা আইভান আইওনভ জমিদারের কাছ থেকে একটা জায়গা কিনে চারপাশে ডোবা কেটে রেখেছে;—কাজেই তাদের একটু পিছু হ'টে যেতে হবে।

এবার তারা নিঝ্নি গোরোভিচ-এ এসে পৌছলো। রেস্তোরাঁর কাছে এখনো বরফ জমানো, গোবর-বিক্ষিপ্ত মাটির উপর কয়েকটা মাল-গাড়ী দাঁড়িয়ে, কড়ারকম বাক্সে মদের বড়ো বড়ো বোতল এসেছে ওতে। রেস্তোরাঁয় অনেক লোকের ভিড়, সকলেই ড্রাইভার। সেখানে ভোদ্‌কা, তামাক ও মাংসের কী উগ্র গন্ধ! জোর-কথার

সোরগোল শোনা যাচ্ছিলো এবং দুয়ারের অনবরত কঁ্যাচ কঁ্যাচ। দেয়ালের ওদিক থেকে অবিরাম কনসার্ট বাজনার শব্দ। মেরিয়া ভেসিলিভানা ব'সে নিয়ে চা খেলো কিছুটা; তার পাশের টেবলেই কিষাণেরা ভোদকা ও বিয়ারে মত্ত। গরম গরম খেয়ে রেস্তোরাঁর দুর্গন্ধ ধোঁয়ায় সবাই তারা ঘামছিলো। "এই শোন, কাজ্‌মা!"—নানা গলার হট্টগোল। "ওখানে ওটা কি?" "ভগবান, রক্ষা করো!" "আইভান ডিমিট্রিচ তোমাকে ব'লছিলো যে—" "ঐ ছাখ, বুড়ো!"

খর্বাকার ও দাগভরা একটা লোক, কালো দাড়ি তার, মদে সে একেবারে বুঁদ। হঠাৎ কিছু একটা দেখে যেনো সে লাফ দিয়ে উঠ্‌লো ও যা তা বকতে সুরু ক'রে দিলো।

"যা খুসী চিল্লাচ্ছে! কে লোকটা ওখানে!"—চ'টে উঠ্‌লো সাইমন, কিছু দূরে সে ব'সে ছিলো,—"এই তরুণী মহিলাকে চোখে দেখছো না!

"তরুণী!"—কে যোনো আর এক কোণ থেকে কথা কাট্‌লো। "ডানাকাটা পরী!"

"কিছু মনে ক'রে বলিনি, ক্ষমা ক'রবেন।"—বেঁটে লোকটি বিব্রত হ'য়ে বললো—"আমাদের দাম আমরা যেমন দিচ্ছি, তেমনি উনিও ওঁর নিজেরটা দিছেন। নমস্কার!"

"নমস্কার!"—স্কুল শিক্ষয়ত্রীও নমস্কার জানালো।

"আপনাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

মেরিয়া ভেসিলিভানা চা খেয়ে নিলো খুসী মনে,—সেও তখন লাল হ'য়ে ঘামছে কিষাণদের মতোই! ফিরে আবার সে ভাবতে লেগে গেলো রান্নার কাঠ, পাহারা-ওয়ালা……"থামো, বুড়ো"—কাছের টেব্‌ল থেকে কে যেনো ব'লছে,—"এ হ'চ্ছে ভিয়াজভ স্কুলের শিক্ষয়ত্রী……আমাদের চেনা, মহিলাটি মানুষ ভালো।"

স্বত-বন্ধ দরজায় অনবরত কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ শব্দ: কেউ আসছে, কেউ বা বেরিয়ে যাচ্ছে। মেরিয়া ভেসিলিভানা ব'সে ব'সে সেই একই কথা ভেবে চ'লেছে আর ওদিকেও কনসার্ট বাজনা বেজে চ'লছে একঘেয়ে। মেজেতে এসে পড়েছে ফালি ফালি রোদ। দাম চুকিয়ে এবারে তারা দেয়ালের পাশ ঘুরে বেরিয়ে চ'লে গেলো। সূর্য দেখে মনে হয় দুপুর চ'লে প'ড়েছে; পাশের টেবলের কিষাণেরাও যাবার জন্য তৈরী হ'চ্ছিলো। বেঁটে লোকটি অপ্রকৃতিস্থ ভাবে মেরিয়া ভেসিলিভানার কাছে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলো, তার

দেখাদেখি আর সকলেও। একটির পর একটি লোক চ'লে গেলো; ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ক'রে নয়বার বাড়ি খোলা দরজাটা।

"ভেসিলিভানা তৈরী হ'য়ে নাও!—ডেকে বললো সাইমন। আবার রওনা হ'লো তারা,—আবার সেই পায়-হাঁটা গতি!

"এই কিছুদিন আগে এখানে নিঝ্‌নি গোরোভিচে একটা স্কুল হ'য়েছে"—সাইমন ঘুরে নিয়ে ব'লছিলো,—"সে হ'য়েছে একটা নচ্ছার কারবার!"

"কেনো?"

"লোকে বলে, প্রেসিডেণ্ট মেরেছে এক হাজার, স্কুলের কর্তা এক হাজার, আর শিক্ষক-মশাইরা পাঁচশ।"

"সমস্ত স্কুলেই তো লেগেছে এক হাজার। কাজেই, দেখো বুড়ো, লোককে এমনিধারা গাল দেওয়া অন্যায়। এর কোনো মানে হয় না।"

"তা আমি কি জানি! লোকে যা বলে তাই বলছি তো!"

কিন্তু এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিলো যে সাইমন শিক্ষয়ত্রীর কথা বিশ্বাস করেনি। কিষাণরাও তার কথা বিশ্বাস করে না। সব সময়েই তাদের ধারণা, বড়ো বেশী টাকা পায় সে,—মাসে একুশ রুবল (পাঁচ রুব্‌লই তো যথেষ্ট!)। উপরন্তু, স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে রান্নার কাঠ ও পাহারাওয়ালার বাবদ যে টাকা আদায় হয় তার মোটাটাই যায় নিজের পকেটে। স্কুল-কর্তারো ঠিক ঐ কিষাণদের মতোই ধারণা। অথচ, সে নিজেই কিন্তু রান্নার কাঠ থেকে কিছুটা ফাঁক মারে এবং কর্তা বা অভিভাবক হওয়ার জন্য কিষাণদের কাছ থেকে টাকা নেয়,—স্কুল কর্তৃপক্ষ জানতেও পায় না।

বাঁচা গেলো! বন এবারে তারা পিছনে ফেলে এসেছে, ভিয়াজভ পর্যন্তই এখন ফাঁকা সমতল; পথও আর বেশী নেই! এখানে তাদের নদী পার হ'তে হবে, পরে রেল লাইন, তার পরেই ভিয়াজভ সামনে দেখা যাবে।

"এ কোন দিকে যাচ্ছো?"—মেরিয়া ভেসিলিভানা সাইমনকে জিজ্ঞেস ক'রলো,—"ডান দিকে পুলের রাস্তা ধরো।"

"কেনো, এপথ দিয়েও তো বেশ যাওয়া যাবে, ভাববার মতো গভীর কিছু নয় এটা!"

"সাবধান, ঘোড়া ডুবিয়ে দিওনা যেনো!"

"কি?"

"ঐ দেখো, পুলের দিকে আসছেন হ্যানভ"—ডানদিকে অনেক দূরে চার ঘোড়ার গাড়িটা দেখে বললো মেরিয়া,—"ঠিক সে-ই ব'লে মনে হ'চ্ছে।"

"হ্যাঁ, সে-ই! তাহ'লে ব্যাকৃভিষ্টকে গিয়ে বাড়ী পায়নি। কী মাথা খারাপ লোকই! হা ভগবান! সে যে ওদিকে গাড়ী ছুটিয়ে গেলো; কিন্তু কি জন্য? পুরো দুমাইলই কাছে হবে এই পথে।"

নদীতে এসে পৌছলো তারা। গ্রীষ্মের দিনে এটা এমন সরু স্রোত হ'য়ে দাঁড়ায় যে হেঁটেই পার হওয়া যায়। আগষ্টে একেবারে তলা-শুকনো হ'য়ে থাকে। কিন্তু এখন, বসন্তের বন্যার পরেই একটা নদীই হ'য়ে পড়েছে: ত্রিশ হাত পাশে, ক্ষিপ্র ঘোলাটে, আর ঠাণ্ডা-হিম। তীর থেকে জলের কিনারা পর্যন্ত চাকার সদ্য-দাগ র'য়েছে,—তবে এ জায়গাটা দিয়েই পার হ'তে হয়।

"হাঁট্ হাঁট্"—খিট্‌খিটে ভাবে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো সাইমন, সাথে সাথেই লাগাম ধ'রে জোরে জোরে টান; পাখীর ডানার মতো দুই কনু ঝাপটিয়ে আবার ব'ললো—"হাঁট, হাঁট!"

ঘোড়াটা পেট-জলে গিয়ে থেমে পড়লো কিন্তু তখনি আবার কষ্টেস্‌ষ্টে চ'লতে লাগলো। মেরিয়া ভেসিলিভানার পায়ের তলায় যেনো তীব্র ঠাণ্ডা-স্পর্শ লাগলো। "হাঁট, হাঁট—" সেও দাঁড়িয়ে প'ড়ে উঁচু গলায় ব'ললো—"হাঁট হাঁট।"

পারে গিয়ে উঠ্‌লো তারা।

"কি বিশ্রী ব্যাপার। ভগবান!"—সাইমন লাগাম ঠিক ক'রতে ক'রতে বিড় বিড় কচ্ছিলো—"এই জিলাবোর্ড গোল্লায় গেছে………"

মেরিয়ার জুতা-মোজা জলে ভ'রে গেছে, পোশাকের ও কোটের নীচের দিকটা ও জামার হাতের মাথাটা থেকেও টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ছে; মোড়কটার চিনি-ময়দা ভিজে গেছে,—সেই হ'য়েছে সবচেয়ে অসুবিধের কথা।

মেরিয়া শুধু হতাশ হ'য়ে হাত মোচড়াতে মোচড়াতে ব'ললো: "ওঃ সাইমন, সাইমন, সত্যি কী যে মানুষ তুমি!"

রেল লাইন-ক্রসিং-এর বাধা নেমে দাঁড়িয়ে আছে। ষ্টেশন থেকে গাড়ী ছেড়েছে একটা। মেরিয়া ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে গাড়ী চ'লে যাবার অপেক্ষা কচ্ছিলো, সমস্ত গা তার শীতে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। এবারে দেখা যাচ্ছে ভিন্নাজভ : ওই স্কুলের সবুজ ছাদটা, ক্রস-মাথায় গির্জা, ঝলসে উঠেছে অস্তসূর্যের আলোয়, ষ্টেশনের জানালাগুলিও ঝলমল ক'রছে, ইঞ্জিন থেকে নীলাভ ধুঁয়ো উড়ছে। মেরিয়ার মনে হ'লো, সব কিছুই শীতে কাঁপছে শুধু।

সামনেই ট্রেণ, কাচের জানালায় গির্জার ক্রুশের মতোই ঝলন্ত আলো। সেদিকে তাকিয়ে তার চোখ ব্যথা কচ্ছিলো। দুটি ফার্ষ্টক্লাস কামরার মধ্যে ছোট্ট একটি প্লাটফর্ম, একটি মহিলা সেখানে দাঁড়িয়ে। ট্রেণ যেতে যেতে মেরিয়া তাকে দেখছিলো। তার মা! ঠিক তার মতো! তার মায়েরও অমন সুন্দর মাথাভরা চুল ছিলো, ঠিক অম্‌নি ভুরুর টান, ঘাড়ের ভংগী। এবং তের বছরের মধ্যে এই-ই প্রথমবার···আশ্চর্য রকম স্পষ্ট হ'য়ে তার মার ছবি জেগে উঠ্‌লো। তার মা, বাবা, ভাই, মস্কোর ফ্লাটঘর, মাছ-রাখা ছোট্ট সেই কাচের পুকুরটা, সেদিনের প্রত্যেকটি ছোট্ট জিনিস পর্যন্ত! সে তার বাবার গলা শুনতে পেলো। যেনো সেদিনের মতোই ছোট্ট ফুটফুটে সে, চমৎকার সাজগোছ করা, তার সুন্দর ঘরটিতে নিজেদের সবাইর মাঝেই রয়েছে সে। সহসা আনন্দে ও সুখের একটা নিবিড় অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলো সে, উল্লাসে দুই হাত গালে চেপে ধ'রে মিনতির সুরে আস্তে আস্তে ডাক দিলো,—

"মা!"

আর সে কাঁদতে লাগলো, কেনো তা জানে না। ঠিক সেই সময়েই হ্যানভ তার চার-ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এদিকে এলেন। তাঁকে দেখে এতো সুখ লাগলো, সারা জীবনেও এমন আর কখনো কোনোদিন হয়নি। সে বন্ধুর মতোই পাশাপাশি আসন থেকে যেনো তাঁর দিকে মাথা হেলিয়ে একটু হাসলো। সংগে সংগেই মনে হ'লো, তার সুখ-সৌভাগ্য সোণালি আকাশে, দিকে দিকে, জানালায়, গাছে গাছে, উজ্জ্বল হ'য়ে হেসে উঠেছে! তার বাবা, তার মা মরেনি কেনোদিন, কোনও দিন সে শিক্ষয়িত্রী হয়নি,—সে একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন শুধু!—এবারে সে তা থেকে চিরদিনের মতোই জেগে উঠলো!·········

"ভেসিলিভানা ভিতরে যাও !"

আর, তক্ষনি সবকিছু মিলিয়ে গেলো কোথায় !

পথ-বন্ধটি উঠে গেলো ধীরে ধীরে। মেরিয়া ভেসিলিভানা কাঁপতে কাঁপতে অবশ দেহ নিয়ে গাড়ীর মধ্যে ব'সলো গিয়ে। সেই চার-ঘোড়ার গাড়ীটা পার হ'য়ে গেলো রেল-লাইন ; সাইমনও পিছু পিছু। সিগন্যালম্যান টুপি খুলে নিলো.........

"এই যে ! আমরা ভিয়াজভে এসে গেছি !"

দুঃস্বপ্ন

ইউনিয়ন বোর্ডের কায়েমী সদস্য কুনিন্ বছর ত্রিশের যুবক। পিটার্সবার্গ থেকে তার জেলা বরিসোভোতে পৌঁছেই তিনি সিংকিনোর ধর্মযাজক ইয়াকভ্ স্মিরনভের কাছে অশ্বারোহী দূত পাঠালেন।

ফাদার ইয়াকভ এসে উপস্থিত হ'লেন। কুনিন্ গেটে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে ব'ল্লেন, "আপনার সংগে দেখা হ'য়ে খুবই খুশী হ'য়েছি। এখানে থেকে কাজ কচ্ছি প্রায় এক বছর ; আরো আগেই যেনো আমাদের পরিচিত হওয়া উচিত ছিলো। সত্যিই, খুশী হয়েছি আমি। আপনি সানন্দে ভিতরে আস্তে পারেন। কিন্তু......আপনার বয়স তো খুবই কম মনে হ'চ্ছে,"—কুনিন্ বিস্ময় প্রকাশ করলেন,—"কতো হবে ?" "আটাশ..." ফাদার ইয়াকভ আলগোছে কুনিনের বাড়ানো হাতে চাপ দিয়ে ব'ল্লেন এবং সংগে সংগেই কোনো কারণে রাঙা হ'য়ে উঠ্লেন।

কুনিন্ তার আগন্তুক অতিথিকে প'ড়বার ঘরে নিয়ে গেলেন এবং তাকে আরো মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগ্লেন।

—"কেমন বিশ্রী মেয়েলি মুখ !"

ফাদার ইয়াকভের মুখে সত্যিই মেয়েলি অনেক কিছু আছে। উঁচু নাক, উজ্জ্বল লাল গাল, বড়ো বড়ো ধূসর-নীল চোখ, প্রায় অদৃশ্য রেখার মতো ভুরুর টান, লম্বা লাল চুল—

নরম-হাল্কা, কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে; তারপর, ওষ্ঠের উপরে সবেমাত্র গোঁফের রেখা প'ড়েছে, সত্যিকার একজন পুরুষের গোঁফের স্বচনা দেখা দিয়েছে মাত্র। আর, তার ছোট্ট দাড়ি কোনো-কর্মেরই নয়, গির্জার ছাত্রদের ভিতরে কোনো কারণে যাকে 'হাবার দাড়ি' বলা হ'য়ে থাকে। খুব অল্প-স্বল্প, একেবারে তল দেখা, ফাঁকা-ফাঁকা—আঁচড়ানো যায় না, চিম্‌টি কেটে ধরা যায় শুধু। দেহের এই সামান্য আয়োজনটুকুও সাত-পাঁচ গোছায়। ফাদার ইয়াকভ যেনো যাজক সাজ্‌বার সংকল্প ক'রে গাম দিয়ে দাঁড়ি লাগাতে গিয়ে মাঝপথে হঠাৎ বাধা পেয়েছেন। তার গায়ে একটা যাজকের পোশাক, উপরে ফিকে কফির দাগ, দুই কনুয়ের দিকেও বড়ো বড়ো দুটো দাগ-ধরা।

"রকমটি বেশ মজার তো!"—কাদা-মাখা পোশাক প্রান্তের দিকে তাকিয়ে কুনিন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—"ভদ্র লোকের ঘরে বোধহয় এবারই প্রথম এসেছে, ঠিক মতো সেজে আস্‌তেও জানে না!"

"বসুন, ফাদার!"—টেবিলের কাছে একটা আরাম কেদারা সরাতে সরাতে আতিথ্যের ভাবের চেয়ে বরং একটু হাল্কা ভাবেই তিনি আরম্ভ ক'র্‌লেন—"ব'সে নিন্‌।"

ফাদার ইয়াকভ মুঠোর মধ্যে কেশে চেয়ারের একেবারে কিনারায় কেমন বিশ্রীভাবে ব'সে পড়্‌লেন এবং খোলা দুহাত দুই হাঁটুর ওপরে রাখ্‌লেন। তার হ্রস্বদেহ, শুক্‌নো বুক, লাল ঘামানো মুখ—সমস্ত মিলে প্রথম হ'তেই তিনি কুনিনের অপ্রীতি জাগিয়ে তুলেছেন। কুনিন কোনো দিন ভাবতেও পারেন নি যে এমন মর্যাদাহীন দীন চেহারার কোনো ধর্মযাজক থাকৃতে পারে। ফাদার ইয়াকভের ভাবভংগীতে, তার হাঁটুর ওপরে হাত রাখায়, চেয়ারে এক কোনে সে যে বসে আছে তাতে পর্যন্ত তিনি মর্যাদার অভাব, এমন কি নীচতার স্পর্শ পর্যন্ত লক্ষ্য ক'রলেন।

"আপনাকে আমি কোনো কাজের প্রসংগে আহ্বান ক'রেছি, ফাদার!"—কুনিন্‌ নীচু চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন,—"আপনারি হাতের একটা দরকারী কাজে সানন্দে সাহায্য ক'রবো ব'লে ভার নিয়েছি আমি···পিটার্স্‌বার্গ থেকে এসে টেবিলের ওপরে দেখি মার্শাল নোবিলিটির একটা চিঠি: ইয়াগোর ডিমিট্রিভিচ্‌ জানিয়েছেন, সিংকিনোতে ফ্রি চার্চ-স্কুল খোলা হ'চ্ছে, তার দেখা শুনোর ভার যেনো আমিই নিই। ফাদার, আমি খুব

খুশী হ'য়েই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে·····আর, আমি এই প্রস্তাব খুব উৎসাহের সংগেই গ্রহণ কচ্ছি।"

কুনিন্ উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রতে লাগলেন।

"অবিশ্যি, ইয়াগোর ডিমিট্রিভিচ এবং সম্ভবত আপনিও জানেন যে আমার যথেষ্ট অর্থ নেই। বিষয়-সম্পত্তি মড়গেজে গেছে, জীবন-সদস্য হিসেবে যে মাইনে পাই, একমাত্র তাই দিয়েই আমি আছি। কাজেই, আপনারা খুব বেশী একটা কিছু সাহায্য পাওয়ার আশা করবেন না, কিন্তু, আমার সাধ্যে যেটুকু কুলোয়, তা আমি করবো··· তাহ'লে কবে পর্যন্ত স্কুল খুল্‌তে পারবেন ভাবছেন?"

"যখনি আমরা টাকা হাতে পাবো"—ফাদার ইয়াকভ বল্‌লেন।

"আপনাদের হাতে তো কিছু টাকা জমা আছেই?"

"নেই ব'ল্‌লেও চলে···কৃষাণরা একটা সভায় ঠিক ক'রলো যে তাঁরা প্রত্যেকটি লোকে বছরে তিন কপেক ক'রে দেবে, কিন্তু, জানেন তো, ঐ স্বীকৃতি পর্যন্তই; আর আমাদের প্রথম খোলার সময়ই দরকার কমপক্ষে দু'শ রুবল্।"

"আচ্ছা? কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমার হাতে এখন অতো টাকা নেই"—কুনিন্ দীর্ঘ-শ্বাস ফেল্‌লেন। "আমি বেড়াবার পথেই সবটা খরচ ক'রে ফেলেছি, উপরন্তু ধারও ক'রেছি। তাহ'লে? আসুন, দুজনে মিলে একবার ভেবে দেখি কোনো পথ করা যায় কিনা।"

কুনিন্ জোরে জোরে কথা ব'লেই উপায় ঠিক করতে লাগ্‌লেন। তিনি তার মতামত বুঝিয়ে বল্‌তে লাগলেন এবং সংগে সংগে ইয়াকভের মুখে তার সম্মতি বা এক মতের ইংগিত খুঁজে দেখ্‌লেন, কিন্তু সে মুখ উদাসীন অনড়, একটা চাপা লজ্জা ও অস্বস্তি ছাড়া কিছুই সেখানে প্রকাশ পেলো না। ঐ দিকে তাকিয়ে যে কেউ ধারণা করতে পারতো যে কুনিন্ এমন দুর্বোধ বিষয়ের আলোচনা করছেন যে ফাদার ইয়াকভ বুঝ্‌তে না পেরে ভদ্রতার অনুরোধেই শুধু শুনে যাচ্ছেন এবং তিনি যে বুঝ্‌ছেন না তা ধরা পড়বার ভয়ে সন্ত্রস্ত হ'য়ে আছেন।

"লোকটি খুব বুদ্ধিমান-জাতের নয়,—স্পষ্টই তা দেখা যাচ্ছে।"—কুনিন্ ভাবছিলেন,—"বরং, মুখচোরা এবং বেশ রকম বোকাও।"

ট্রেতে ক'রে দুগ্লাস চা ও ঝুড়ি-ভর্তি বিস্কিট নিয়ে একটা চাকর ঘরে ঢুক্‌লো —ফাদার ইয়াকভ্‌ কিছুটা যেনো সামলিয়ে তাজা হ'য়ে উঠ্‌লেন। এমন কি, তার ওষ্ঠে হাসিও দেখা দিলো। তিনি তার গ্লাসটি নিয়ে তক্ষুনি এক চুমুক দিলেন।

"আমাদের একবার বিশপের কাছে লেখা উচিত নয় কি?" কুনিন্‌ উচ্চস্বরেই ভাবনা প্রকাশ করতে লাগ্‌লেন। "সংক্ষেপে বল্‌লে, বোধহয় জানেন যে গির্জার প্রধান কর্তৃপক্ষ থেকেই এই ফ্রী-স্কুল খোলার প্রস্তাব এসেছে,—আমাদের কাছে থেকেও না, বা জিলাবোর্ডের দিক্‌ থেকেও না। তাদেরি কর্তব্য এখন টাকা জোগাড় ক'রে দেওয়া। মনে আছে, পড়েছিলেম যেনো, এই উদ্দেশ্য কিছু টাকাও নির্দিষ্ট ক'রে রাখা হ'য়েছে। আপনি কি এ বিষয়ে কিছু জানেন না?"

ফাদার ইয়াকভ চা-পানে এতটা আত্মহারা ছিলেন যে সংগে সংগে এ প্রশ্নের জবাব জোগাতে পারলেন না। ধূসর-নীল চোখ কুনিনের দিকে তুলে এক পলক ভাব্‌লেন; তারপর যেনো প্রশ্নটি মনে ক'রে নিয়ে মাথা নেড়ে 'না' জানালেন। নেহাত্‌ই পাকযন্ত্রীয় ক্ষুধার এবং সে জাতীয় আনন্দের একটা ভাব তার সমস্ত চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়্‌লো; চা-পানের প্রত্যেক চুমুকের পরেই তিনি সাগ্রহে ওষ্ঠ মুখের ভিতরে চেটে নিচ্ছিলেন। তলার সব-শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত পান ক'রে গ্লাসটা তিনি টেবিলের উপরে রাখ্‌লেন এবং পরেই আবার তুলে নিয়ে তলার দিক খুঁজে দেখে আবার সেটা টেবিলে রেখে দিলেন··· আনন্দের আস্বাদটি মুখের উপর থেকে মুছে গেলো।···তারপরে কুনিন্‌ দেখ্‌তে থাকলেন, —তার অতিথিটি ঝুড়ি থেকে একটা বিস্কিট নিলেন এবং তার এক টুকরো ভেঙে হাতে নাড়্‌তে নাড়্‌তে চট্‌ ক'রে পকেটে পুর্‌লেন।

"আচ্ছা? এটা তো ঠিক্‌ ধার্মিকের কাজ নয়!"—ঘৃণাভরে ঘাড় কুঁচ্‌কে কুনিন্‌ ভাব্‌ছিলেন। "এটা কি?—যাজকীয় লোভ, না, ছেলেমানুষী?"

তিনি তার অতিথিকে আর একগ্লাস চা খাওয়ালেন এবং গেট পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানিয়ে এসে সোফার উপরে হেলান দিয়ে বস্‌লেন। ফাদার ইয়াকভের সংগে দেখা হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় তিনি অপ্রীতিকর ভাবনার মুখে নিজেকে ছেড়ে দিলেন।

"গেঁয়ো, অদ্ভুত জীব একটি! বিশ্রী, নোংরা, অভদ্র, অসভ্য এবং হয়তো মদ ও

খায়!……হে ভগবান্!—আর, এই হ'লো ধর্মযাজক, আধ্যাত্মিক জগতের পিতা!—এই হ'লো সবার শিক্ষক! প্রতিটি প্রার্থনার পূর্বে ডিকন যখন বলেন,—"আশীর্বাদ করুন, মহান্ ধর্মপিতা!"—তখন তার মুখে যে বক্রহাসি বেঁকে দাঁড়ায় তা আমি এবারে বেশ ভাব্তে পারি! আঃ—কী চমৎকার ধর্মপিতা! মহান ধর্মপিতা, এক-কণা নেই যার সম্মান-জ্ঞান, বংশ-মর্যাদা, আর স্কুলের ছেলের মতো যে বিস্কিট লুকোয়!…ছোঃ, হে ঈশ্বর, এমন একটি মানুষকে কাজ দেবার সময় বিশপ কি চোখ বুঁজে ছিলেন! এ হেন শিক্ষককে নিযুক্ত ক'র্লে তিনি সবার কাছ থেকে বেশী কি আশা করতে পারেন? এখানে এমন একজন চাই যে…"

কুনিন ভাব্তে লাগ্লেন রাশিয়ার ধর্মযাজকের কি রকম হওয়া উচিত। "যেমন, আমি নিজে যদি তাই হ'তাম…একজন শিক্ষিত ধর্মযাজক,—যে তার নিজের কাজ ভালোবাসে, সে অনেক কিছুই ক'রে রাখ্তে পারে।…এই স্কুল অনেক আগেই খুলে দিতাম। আর 'ধর্মবাণী'?—পুরোহিত যদি খাঁটি হয়, কাজের প্রেরণা যদি তার প্রাণ থেকেই আসে, তবে কী আশ্চর্য উদ্বোধনী বাণীই—সে দিতে পারে!"

কুনিন্ চোখ বুঁজে মনে মনে একটি বাণী খাড়া কর্তে লাগলেন, একটু পরেই টেবিলে ব'সে নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা লিখে ফেল্লেন। তারপর ভাবলেন,—ঐ লালচুলো লোকটিকে এটা দিয়ে দেবো, গির্জায় প'ড়ে শোনায় যেনো।

পরের রোববার ভোরে কুনিন্ সিংকোনোতে গাড়ী ক'রে গেলেন স্কুলের বিষয়ে একটা সমাধান কর্তে এবং সেখানেই যখন যাবেন, অমনি গির্জটাও দেখে আসবেন—ঐ গির্জারি তো সে একজন অভিভাবক। পথের অবস্থা সাংঘাতিক হ'লেও চমৎকার ভোর-বেলাটা। আকাশে উজ্জ্বল সূর্য, এখনও এখানে ওখানে বরফের সাদা পলেস্তারা লেগে আছে;—লাল রশ্মি ঢুকে সেগুলি গ'লে গ'লে যাচ্ছিলো, আর মাটির বুক দিয়ে গড়িয়ে পড়্তে পড়্তে হীরকের মত জ্বল-জ্বল কচ্ছিলো—তাকালে চোখ ঝল্সে যাবে এমন। আর, এরই পাশ দিয়ে শীতের শস্য চারাগুলি মাথা উঁচু ক'রে সবুজের ঢেউ তুল্ছিলো। কাকেরা গর্বিত পাখায় মাঠের মধ্য দিয়ে ফির্তে লাগ্লো; একটা কাক উড়্তে উড়্তে চট্ করে নেমে পড়্বে এবং কয়েকবার লাফ দিয়ে তবেই সে পা স্থির ক'রে দাঁড়িয়ে যাবে।…

কুনিনের গাড়ী কাষ্ঠ-নির্মিত গির্জাটার পাশ পর্যন্ত এসে থাম্‌লো। পুরানো-ধূসর গির্জার রং, দুয়ারের কাছের থামগুলি এক সময় সাদা ছিলো, এখন একেবারেই রং ধ্বংসে গেছে। দোরের উপরের মূর্তিটি তো কালিরই একটা পিণ্ড। কিন্তু এর দারিদ্র্য কুনিনের বুকের মধ্য পর্যন্ত নরম ক'রে তুল্‌লো। নম্রভাবে চোখ নামিয়ে তিনি গির্জার মধ্যে ঢুকে দোরের পাশে দাঁড়ালেন। এই মাত্রই গির্জার কাজ আরম্ভ হ'য়েছে। একটি বুড়ো সহকারী প্রণামের ভংগীতে ধর্মগ্রন্থ পড়ছিলেন—ফাঁপা, অস্পষ্ট সুরে। কোনো ডিকন ছাড়াই ফাদার ইয়াকভ কাজ চালিয়ে নিচ্ছিলেন এবং গির্জার চারদিক ঘুরে ঘুরে ধূপ পোড়াচ্ছিলেন। এই দীনতা-পীড়িত গির্জার মধ্যে ঢুক্‌বার কালে কুনিনের মনে একটা ব্যথাভরা অনুভূতি না থাক্‌লে তিনি ফাদার ইয়াকভকে দেখে নিশ্চয়ই হেসে ফেল্‌তেন। এই খাটো-যাজকের গায়ে ছিল বিপর্যস্ত-রকম লম্বা একটা পোশাক, হল্‌দে-রকমের লোমশ কিছুর তৈরী; পোশাকের একটা দিক মাটিতে লোটাচ্ছিলো।

গির্জা লোকে ভরে নি।—এখানকার পালিত লোকদের দিকে তাকিয়ে কুনিন্‌ প্রথমেই একটা ব্যাপারে বিস্মিত হ'য়ে গেলেন। বুড়ো এবং ছেলে-মেয়ে ছাড়া কাউকেই তো চোখে পড়্‌লো না।…কর্মক্ষম মাঝবয়সী লোকেরা সব কোথায়? যুবকেরা আর পুরুষেরা? কিন্তু, কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে বুড়ো মুখগুলি লক্ষ্য ক'রে শেষে তিনি বুঝ্‌তে পারলেন যে আসলে যুবকদেরই বুড়ো ব'লে ভুল ক'রেছেন। তিনি অবিশ্যি চোখের এই সাধারণ ভুলের উপরে বিশেষ কোনো তাৎপর্য আরোপ করলেন না।

বাইরের মতোই গির্জার ভিতরের দিক্‌টাও ধূসর, ঠাণ্ডা। ধুঁয়োটে কালো দেয়ালে অথবা মূর্তিতে এমন একটু জায়গা নেই যেখানকার রং কালের হাতে বিকৃত বা বিনষ্ট হ'য়ে যায় নি। অনেকগুলি জানালা আছে বটে কিন্তু ভেতরের মোটামুটি চেহারা ধূসর রকম, গির্জার মধ্যে সর্বদাই যেনো গোধূলি নেমে আছে।

"যার প্রাণে কোনো ময়লা নেই, সে-ই এখানে প্রাণ ভ'রে প্রার্থনা কর্‌তে পারে।"—কুনিন্‌ ভাবলেন—"রোমের গির্জার ঐশ্বর্য দেখে মানুষ আশ্চর্য হয় কিন্তু এখানকার দীনতা ও ও সরলতা সকলের প্রাণই স্পর্শ করে।"

কিন্তু ফাদার ইয়াকভ বেদীর উপরে দাঁড়িয়ে যেই প্রার্থনা সুরু ক'র্‌লেন—তার এই

ভক্তিভাব ধুঁয়োর মতই উবে গেলো। ফাদার ইয়াকভের বয়স কম; সোজা বিদ্যালয় থেকে এসেছেন ব'লে তিনি প্রার্থনা পাঠকালের কয়েকটি বাঁধা নীতিও এখনো আয়ত্তে আন্‌তে পারেন নি! পড়বার সময় তার গলার স্বর একবার উঁচু, একবার নীচু ও অস্পষ্ট হ'য়ে যাচ্ছিলো। কেমন যেনো বেমানানভাবে তিনি মাথা নুইয়ে প্রণাম কচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি অসংলগ্নভাবে পা ফেলে যাচ্ছিলেন, আর অতর্কিতে একবার দরজা বন্ধ কচ্ছিলেন ও খুল্‌ছিলেন। বুড়ো সহকারী লোকটি স্পষ্টতই রোগা, কালা; প্রার্থনা ঠিক্‌মতো শুনতে পান না, কাজেই মাঝে মাঝে ভুল হ'চ্ছিলো। ফাদার ইয়াকভের বক্তব্য শেষ হবার আগেই হয়তো বুড়ো সহকারী তার পুনরাবৃত্তি সুরু ক'রে দিয়েছে; আবার ফাদার ইয়াকভের হয়তো অনেকক্ষণ হয় শেষ হ'য়েছে কিন্তু বুড়োটি তখনো শুনে নেবার জন্য বেদীর দিকে কান খাড়া ক'রে আছে, তার পোশাক ধ'রে টান না দেওয়া পর্যন্ত কোনো কথাই বল্‌ছে না। বুড়োটি রোগা, আর হাঁপানির দরুণ কথা অস্পষ্ট, ভাঙা-ভাঙা।

গাম্ভীর্য ও যথাযথতার ভাবটি সম্পূর্ণ ভাবেই নষ্ট হ'য়েছে,—বিশেষ ক'রে একটি ছোট ছেলে বুড়োর পেছনে যোগ দেওয়ার জন্য। ঐক্যতানের জায়গাটিতে রেলিংএর উপর দিয়ে ছেলেটির মাথা দেখা যায় না বল্‌লেই হয়। ছেলেটি তীক্ষ্ণ গলায় গান কর্‌ছিল, মনে হয় যেনো সুরের ধার সে ভুলেও ধার্‌তে চায় না। কুনিন্‌ একটু কাল দেখ্‌লেন ও শুন্‌লেন,—তারপর সিগারেট ধরাবার তাগিদে বাইরে এলেন; তিনি একেবাইরেই হতাশ হ'য়ে পড়েছেন, ওই ধূসর গির্জার দিকে বিস্বাদ না নিয়ে তাকাতেই পারলেন না।

"মানুষের মধ্যে ধর্মভাবের অবনতি হ'চ্ছে ব'লে অভিযোগ আসে"—তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন,—"এ হবে না তো হবে কি? এম্‌নি আর কয়টি পুরুত এনে খাড়া কর্‌লে আরো ঢের ঢের উন্নতি হবে!"

কুনিন তিন তিনবার গির্জার ভেতরে গেলেন আর প্রত্যেকবারেই বাইরে খোলা হাওয়ায় ফিরে আসার জন্য যেনো লুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌লেন। প্রার্থনা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে তিনি ফাদার ইয়াকভের ঘরে এলেন। পুরোহিতের ঘরখানি বাইর দিক থেকে দেখে কৃষাণদের ঘর থেকে নতুন কিছু ব'লে মনে হয় না; শুধু ঘরের চালের ওপরটা একটুখানি পরিপাটি, আর জানালায় একটু আধটু পর্দাও আছে। ফাদার ইয়াকভ

কুনিনকে একটি ছোটো খাটো ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন, ঘরটির মেজে মাটির এবং দেয়াল সস্তা কাগজে ঢাকা। ফ্রেমে-বাঁধানো ফোটো, পেণ্ডুলামের ওপরে কাঁচি-আঁকা দেয়াল-ঘড়ি—এই সব দিয়ে আড়ম্বরের একটা করুণ প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও ঘরের সাজ-সজ্জার সল্পতাই তার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিলো। আশে পাশের জিনিষের দিকে তাকিয়ে কেউ ভাবতে পারতো যে ফাদার ইয়াকভ বুঝি বাড়ী বাড়ী ঘুরে একটু একটু ক'রেই এই সব জোগাড় ক'রে নিয়েছেন। এক জায়গা থেকে দিয়েছে তে-পা গোল টেবিল, এক জায়গা থেকে টুল, আর এক জায়গা থেকে একটা চেয়ার,—পিছনে উল্টে-পড়া পিঠের দিকটা, অন্যত্র থেকে আর একটা চেয়ার,—পিঠটা সটান সোজা বটে, তবে ব'সবার জায়গাটি একদম নীচে ব'সে-পড়া ; আর অন্য এক উদার লোকের কাছ থেকে পেয়েছেন সোফার মতো কি একটা,—এটার বসবার জায়গাটা সমতল এবং আড়াআড়ি ভাবে বেতে-বুনানো। এইটার গাঢ় লাল রং থেকে তীব্র গন্ধ আস্‌ছিলো। কুনিন্ প্রথমে এরই একটা চেয়ারে বস্‌বেন ঠিক কর্‌লেন কিন্তু একটু ভেবে টুলের উপরেই গিয়ে বস্‌লেন।

"আপনি বোধ হয় এই প্রথম আমাদের গির্জায় এলেন ?" ফাদার ইয়াকভ বেমানান স্থানের মস্তো বড়ো একটা পেরেকে তার টুপিটা রেখে জিজ্ঞেস ক'রলেন।

"হ্যাঁ, তাই তো। বলছি কি, ফাদার, আমাদের কাজের কথা আরম্ভ করার আগে আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন ? সমস্ত আত্মা পর্যন্তই শুকিয়ে গেছে।"

ফাদার ইয়াকভ চোখ্ পিট্‌পিট্ ক'রতে লাগ্‌লেন, দম যেনো বন্ধ হ'য়ে আসার উপক্রম হ'লো—এমনি ভাবেই দেয়ালের ওদিকে চ'লে গেলেন। পরেই চুপিচুপি আলোচনা শোনা যেতে লাগলো।

"তার বৌয়ের সাথে বোধ হয়,"—কুনিন্ ভাব্‌তে লাগ্‌লেন,—"এই লালকেশী ভদ্র-লোকের বৌটি আবার কেমন মজার হবে, কি জানি !"

একটু কাল পরেই ফাদার ইয়াকভ লাল হ'য়ে ঘেমে ফিরে এলেন এবং হাসবার চেষ্টা ক'রে সোফার কিনারায় এসে বস্‌লেন।

"এখনি ওরা উনুন ধরিয়ে নিচ্ছে,"—অতিথির দিকে না ফিরেই ফাদার বস্‌লেন।

"সর্বনাশ! উনুন ধরায়নি এখনো!"—কুনিন্ আঁৎকে উঠ্‌লেন। "তবে যে পুরো এক যুগই ব'সে থাকতে হবে।······বিশপের কাছে লেখা চিঠির একটা মোটা মুটি খসড়া নিয়ে এসেছি। চায়ের পরেই পড়্‌ছি, সেখানে যোগ ক'রে দেবার আরো কিছু হয়তো আপনার থাক্‌তে পারে।"

"আচ্ছা, বেশ।"

সব চুপচাপ। ফাদার ইয়াকভ দেয়ালের ওদিকটায় আড়াল-চাউনি ফেললেন এবং হাত দিয়ে চুল পালিশ ক'রে নাক ঝাড়্‌লেন।

"চমৎকার রোদ তো?"—ফাদার ইয়াকভ বল্‌লেন।

"হ্যাঁ, কালকে একটা নতুন জিনিষ প'ড়েছি।···ভলস্কি জেলাবোর্ড তাদের ইস্কুল গির্জার হাতে দিয়ে দেবে ব'লে ঠিক ক'রেছ,—ব্যাপারটা বেশ।"

কুনিন্ এবার উঠে মাটির মেজেতে পায়চারি ক'রতে ক'রতে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ ক'রতে লাগলেন :—

"সেটা ঠিকই হ'তো—ধর্মযাজকেরা সত্যি যদি তাঁদের উঁচু আসনে বসবার উপযুক্ত হ'তেন ও তাঁদের কর্তব্য বুঝতে পারতেন। আমার কপালই খারাপ, যে কয়জন ধর্মযাজকের সংঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছে তাঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতির মাপকাঠি ও নৈতিক গুণ এমনি ধারার যে পুরোহিত না হয়ে যুদ্ধ ব্যাপারের সেক্রেটারী হ'লে তবু বা কিছুটা মানাতো! এটা সবাই স্বীকার ক'রবে, খারাপ এক শিক্ষকের চেয়ে খারাপ একজন যাজক দিয়ে ক্ষতি হয় অনেক বেশী।"

কুনিন্ ফাদার ইয়াকভের দিকে তাকিয়ে দেখলেন: তিনি নুয়ে প'ড়ে কোনো কিছু নিয়ে একমনে ভাবছেন, নিশ্চয়ই অতিথির দিকে খেয়াল নেই!

"ইয়াকভ, এদিকে এসো,"—ভাগকরা দেয়ালের ওপার থেকে মেয়েলি গলার ডাক এলো। ইয়াকভ চমকে উঠে ভিতরে গেলেন। আবার চুপিচুপি আলোচনা। কুনিন্ চায়ের তৃষ্ণায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লেন।

"না, এখানে চায়ের জন্যে দেরী ক'রে লাভ নেই"—সোণার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন,—"আর তাছাড়া, খুব স্বাগত অতিথি নই আমি, ভদ্রলোকটি নিজে এখন

পর্যন্ত একটি কথাও তো ব'লতে চাননি। শুধু ব'সেই রইলেন আর পিট্‌পিট্‌ ক'রে তাকালেন মাত্র।"

কুনিন্ তাঁর টুপি নিয়ে ফাদার ইয়াকভের ফিরে আসার অপেক্ষা ক'রে তাঁকে বিদায় জানালেন।

"এই ভোর বেলাটাই একেবারে মাটি হ'য়ে গেলো,"—বাড়ী ফিরবার পথে রাগের মাথায় তিনি ভাবতে লাগলেন, "—বোকা গাধা কোথাকার, অপদার্থ! গেলো শীতের যেমন আমি তোয়াক্কা রাখি না, সেও স্কুলের বিষয়ে তার চেয়ে বেশী কেয়ার করে না...... না, একে নিয়ে করার নেই কিছুই। আমাদের সমস্তই মাটি হবে। মার্শাল যদি জানতেন যে এ জায়গায় পুরোহিতটি কেমন চীজ, তাহলে তিনি আর স্কুল নিয়ে এত মাথা ঘামাতেন না। আমাদের প্রথম কর্তব্যই একজন আদর্শ পুরুত খুঁজে নেওয়া,—তারপরে স্কুলের বিষয় ভাবা।"

কুনিনের এখন ফাদার ইয়াকভের উপর ঘৃণাই হ'চ্ছিলো।

ধর্মভাবের যে টুকু অবশেষে কুনিনের বুকের এককোণে ঠাকুমার রূপকথার সংগে সঞ্চিত হ'য়েছিলো সে টুকুর উপরেই আঘাত ক'রে বস্‌লো ঐ লোকটি, লম্বা শিথিল পোশাক জড়ানো তাঁর দীন চেহারা, মেয়ে-মার্কা মুখ, কাজ চালনার অদ্ভুত ভংগী, তাঁর নীরস-সংযত সম্মান-বোধ—সমস্ত কিছু। ফাদার ইয়াকভ তাঁর নিজের কাজের ব্যাপারেই কুনিনের সহৃদয় আগ্রহকে এমন বিতৃষ্ণ অমনোযোগে গ্রহণ ক'রেছে যে কুনিনের আত্ম-মর্যাদা তা' বরদাস্ত ক'রতে পারে না।...

সেদিন সন্ধ্যায় বহুক্ষণ ধ'রে তাঁর ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রতে ক'রতে কুনিন্ ভাবছিলেন, তারপর একটা সংকল্পের মতোই টেবিলে ব'সে নিয়ে বিশপের কাছে একটা চিঠি লিখে ফেল্‌লেন। টাকার কথা লিখে ও স্কুলের জন্যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করার পরে সিংকোনের পুরুতের বিষয় খোলাখুলি ভাবেই তাঁর নিজের মতামত জানালেন। লিখ্‌লেন,—"লোকটির বয়স কম, উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই, অসংযত জীবন কাটায় বলিয়াই মনে হয়। যুগ যুগ ধরিয়া রাশিয়ার লোকেরা ধর্মনেতার যেরূপ আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছে এই লোকটির মধ্যে তাহার বড় একটা কিছু নাই।"

চিঠি লেখা শেষ ক'রে কুনিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন, এবং এই ধারণা নিয়েই শুতে গেলেন যে, তাঁর দ্বারা আজ একটা ভালো কাজ হ'লো।

সোমবার ভোরবেলা, তখনো তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন, এমন সময় খবর পেলেন যে ফাদার ইয়াকভ আস্‌ছেন, তাঁর একবার উঠ্‌তেও ইচ্ছা হ'লোনা; চাকরকে বল্লেন,—"বলো যে তিনি বাড়ী নেই।" মংগলবার তিনি বোর্ডের সভায় চ'লে গেলেন। শনিবার বাড়ি ফিরলে চাকরে সংবাদ দিলো যে তাঁর অনুপস্থিতির প্রত্যেক দিনই তিনি দেখা ক'রতে এসেছিলেন।

কুনিন্ ভাবলেন: বোধ হয় আমার বিস্কুটের আস্বাদ পেয়ে বসেছেন।

রোববার বিকেলে ফাদার ইয়াকভ এসে হাজির হ'লেন, এবারে শুধু তাঁর পোশাকের প্রান্ত নয়, এমন কি তাঁর টুপি পর্যন্ত কাদার দাগে ভরা। প্রথম দেখা করার দিনের মতোই তিনি লাল হ'য়ে ঘাম্‌ছিলেন, এবং ঠিক সেই দিনের মতোই চেয়ারের কিনারায় এসে ব'সলেন। কুনিন্ ঠিক্ হ'য়ে রইলেন: স্কুলের বিষয় একটি কথাও ব'লবেন না—উলুবনে মুক্তো ছড়াবেন না। ফাদার ইয়াকভ সুরু ক'রলেন,—"প্যাভেল মিহেইলভিচ্, স্কুলের জন্য একটা বইয়ের তালিকা এনেছি।"

"ধন্যবাদ!"

এদিকে কিন্তু সব কিছুতেই ধরা পড়ছিলো, ফাদার ইয়াকভ তালিকা ছাড়া আর কিছুর জন্যই এসেছেন। তাঁর সমস্ত দেহেই অত্যন্ত একটা উদ্বিগ্ন ভাব এবং সেই সংগেই মুখের চেহারায় কোনো সংকল্প প্রকাশ পাচ্ছিলো—হঠাৎ একটা ভাবনায় পেয়ে ব'সলে যেমন হয়। নিতান্ত জরুরী একটা কিছু বলবার জন্য আপ্রাণ যুদ্ধ কচ্ছিলেন তিনি, নিজের ভীরুতা ঝেড়ে ফেল্‌তেও যথাসাধ্য চেষ্টা ক'চ্ছিলেন। "বোবার মতো ব'সে আছে!"—কুনিনের রাগ হচ্ছিলো, "বেশ তো আরামে ব'সে আছে? এর সংগে বক্‌বক্ কর'বার সময় নেই আমার!"

চুপচাপ থাকার এই বিশ্রী আবহাওয়াটা ফেরাবার জন্য ও তাঁর বুকের ভিতরে এই যে দ্বন্দ্ব তা' ঢাক্‌বার চেষ্টায় ধর্ম্মযাজকটি মৃদু মৃদু হাসছিলেন। ঘামানো লাল মুখ নিংড়ে-আসা হাসিটুকু তাঁর ধুসর নীল চোখের স্থির দৃষ্টির পাশে এত বিসদৃশ ঠেক্‌ছিলো যে

কুনিন্ মুখ ফিরিয়ে রইলেন, আর একমুহূর্তও এখানে ব'সে থাকতে তাঁর বিরক্তি লাগ্‌ছিলো।

"কিছু মনে ক'রবেন না, এখনি আমার বাইরে যাওয়া দরকার।"

ফাদার ইয়াকভ চমকে উঠলেন, যেনো ঘুমের মানুষকেই কেউ ধাক্কা দিয়েছে! তবু তখনো সেই হাসিমুখে তিনি বিমূঢ় ভাবে পোশাকের প্রান্ত গায়ের উপরে গুটিয়ে নিলেন। লোকটাকে বিশ্রী-বিরক্ত লাগা সত্ত্বেও কুনিনের হঠাৎ যেনো তাঁর জন্য দুঃখ লাগলো, তাই তার রুক্ষতাকে তিনি একটু মোলায়েম ক'রতে চেষ্টা ক'রলেন।

"ফাদার তা হ'লে আর একবার আসবেন যেনো। আর, আমার বেরোবার আগে আপনার একটা সাহায্য চাই। সেদিন কেমন ক'রে যেনো দুটো 'প্রার্থনা' লিখে ফেললাম··· আপনাকে দেখতে দিচ্ছি,—যদি ভাল লাগে নিয়ে নেবেন যেনো।"

"আচ্ছা সে বেশ তো!"—টেবলের উপরকার দুটো প্রার্থনাবাণীর উপরে হাত দিয়ে ফাদার ইয়াকোভ ব'ললেন—"হ্যাঁ, এখনি নিয়ে নিচ্ছি!"

একটু কাল দাঁড়িয়ে দ্বিধা ক'রে তখনো পোশাক গায়ের চারদিকে গুটিয়ে,—হঠাৎ তিনি হাসবার চেষ্টা রেখে সংকল্পের মতোই মাথা তুললেন "প্যাভেল মিহেইলভিচ্!"—স্পষ্টতই তিনি জোরে এবং স্পষ্টভাবে বলতে চেষ্টা করলেন।

"আপনার আমি কি ক'রতে পারি, বলুন?"

"শুনেছি যে আপনি, মানে···আপনি আপনার সেক্রেটারীকে কাজ থেকে বরখাস্ত ক'রেছেন এবং নতুন আর একজনের খোঁজ ক'চ্ছেন······"

"হ্যাঁ, তা বটে···কেনো, একাজে আপনি কি কাউকে দিতে চান?"

"আমি, মানে, দেখছেনই তো, আমি·········কাজটা কি আমাকেই দিতে পারেন?"

"কেনো, আপনি কি গির্জা ছেড়ে দিচ্ছেন?"—কুনিন বিস্মিত হ'য়ে গেলেন।

"না, না, তা নয়, ভগবান না করুন!"—ফাদার ইয়াকভ তাড়াতাড়ি ক'রে ব'লে উঠলেন এবং কোনও কারণে মুখ তার ফ্যাকাসে হ'য়ে গেলো, সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। "অবশ্যি আপনার যদি দ্বিধা থাকে—তা হ'লে, তা হ'লে ও কিছুই না, ও থাক।

অবশ্যি, মাঝ-ফাঁকে কাজটা ক'রে নিতে পারতাম !···কিছু আয় বাড়িয়ে নেওয়াও দরকার। তা থাক, ও জন্যে চিন্তা ক'রবেন না।"

"হুঁ, আপনার আয়। কিন্তু আপনার বোধ হয় জানা নেই যে আমার সেক্রেটারীকে মাসে শুধু বিশ রুব্‌ল দিয়ে থাকি !"

"হায় ভগবান, দশ হলেও তো নিই।" ফাদার ইয়াকভ চারদিক তাকাতে তাকাতে আস্তে আস্তে ব'ললেন—"দশ রুব্‌লই যথেষ্ট ! আপনি, আপনি বিস্মিত হচ্ছেন, আর সবাইও হচ্ছে ! লোভী যাজক, জবরদস্ত যাজক, টাকা দিয়ে লোকটা করে কি। আমার নিজেরো মনে হয় আমি লোভী বটে······নিজেকে ধিক্কার দিই আমি, অপরাধী ব'লে মনে করি···লোকের মুখের দিকে তাকাতেও আমার লজ্জা হয়······প্যাভেল মিহেইলভিচ্, আমার বিবেকের দিকে তাকিয়েই এই কথা বলছি, ভগবানও সব দেখছেন তো !"

ফাদার ইয়াকভ দম নিয়ে ব'লে চ'ললেন :

"এখানে আসতে আসতে আস্তো একটা স্বীকারোক্তির মতোই খাড়া ক'রে এনেছিলেম, কিন্তু······একবর্ণও এখন মনে ক'রতে পাচ্ছি না। আমি গির্জা থেকে ফি-বছর দু'শ রুব্‌ল পাই, আর সবাইও অবাক হ'য়ে ভাবে : এতো টাকা দিয়ে করি কি ?···এবারে আমি সব কথা সত্য ক'রে খুলে ব'লছি। আমার ভাই পিওটোর-এর স্কুলের জন্য দিতে হয় চল্লিশ রুব্‌ল। সেখানে সবি সে জোগাড় ক'রে নিয়েছে, কাগজ-কলমের খরচটা আমাকে যোগাতে হয়।"

"একি ক'চ্ছেন ? আপনাকে খুবি বিশ্বাস করি আমি। আর কি জন্যেই বা এই সব ব'লছেন······"—কুনিন হাত বাড়িয়ে ব'লে উঠ্‌লেন। আগন্তুক এই লোকটির বিশ্বস্ত সব গোপন কথার এমন আকস্মিক প্রকাশ তার কাছে একটা ভয়ানক আঘাতের মতোই মনে হ'চ্ছিলো, কিন্তু ফাদার ইয়াকভের সজল দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার কোনো পথও দেখছিলেন না।

"তারপর, আমার এই জায়গায় থাকার জন্য বাড়ীওয়ালার সব পাওনা এখনো মিটিয়ে দিতে পারিনি। এখানে থাকার বাবদ তারা দুশ রুবল দাবী ক'রেছে, মানে—মাসে দশ

রুব্‌ল···এবারে আপনি বুঝতে পারেন বাকী থাকে কী! এবং এ ছাড়া, ফাদার আব্রেমিকে যে ক'রেই হোক মাসে অন্তত তিন রুব্‌ল না দিলেই চলে না।"

"ফাদার আব্রেমি কে?"

"যিনি আমার আগে সিংকিনোতে ছিলেন; অপারগ ব'লে তাঁর জীবিকার এই পথ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি এখনও এই সিংকিনোতেই থাকেন। এ ছাড়া তাঁর আর জায়গা নেই, তাঁকে আশ্রয় দেবে কে? বুড়ো হ'য়েছেন, তবু তো একদিকে তাঁর জায়গা চাই, খাবার চাই, পরনেও কিছু চাই, এ অবস্থায় তাঁকে পথে পথে ভিক্ষা ক'রতে দিতে পারি না। একটা কিছু হ'লে আমারই বিবেকে লাগ্‌বে, সে হবে আমারই অপরাধ···ঋণে তাঁকে চারদিক থেকে ঠেসে ধ'রেছে, আর তাঁকেই যদি কিছু না দিতে পারি তো সে হবে আমারই অন্যায়···"

ফাদার ইয়াকভ তাঁর আসন থেকে সোজা উঠলেন এবং নিচের দিকে ব্যাথার মত তাকাতে তাকাতে ঘরের মধ্যে বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে লাগলেন।

"ভগবান! হা আমার ভগবান!"—ব'লে তিনি হাত দুটো একবার উপরে তুল্‌লেন—"প্রভু, আমাদের ত্রাণ করো। এতটুকু বিশ্বাস ও শক্তি যদি না থাকে তবে কেনো একাজ নিলাম?······আমার হতাশার আর অন্ত নেই। মা, মেরী মা, আমাকে বাঁচাও।"

কুনিন বল্‌লেন, "আশ্বস্ত হ'ন, ফাদার!"

ফাদার ইয়াকভ ব'লে চললেন: "প্যাভেল মিহেইলভিচ, খাবার অভাবে আমি শেষ হ'য়ে এসেছি···অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ক্ষমা ক'রবেন। শক্তির কিনারায়, এসে পৌঁছেছি, আমি আজ যদি ভিক্ষার জন্য মাথা নোয়াই, সবাই আমাকে সাহায্য করবে—তা' জানি, কিন্তু···তা তো পারি না, মনে ঘা লাগে। কিষাণদের কাছ থেকে কেমন ক'রে ভিক্ষা নেবো? আপনি তো এখানে বোর্ডে আছেন, আপনিই তো জানেন। ভিখারীর কাছে কেমন ক'রে হাত পাতি? আর ধনী জমিদারদের কাছে?—সেও পারি না, সম্মানে লাগে, লজ্জা লাগে।"

ফাদার ইয়াকভ দুই হাত দিয়ে বিকৃতভাবে মাথা চুলকোতে লাগ্‌লেন,—"ভগবান! ঘৃণা হয়, আমার উপর ঘৃণা হয়। আমার মর্যাদায় আঘাত লাগে, আর কেউ যে আমার

দীনতা চেয়ে দেখবে তা' আমি সহ্য ক'রতে পারি না। আপনি সেদিন আমার ঘরে এলেন, প্যাভেল মিহেইলভিচ, ঘরে চা ছিলোনা, এক ফোঁটাও না। অথচ মর্যাদার অনুরোধে আপনাকে তা' ব'লতে বেঁধেছে। আমার পোশাক দেখে নিজেরই লজ্জা হয়—দাগে দাগে ভরা······পুরুতের কি এমন গর্বিত হওয়া উচিত?"

ফাদার ইয়াকভ পড়ার-ঘরের মধ্যে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন, এবং কুনিন যেনো লক্ষ্য করেন নি এমনভাবে নিজের কাছে নিজেই যুক্তি দিতে লাগলেন,—"আমি না হয় ক্ষুধা, অসম্মান স'য়ে রইলাম—কিন্তু হায় ভগবান, আমার স্ত্রী রয়েছে! স্বচ্ছল ঘর থেকেই তাঁকে এনেছি, কষ্ট কাজ করা তাঁর অভ্যাস নেই। নরম আদুরে মেয়ে সে; চা-কেক-রুটি ও বিছানায় ধবধবে চাদর—এই সবেই সে অভ্যস্ত হ'য়ে এসেছে······বাপের বাড়ী থাকতে সে পিয়ানো বাজিয়ে গাইতো···বয়স কম, এখনও বিশে পা দেয়নি। নিশ্চয়ই তাঁর সাধ হয় একটু ফিটফাট থাকে, আলাপ আমোদ করে, বাইরে সবার মধ্যে বেড়াতে যায়··· আর সে আমার সংগে থাকে কিনা রাঁধুনি মেয়ের চেয়েও জঘন্য অবস্থায়! লোকে দেখবে ব'লে রাস্তায় বেরুতে তার লজ্জা হয়। ভগবান! হায় ভগবান! কোনো বাড়ী যাওয়ার সুযোগে একটা আপেল বা কিছু বিস্কিট যদি আনতে পারি,—তবে তাই হয় তাঁর একমাত্র ভালো খাবার···"

ফাদার ইয়াকভ আবার দুই হাত দিয়ে মাথা চুলকোতে আরম্ভ ক'রলেন।

"এতে আমাদের মধ্যে ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না, এ ওকে অনুগ্রহ করি শুধু! করুণা না নিয়ে একটিবারও তাঁর দিকে তাকাতে পারি না। হা ঈশ্বর! পত্রিকায় পড়লেও লোকে বিশ্বাস ক'রতে চাইবে না—এমন অবস্থা!···চিরদিনের মতো কবে সব শেষ হবে···"

তাঁর গলা শুনে কুনিন ভয় পেয়ে গেলেন এবং প্রায় চীৎকার ক'রেই ব'লে উঠলেন, "শান্ত হ'ন ফাদার, জীবনটাকে এমন কালো ক'রে দেখছেন কেনো?"

"অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা ক'রবেন প্যাভেল মিহেইলভিচ"—ফাদার ইয়াকভ নেশার মতো বিড়বিড় ক'রে ব'লতে লাগলেন,—"ক্ষমা করুন সব···ও কিছুই না, এ সব খেয়াল ক'রবেন না। আমাকেই আমি দোষ দেই এবং চিরদিন আমাকেই দোষ দেব, চিরদিন—"

ফাদার ইয়াকভ তাঁর চারদিকে তাকিয়ে আবার চাপা গলায় ব'লতে লাগলেন:

"জানেন, একদিন খুব ভোরে সিংকিনো থেকে লুচকোভো যাবার পথে দেখি কি : একটি মেয়ে নদীর পারে কি যেনো ক'চ্ছে···কাছে এগিয়ে নিজের চোখকেই বিশ্বাস ক'রতে পারলাম না। সর্বনাশ ! এ যে ডাক্তার আইভান সেরগিভিচের স্ত্রী ব'সে কাপড় কাচছে··· ডাক্তারের স্ত্রী, নাম-করা বোর্ড স্কুলের মেয়ে! খুব ভোরে ভোরে উঠে আধমাইল খানেক দূরে গিয়ে নিয়েছে—লোকে তাঁকে দেখতে না পায়···সে তাঁর সম্মান ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। যখন সে বুঝলো যে আমি তাঁর দীন অবস্থা দেখে ফেলেছি, অপমানে সে যেনো একেবারে মাটির সংগে মিশে যাচ্ছিলো···কেমন বিমূঢ় হ'য়ে তাড়াতাড়ি তাঁকে সাহায্য করতে গেলাম,—সে কিন্তু তাঁর জামা কাপড় লুকিয়ে ফেললো ; ভয় হচ্ছিলো, যদি তাঁর ছেঁড়া সেমিজ দেখে ফেলি···"

"এ যে একেবারেই বিশ্বাস হয় না"—কুনিন ফাদার ইয়াকভের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে যেনো ভয় পেয়ে ব'লে উঠলেন।

"সত্যিই বিশ্বাস হয় না, প্যাভেল মিহেইলভিচ,—একজন ডাক্তারের স্ত্রী যে নদীতে ব'সে কাপড় কাচবে এ রকম ঘটনা কেউ কখনো শোনেনি, কোনো দেশেই এমন ঘটেনা। তাঁর শুভাকাংখী ও ধর্ম-পিতা হিসেবেও আমার এসব দেখা উচিত। কিন্তু আমারই বা উপায় আছে কি ? তাই তো, এই আমি নিজেই তো তাঁর স্বামীকে চিকিৎসার জন্য ডাকি, অথচ একটি পয়সাও দেই না !

সত্যিই ব'লেছেন, এসব বিশ্বাস হয় না। নিজের চোখকেই কেউ বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারে না—এমন। গির্জায় প্রার্থনার সময় হয়তো লক্ষ্য ক'রেছেন—বেদী থেকে তাকিয়ে দেখি যখন সামনের জনতা,—আভ্রেমি খেতে পায়নি, আমার স্ত্রী ঐ, ঐ ডাক্তারের স্ত্রী—হিমজলে হাত তাঁর মৃত্যু-নীল হয়ে গেছে,—(হয়তো আপনার বিশ্বাস হবে না) আমি তখন নিজেকে হারিয়ে ফেলি, বোকার মত স্তব্ধ হ'য়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকি, সহকারী ডাক দিলেই তবে সম্বিৎ ফিরে আসে। কি সাংঘাতিক !"

ফাদার ইয়াকভ্ আবার চারিদিকে ঘুরতে আরম্ভ ক'রলেন, হতাশায় হাত দুটি উপরে তুলে ব'লতে লাগলেন,—

"প্রভু যিশু ! হা প্রভু, ঠিকমত আমি গির্জার কাজ চালাতে পারিনা······আপনি

এখানে স্কুলের কথা বলেন, আর আমি কুঁড়ের মত একঠাঁয় ব'সে থাকি শুধু—একটি কথাও বুঝে উঠতে পারিনা ; শুধু খাবার, খাবার, সবার খাবার ছাড়া আর কোন কথাই মনে আসেনা……এমন কি বেদীর সামনেও……কিন্তু……থাক……কেনো আমি এসব বক্‌ছি !" ফাদার ইয়াকভ্ হঠাৎ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে উঠলেন : "ও, আপনি বাইরে যাবেন বলেছিলেন। ক্ষমা করুন, ও কিছুনা, ক্ষমা করুন……"

কুনিন নীরবে ফাদার ইয়াকভকে হাত ধ'রে বিদায় জানিয়ে একদৃষ্টে তাঁর পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, পরে পড়ার ঘরে ফিরে এসে জানলায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলেন : ফাদার ইয়াকভ বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাঁর মরচে-পড়া মস্তো টুপিটা চোখের উপর পর্যন্ত টেনে দিলেন, তারপর মাথা নীচু ক'রে ধীরে ধীরে রাস্তা ধ'রে চলতে লাগলেন,—যেনো তাঁর আকস্মিক উচ্ছ্বাসের জন্য তিনি লজ্জিতই হ'য়ে আছেন।

কুনিন ভাবলেন, "ঘোড়া তো দেখতে পাচ্ছি না।" ফাদার যে পায়ে হেঁটে রোজ রোজ তাঁর সংগে দেখা ক'রতে এসেছেন—কুনিন একথা ভাবতে পর্যন্ত সাহস পেলেন না।

সিংকিনো পাঁচ-ছ' মাইলের পথ, পথে এত কাদা যে চলা অসম্ভব। এবারে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর নিজের সহিস ও প্যারামন্ চাকর ছেলেটাকে। তাঁরা গর্তের উপরে লাফ দিয়ে দিয়ে ফাদার ইয়াকভের গায়ে কাদা ছিট্‌কিয়ে দৌড়ে আসছে তাঁর আশীর্বাদ চাইতে। ফাদার ইয়াকভ্ টুপি খুলে ধীর শান্তভাবে আন্দ্রেকে আশীর্বাদ ক'রলেন ; তারপর ছেলেটিকে আশীর্বাদ ক'রে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

কুনিন চোখের উপর হাত মুছে নিতে তা' যেনো ভিজে মনে হ'লো। জানলার সুমুখ থেকে দূরে স'রে এসে আচ্ছন্ন চোখে তিনি চারিদিকে তাকাতে লাগলেন,—তখনো যেনো ফাদারের ভীরু করুণ কণ্ঠ ঘরের মধ্যে শুন্‌তে পাচ্ছিলেন। টেবিলের দিকে তাকালেন তিনি, —ভাগ্যে ফাদার ইয়াকভ তাড়াতাড়িতে প্রার্থনাগুলি নিতে ভুলে গেছেন ! কুনিন ধেয়ে গিয়ে সেগুলোকে টুক্‌রো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ঘৃণাভরে ছুঁড়ে ফেললেন টেবিলের নিচে।

সোফায় ব'সে প'ড়ে আহতমনে ভাবতে লাগলেন তিনি :

"আর, আমি নিজে জানতে পারিনি ! এক বছরের উপরে এখানে আছি আমি—পল্লীমংগল সমিতির সদস্য, অনারারি জাষ্টিস্ অব্ পিস্, স্কুল-কমিটির সভ্য আমি !

ধামাধরা চাকর, আস্ত একটি গাধা! আমাকে এমনি গিয়ে তাঁদের সাহায্য ক'রতে হবে, দেরী না ক'রে এক্ষুনি যেতে হবে।"

কুনিন অস্বস্তিভরে এপাশ ওপাশ ক'রতে লাগলেন, গাল চেপে ধ'রে মাথা খুঁড়ে সব দেখতে লাগলেন।

"বিশ তারিখে মাইনে পাবো—দু'শ' রুব্ল···কোনো ভালো অছিলা খুঁজে তাঁকে দেবো কিছু, আর কিছু দেবো ডাক্তারের স্ত্রীকে·· কোনো একটা বিশেষ কাজের অনুরোধে এখানে ডেকে এনে একটা অসুখ বানিয়ে নিলেই চ'লবে।···তাহ'লে নিশ্চয়ই তাঁদের গর্বে আঘাত লাগবে না। আর, ফাদার আভ্রমিকেও সাহায্য ক'রতে হবে। আঙুলের উপরে তিনি মাইনে গুণে দেখলেন। ভাবতেই ভয় লাগছিলো যে, ঐ দু'শ' রুব্লে তাঁর চাকর, সরকার ও মাংসের পাওনাদারকে দিয়ে কুলিয়ে ওঠাই শক্ত।······এই বিগত দিনের কথাও তিনি না ভেবে পারলেন না: সেদিনও তাঁর বাবার টাকা বোকার মতো সে দু'হাতে উড়িয়েছে, বিশ বছরের এক ফুলবাবু সেজে রূপ-গণিকাদের দামী দামী পোশাক দিয়েছে, তাঁর সহিস্ কাজ্মাকেও দিয়েছে ফি রোজ দশ রুব্ল, অভিনেত্রীদের পায়ে উপহার ঢেলেছে গর্বের খেয়ালে। হায়, হায়, কত কাজেই না লাগতো ঐ নষ্ট ক'রে ফেলা রুব্ল, তিন রুব্ল ও দশ রুব্লের নোটগুলি।"

"আর, ফাদার আভ্রমি মাসে মাত্র তিন রুবলের উপর বাঁচেন!"—কুনিন ভাবতে লাগলেন, "এক রুব্ল হাতে পেলে ফাদারের স্ত্রীর একটা সেমিজ হয় এবং ডাক্তারের স্ত্রী একটা ধোবা ঠিক ক'রে নিতে পারে। কিন্তু এবারে তাঁদের দেখবোই, যেমন ক'রেই হোক্, তাঁদের সাহায্য ক'রবোই।"

বিশপের কাছে গোপনে যে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন, কুনিনের সে কথা মনে পড়তেই হঠাৎ যেনো তাজা হওয়ার অভাবে তিনি চুপ্‌সে এলেন। একথা মনে হ'তেই অন্তরাত্মার সামনে এবং তাঁর অজানা এই সত্যের সামনে তিনি লজ্জায় একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লেন।

আরামে আরামে সকলের কল্যাণ ক'রবার এমন নিষ্ক্রিয় শুভ-কামনা তিনি জন্মের মতোই ত্যাগ ক'রলেন। সেদিন থেকেই তাঁর জীবন নতুন পথে মোড় নিলো।

দুলালী

কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অর্থ-সচিবের মেয়ে অলেংকা; পেছন-বারান্দায় ব'সে ভাবনায় সে ডুবে আছে। খুব গরম পড়ছে, মাছিগুলো জিদ ক'রে প'ড়ে প'ড়ে বিরক্ত করছে শুধু। শিগগিরি সন্ধ্যা হ'য়ে যাবে এই ভাবনা, যা হোক তবু, শান্তি দিচ্ছিলো খানিকটা। পূব দিক দিয়ে মেঘ কালো ক'রে আসছে; হাওয়ায় হাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে বইছে তার ভিজা নিশ্বাস।

তিবলী নামে একটা যাত্রার পরিচালক হ'লো কুনিন। এখানেই থাকে সে, বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে সে তাকিয়ে ছিলো।

"আবার!"—হতাশার মতো সে বলতে লাগলো,—"আবার জল আসছে! রোজ রোজই বর্ষা, আমাকে যেনো খেয়ে ফেলবে। এর চেয়ে সোজা গলায় দড়ি দেবো। সব গেলো আমার, সব গেলো! প্রত্যেক রোজই কী সাংঘাতিক ক্ষতি!"

তারপর, দু'হাত উপরে তুলে অলেংকাকে উদ্দেশ ক'রে ব'লে চললো:

"এই তো! এ হেন জীবনই তো কাটাচ্ছি আমরা, ওলগা সিমিয়নাভা! বুক ভেঙে দিতে এই তো যথেষ্ট! একটা লোক খাটবে, আপ্রাণ ক'রে—হাড়ভাঙা খাটুনি, রাতে পর্যন্ত চোখে এক্ ফোঁটা ঘুম নেই। কী ক'রে যে হাল ফেরাবে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে নিত্য নিয়ত সে ভাবনা। আর, লাভ হয় কি? তাহ'লে বলতে হয়, মানে—লোকে বোঝেনা কিছুই, বোকা বাজে লোক যতো! তাদের জন্য নাম-করা উঁচু ধরণের অভিনয় করাই,—জাঁকজমকে ঝলসে-দেয়া রাজ-রাজাদের কাহিনী, এবং তার সংগে বাছা বাছা আর্টিষ্ট। কিন্তু মনে করেছেন এসব একটুও আমল দেয় তারা, ও ধরণের কিছু তারা আসলে মোটে বোঝেই না। চায় কি? ভাঁড়, একটি ভাঁড়! ঝুঁকে থাকবে অশ্লীল কিছুর জন্য। তারপর আবহাওয়াটা দেখেছো? প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যায়ই বিষ্টি আর বিষ্টি! জ্যৈষ্ঠের দশই সেই যে বায়না ধরেছে, আর জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ়ই তো সমানে চ'লছে! কি ভয়ানক! কেউ আসে না, কিন্তু আমাকে তো ভাড়াটি ঠিক গুণে দিতে হবেই, তারপর অভিনেতাদের মাইনে।"

পরের দিন সন্ধ্যায় আবার মেঘ ক'রে আসবে, আর কুনিনও পাগোলের মতো হায় হায় ক'রে বলতে থাকবে—"বেশ! জলে ভাসিয়ে নাও সব, বাগান তলিয়ে দাও, আমাকে শুদ্ধই তলিয়ে দাও! আমার ইহকাল পরকাল গোল্লায় যাক। অভিনেতারা এসে আমার গলা টিপে ধরুক, জেলে ঠেলে দিক,—সাইবেরিয়ায়, একেবারে সাইবেরিয়ায়,—সোজা ফাঁসী। হায়, হায়, হায়!" তার পরের দিনও তথৈব চ!

অলেংকা চুপ ক'রে গম্ভীর মুখে কুনিনের কথা শুনছিলো, আর মাঝে মাঝে তার চোখে জল আসছিলো। কুনিনের এমন দশা এবার তার প্রাণে গিয়েই লেগেছে; তাকে সে যেনো ভালোবাসতেই সুরু ক'রেছে।

কুনিন, ছোট্ট মানুষটি, ফ্যাকাসে ফর্সা রং, কপালের উপরে আচড়ানো কোঁকড়ানো চুল, ক্ষীণস্বরে কথা কয়, আর বলার সময় মুখ তার একদিকে মাত্র নড়তে থাকে। সমস্ত সময়ই তার মুখে একটা হতাশার ছাপ। তবু যেনো অলেংকার বুকে তার জন্য একটা গভীর ও অকৃত্রিম স্নেহের সুরে জেগে উঠেছে; মেয়েটি কারো না কারো উপরে মন না দিয়ে থাকতেই পারে না। ছোটোবেলায় তার বাবাকে ভালোবেসেছে, তার যে মাসি বছরে একবার ব্রিয়ানক থেকে বেড়াতে আসতো, তাকে ভালোবেসেছে,—এবং তারো আগে যখন স্কুলে ছিলো সে তার ফ্রেঞ্চ-মাষ্টারকে ভালোবাসতো। আদুরে মনের শান্ত মেয়ে সে, দয়ায়-ভরা নরম আনত দুটি চোখ, শরীরটুকুও বেশ ভালো, ভরা দুটি গোলাপ-ফোটা গাল, গৌর বর্ণের নরম গ্রীবাটি,—তার উপরে ছোট্ট একটি কালো তিল! সুখবর কিছু শুনবার কালে মুখে তার দরদভরা সরল একটি হাসি ফুটে থাকে। দেখে সবাই ভাবে—'বেশ, মন্দ না তো।' আর, তারাও হাসে। মেয়ে-পরিচিতেরা কথার মাঝখানেই তার হাতটি ধ'রে খুসীর উচ্ছ্বাসে না ব'লে উঠে পারে না—"আমাদের দুলালী!"

ঘরটা সহরের একেবারে প্রান্তে, তিবলী থেকে বেশী দূরে নয়; এখানেই সে, কচিকাল থেকে মানুষ হ'য়ে এসেছে। তার বাবা ওটা তাকে উইল ক'রে দিয়ে গেছে।

রোজরাতে সে থিয়েটারের ব্যাণ্ডবাজনা ও আতসবাজির ছড়্ছড়্ বুম্ বুম্ শব্দ শুনতে পেতো এবং তার মনে হ'তো কুনিন যেনো তার ভাগ্য নিয়ে বিজয়-যুদ্ধ ক'রে চলেছে,—তার চিরশত্রু বিমুখী সর্বসাধারণের উদাসীন প্রাচীর ভেঙে ভেঙে দিয়ে। অলেংকার বুক যেনো ভ'রে উঠতো, ঘুমুতে ইচ্ছে হ'তো না। তারপর কুনিন যখন ভোরে বাড়ী ফিরতো, অলেংকা তার শোবার ঘরের জানালা আস্তে আস্তে খুট্ খুট্ ক'রে খুলতো, নিজের মুখখানি ও ঘাড় পর্যন্ত দেখাবার মতো ক'রে মশারী তুলে তার দিকে চেয়ে একটুখানি মিঠে ক'রে হাসতো।

কুনিনই তার কাছে প্রস্তাব আনলো এবং একদিন তাদের বিয়ে হ'য়ে গেলো। তারপরে, স্বামী এবারে আরো ঘনিয়ে এসে তার গ্রীবা ও সুন্দর ভরা-কাঁধটি দেখতে পেয়ে দুহাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললো,—"আমার দুলালী।"

খুব খুসীই হ'লো সে, কিন্তু সেই তার বিয়েতে দিনরাত ধ'রে বর্ষা হ'য়েছিলো ব'লে এখনও তার মুখে হতাশার ছায়া লেগে আছে!—

বেশ আরামেই ভেসে চ'ললো তাদের দিনগুলি। স্বামীর অফিস ঘরে ব'সে তিবলীর সব কিছু সে দেখাশোনা করে, হিসেব দেখে, মাইনে মিটিয়ে দেয়। তার লাল গাল দুটি, মিষ্টি সরল ফুটন্ত হাসিটুকু কখনো দেখা যেতো অফিস ঘরের জানালায়, কখনো খাবার কোঠায়, আবার তার পরক্ষণেই থিয়েটারের পেছনে। ইতিমধ্যেই সে পরিচিতদের কাছে ব'লে ফিরছে: রংগমঞ্চই হ'চ্ছে জীবন-মঞ্চের সবচেয়ে দরকারী জিনিস; এবং শুধু নাটক-অভিনয়ের মধ্য দিয়েই কেউ সত্যিকার আনন্দ খুঁজে পেতে পারে, সভ্য ও মানুষ হ'তে পারে।

"কিন্তু, তুমি কি মনে করো সবাই তাই বোঝে?"—সে ব'লে ফিরতো—"তারা চায় একটি ভাঁড়। গতকাল আমরা 'ফষ্ট ইন্সাইড আউট্' ব'লে নামকরা একটা নাটক করলাম আর গোটা বক্সই প্রায় খালি প'ড়ে রইলো। কিন্তু এই ভ্যানিট্কা আর আমিই যদি বাজে একটা কিছু করতাম তো—হলফ ক'রেই ব'লতে পারি—থিয়েটারে তা' হ'লে আর তিল ধারণেরও জায়গা থাকতো না। কালকে ভ্যানিট্কা আর আমি "নরকপুরীতে অরফিউস্" কচ্ছি। দেখে নিও!"

থিয়েটার আর অভিনেতাদের প্রসংগে কুনিন যা যা বলে, সেও ঠিক তাই আওড়ায়। কারু-শিল্পে অজ্ঞতা ও বিমুখিতার জন্য তার মতোই সে সর্ব্বসাধারণকে ঘৃণার চোখে দেখে। অলেংকা রিহার্সেলে অংশ নিতো, অভিনেতাদের ভুল শুধরে দিতো, গায়কদলের আলাপ-ব্যবহারের দিকে নজর রাখতো। স্থানীয় পত্রিকায় অপ্রীতিকর কোনো সমালোচনা উঠ্‌লে কেঁদে ভাসিয়ে দিতো সব,—তারপরে সম্পাদকের অফিসে গিয়ে সব আবার ঠিকঠাক ক'রে আসতো।

অভিনেতাদেরো অলেংকাকে বেশ ভালো লাগতো, তারা একে উদ্দেশ ক'রতে হ'লে ব'লতো ভ্যানিটকা আর আমি অথবা 'তুলালী'। এদের জন্য মেয়েটির দুঃখই হ'তো, সময় অসময় কিছু টাকাও ধার দিতো; এবং তারা ঠকিয়ে নিলে আড়লেই সে চোখের জল ফেলতো,—স্বামীর কাছে কিন্তু এ নিয়ে কোনো অভিযোগ তুলতো না।

শীতকালটা দুজনে মিলে শান্তিতেই কাটিয়ে দিলো। সমস্ত শীতটাই তারা যাত্রাটা সহরে উঠিয়ে নিলো। দেশীয় কোনো কোম্পানীর হাতে বা কোনো ব্যবসায়ীর কাছে বা স্থানীয় কোনো নাট্য-সংঘের কাছে কিছু দিনের জন্য তারা যাত্রাটা ভাড়া খাটাতো। অলেংকা আরো মোটাসোটা হ'য়েছে, সব সময়েই সে খুসীতে উজ্জল; আর কুনিন এদিকে শুকিয়ে শুকিয়ে আরো সরু ও হল্‌দে হ'য়ে এলো। "এবার যা ভয়ানক ক্ষতি!"—ব'লে দিনরাত কেবল সে খুঁত খুঁত করে। অথচ সমস্ত শীতকালটা ধ'রেই কিন্তু সে মন্দটি পকেটে আনেনি। রাতে সে খুক্ খুক্ করতো—আর অলেংকা তাকে গরম গরম আদা-চা বা মিশ্রী গোলমরিচ খাওয়াতো, বুকে অডিকোলন মালিশ ক'রে দিতো ও তাকে তার নিজের গায়ের শালের মধ্যে নিয়ে জড়িয়ে ধ'রে শুয়ে থাকতো।

কুনিনের চুলগুলি নাড়তে নাড়তে সে সত্যিকার প্রাণঢালা দরদের সুরেই ব'লতো—"কি লক্ষীটি তুমি, তুমি আমার বুকের মাণিক!"

বড়দিনের ছুটির দিকে কুনিন যখন সার্কাসের জীবজন্তু ও নানা জিনিষপত্র যোগাড় ক'রতে মস্কোতে চ'লে গেলো, তাকে ছাড়া অলেংকার চোখে ঘুম এলো না, সমস্ত রাত তারার দিকে চেয়ে জানালায় ব'সে ব'সেই কাটালো। নিজেকে তার মনে হ'লো ঠিক একটি মুরগীর মতো। মোরগ বাসায় না থাকলে মুরগী যেমন সমস্তরাত কেমন অস্থির হ'য়ে জেগে

থাকে। মস্কোতে কুনিনের দেরী হ'য়ে গেলো এবং সে লিখে জানালো যে বড়োদিনের ছুটিতে সে ফিরিবে,—তিবলী প্রসংগে কিছু নির্দেশও দিয়ে দিলো। কিন্তু ইষ্টারের আগের রোব্‌বারে ঘোর সন্ধ্যাকালে ঘরের দরজায় হঠাৎ একটা অশুভ শব্দ হ'লো; কেউ যেনো দুয়ারের উপরেই কুড়ুল মারছে দ্রুম্‌ দ্রুম্‌ দ্রুম্‌! ঝিমন্ত রাঁধুনী মেয়েটি কাদাজলের মধ্য দিয়ে খালি পায়ে ছপ্‌ ছপ্‌ ক'রতে ক'রতে বাইর দরজাটা খুলতে দৌড়ে এলো।

"একবার দোরটা খুলুন।"—বাইরে কেউ মোটা ভাঙা গলায় ব'ললো,—"আপনার একটা টেলিগ্রাম আছে।"

অলেংকা আগেও তার স্বামীর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে, কিন্তু এবারে কী জানি কেনো, ভয়ে সে অবশ হ'য়ে এলো। কাঁপতে কাঁপতে সে টেলিগ্রামটা খুলে পড়লো—

"আইভান পেট্রোভিচের হঠাৎ আজ মৃত্যু হইয়াছে। নিইর্দেশের প্রতীক্ষায়, মংগলবার সসৎকার।"

ঠিক এই রকমই টেলিতে লেখা—"সসৎকার" আর একেবারেই অবোধ্য শব্দ "নিইর্দেশের!" অপারেটিক কোং'র রংগমঞ্চ পরিচালকের নাম নীচে সই করা।

"ও প্রাণ আমার!"—অলেংকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো,—"ভানিট্‌কা, সর্বস্ব আমার, প্রিয় আমার! তোমার সংগে এ জীবনে কেনো আমার দেখা হ'লো, কেনো তোমাকে চিনলাম, কেনো তোমাকে ভালোবাসলাম! এখন তোমাকে ছাড়া তোমার বুকভাঙা অলেংকা, হতভাগী অলেংকা সারা দুনিয়ায় যে একেবারে একা প'ড়ে রইলো।"

মস্কোতে মংগলবারে কুনিনের সৎকার হ'য়ে গেলো। অলেংকা বুধবার বাড়ী ফিরে এলো। আর, সে ঘরে ঢুকেই বিছানায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে এতো উচ্চস্বরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো যে কাছের বাড়ী থেকে,—রাস্তা থেকে পর্যন্ত তা শোনা যেতে লাগলো! প্রতিবেশীরা পাশ দিয়ে যেতে যেতে ব'লতে লাগলো—"হতভাগী দুলালী! অল্‌গা সিমিয়নাভানা, হতভাগী দুলালী; কী ক'রেই যে সে আছে!"

মাস তিনেক পরে অলেংকা গির্জা থেকে প্রার্থনা ক'রে গভীর শোক ও দুঃখ নিয়ে বাড়ী ফিরছিলো। সেদিন তার একজন প্রতিবেশী এণ্ড্রিচ পুস্তভালভও গির্জা থেকে ফিরবার সময় তার পাশে পাশেই আসছিলো। ব্যাবাকিয়ভে একটা কাঠের কারবারের

পরিচালক সে। মাথায় তার পরা ছিলো খড়ের টুপি, গায়ে একটা শাদা ছোটো কোট, আর সোনার চেন-ঘড়ি। তাকে যেনো ব্যবসায়ীর চেয়ে বরং একজন গ্রাম্য ভদ্রলোকের মতোই দেখাচ্ছিলো

"বিধাতার যেমন লিখন, সবি ঘটে তেমন"—সে তার গম্ভীর গলায় দরদী সুর এনে ব'ললো,—"অল্‌গা সিমিয়নভানা, যদি আমাদের প্রিয়জন কেউ ম'রে থাকে, সেও ভগবানেরি ইচ্ছা ব'লেই। কাজেই, ধৈর্য ধ'রে নম্রভাবে আমাদের সব সহ্য ক'রে নিতে হবে!"

বাইরে গেট পর্যন্ত অলেংকাকে এগিয়ে দিয়ে সে নমস্কার জানালো ও চলতে লাগলো। তারপরে সমস্ত দিন ভ'রেই অলেংকা তার মর্যাদাভরা সংহত কথা শুনতে পেলো, চোখ বুঁজলেই তার কালো দাড়ি চোখের সামনে এসে ভেসে ওঠে। অলেংকার তাকে বেশ ভালোই লাগলো। আর মনে হয়, সে নিজেও সেই ভদ্রলোকটির মনের উপরে ভালো রকম একটা ছায়া ফেলেছে; কারণ কিছুদিন না যেতেই তারি আধো পরিচিত একজন বয়সী মহিলা তার সংগে এসে চা খেলো; এবং টেবলের কাছে ব'সে নিজেই সে পুস্তভালভের কথা নিয়ে সুরু ক'রলো; ব'ললো, লোকটি অতি চমৎকার কেউ তার উপরে সহজেই নির্ভর ক'রে থাকতে পারে,—যে-কোনো মেয়েই তাকে বিয়ে করতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে। তিনদিন পরে পুস্তভালভ নিজেই এলো। সে বেশীক্ষণ ব'সলো না, মিনিট দশেকমাত্র। এবং বেশী একটা কথাও ব'ললোনা,—কিন্তু যখন সে চলে গেলো অলেংকা তাকে যেনো ভালোবেসে ফেলেছে! এতো গভীর ক'রে ভালোবেসেছে যে সমস্ত রাতই সে যেনো ঠিক জ্বরের নেশায় জেগে কাটালো এবং ভোরেই পাঠালো সেই বর্ষিয়সী মহিলাকে ডেকে আনতে। সম্বন্ধ খুব তাড়াতাড়িই ঠিক হ'য়ে গেলো, তারপরেই বিয়ে।

বিয়ের পরে পুস্তভালভ ও অলেংকা মিলেমিশে বেশ সুখেই কাটাতে লাগলো।

প্রত্যেক দিনই সে খাবার সময় পর্যন্ত অফিসে থাকতো, তারপরে ব্যবসায় প্রসংগে বাইরে বেরুতো। আর, অলেংকা তার জায়গা নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিসে বসতো, হিসেব রাখতো এবং অর্ডার নিতো।

"ফি-বছরেই কাঠ ক্রমে দুর্লভ হ'য়ে উঠছে, দাম বেড়েছে শতকরা বিশটাকা!"—সে তার

খরিদ্দার ও বন্ধুদের কাছে বলতো, "তারপর একবার ভেবে দেখুন না,—আমরা আগে স্থানীয় কাঠই বিক্রী ক'রতাম, আর ভ্যানিট্‌কাকে কাঠের জন্য এখন ছুটতে হয় সেই কোন মগলিয়েভ জেলায়। কী ভয়ানক ব্যাপার।"—দুহাতে নিজের গাল চেপে ধ'রে শংকায় সে ব'লে উঠ্‌তো, "কী ভয়ানক!"

তার মনে হ'তো, যুগযুগ ধ'রেই সে কাঠের ব্যবসায়ের মধ্যে থেকে এসেছে,—আর জীবনের সব চেয়ে মুখ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসই হ'চ্ছে কাঠ। বোর্ড, পোষ্ট, বিম, পোল, সেলেটের ফ্রেম-কাঠ, কাঠের টুকরা-টাকরা, তক্তা ইত্যাদি সব শব্দের মধ্যে পর্যন্ত পরিচিত ও প্রিয় কি যেনো খুঁজে পেতো সে।

রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতো: তক্তা ও বোর্ডের পাহাড় জড়ো হ'য়ে উঠেছে। দূরে কোথায় কাঠ চালান দেওয়া হ'চ্ছে গাড়ীর পর গাড়ী। স্বপ্ন দেখতো,—৪০´×৬´´ বিমের আস্তো এক বিরাট গোলা এক মাথায় খাড়া হ'য়ে আঙিনায় মার্চ ক'রে ফিরছে। কাঠের খণ্ড, বীম, বোর্ড ও শুকনো কাঠ ঠন্ ঠন্ শব্দ ক'রে,—একটা আর একটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে,—প'ড়ে যাচ্ছে আর উঠে দাঁড়াচ্ছে। আবার একটা আর একটার উপর প'ড়ে গিয়ে স্তূপীকৃত হ'চ্ছে। অলেংকা ঘুমের মধ্যেই চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো।

পুস্তভালভ্ তাকে আদরের সুরে ব'ললো—"অলেংকা, কি হ'য়েছে। দুলালী আমার। ভয় নেই, ভগবানের নাম করো।"

স্বামীর ভয়-ভাবনা সমস্তই তার। স্বামীর যদি ধারণা হ'তো ঘরটা খুব গরম আজ বা ঐ ব্যবসাটা মন্দা যাচ্ছে, তবে তার নিজেরও ঠিক তাই ধারণা হ'তো। তার স্বামী আমোদ প্রমোদের ধার ধারতো না, ছুটির দিন ঘরে বসেই কাটাতো। সে নিজেও ঠিক তাই করতো। বন্ধুরা তাকে বলতো—"তুমি তো সব সময়েই এক না হয় ঘরে, না হয় অফিসে। দুলালী গো, তোমার থিয়েটারে যাওয়া উচিত একবার, না হয় সার্কাসে।" ভ্যানিকট্‌কার ও আমার থিয়েটারে যাবার সময় নেই"—সে স্থিরভাবে উত্তর দিতো,—"আমাদের বাজে কিছু করার সময় নেই, থিয়েটার দিয়ে কি হয়?"

রবিবার সন্ধ্যাবেলায় পুস্তভালভ আর সে গির্জায় যেতো, ছুটির দিনে ভোরের

প্রার্থনায়। তারা গির্জা থেকে ফিরতি-পথে পাশাপাশি হেঁটে আসতো; তাদের মুখের ভাব তখন বেশ কোমল হ'য়ে উঠতো। দুজনের চারপাশ দিয়ে তখন ভালো-লাগা একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়তো; রেশমী গাউনের খসখসানিটুকুও যেনো বেশ মিষ্টি। বাড়ীতে এসে তারা চা খেতো, চায়ের সংগে দামী-রুটি ও পাঁচ মিশেলি তরকারী। তারপরে মশ্‌লা ছড়ানো ফলের বা মাংসের থালা। রোজ বারোটায় আঙিনা থেকে বীট্‌মূল ঝোলের, ভেড়ার বা হাঁসের মাংসের খিদে-লাগানো একটা গন্ধ আসতো, আর আসতো উৎসবপর্বের দিনে। সেই দোর দিয়ে যাবার সময় সবারি জিভে জল আসতো। অফিস ঘরে লোভনীয় কিছু সমস্ত সময়ই রান্না হ'চ্ছে; খরিদ্দার ভদ্রলোকদের চা, ক্রীমবিস্কুট দিয়ে আপ্যায়িত করা হ'চ্ছে। সপ্তাহে একদিন দুজনে মিলে সমুদ্রে চান করতে যেতো, আর লাল মুখ নিয়ে পাশাপাশি ফিরে আসতো ঘরে।

"হ্যাঁ, ভগবানের কৃপায় আমাদের কোনো অভাব অভিযোগ নেই'—অলেংকা তার পরিচিতের কাছে 'বলতো,—"সবারি যদি এমনটি হোতো, ভ্যানিট্‌কা আর আমি যেমন।"

মগিলেভ জেলায় পুস্তভালভ যখন কাঠ আনার জন্য চ'লে যেতো, সমস্ত কিছুই যেনো তার শূন্য লাগতে থাকতো। স্মার্নিন ব'লে এক যুবক চিকিৎসক সে, যুদ্ধদলে কাজ করে; তারি ভাড়াটে সে। কখনো কখনো সন্ধ্যেবেলায় সে তার ঘরে এসে বসতো ও তার সংগে কথা বলতো। এ দিয়ে তবু সে স্বামীর অনুপস্থিতিটুকু ভ'রে রাখতো। সে লোকটি তার পারিবারিক জীবনের যে কাহিনী ব'লেছে, তাতেই সে বিশেষ উৎসুক হ'য়ে আছে। সে বিবাহিত, একটি ছোট্ট ছেলেও আছে, কিন্তু তার বৌ বিশ্বাস-ভাঙানো রকম কিছু ক'রেছে ব'লেই তারা ছাড়াছাড়ি হ'য়ে আছে। আর, এখন সে তাকে ঘৃণা করে এবং ছেলেটির ভরণপোষনের জন্য মাসে ৪০ রুবল ক'রে দিয়ে থাকে। এসব শুনে অলেংকা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, আর মাথা নাড়তে লাগলো; লোকটির জন্য সত্যই তার দুঃখ হ'য়েছে।

"হ্যাঁ, ভগবান আপনাকে দেখবেন"—মোমবাতি ধ'রে সে তাকে সিঁড়ি দিয়ে বিদায়

দিতে দিতে বলতো,—"সত্যি, আমাকে একটু আমোদে রাখার জন্ম আপনাকে বহুৎ ধন্যবাদ! মা মেরী আপনাকে ভালো রাখুন।"

সে সব সময়েই তার স্বামীর অনুকরণে ঠিক তারি মতো সংহত-সম্মানিত ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতো। পশু-চিকিৎসকটি দোরের পিছনে অদেখা হ'য়ে যেতে যেতে সে বলতো:

"বুঝলেন, ভল্যাডিমির প্ল্যাটোনিকি, আপনি বরং বৌর, সংগে একটা মিটিয়ে ফেলুন। আপনার ছেলের দিক চেয়েও তাকে ক্ষমা করা উচিত। এটা ঠিকই জানবেন আপনি, মেয়েটি এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছে।"

আর পুস্তভালভ বাড়ী ফিরলে সে বেশ চাপা গলায় তাকে পশুচিকিৎসক ও তার অসুখী ঘরের কথা বলতো, এবং দুজনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়তো, ও বাপহারা ছেলেটির কথা বলতে থাকতো। সংগে সংগে ভাবনার এক বিচিত্র যোগাযোগে তারা দুজনেই দেবমূর্তিদের কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা নুইয়ে প্রণাম করতো ও প্রার্থনা জানাতো,— ভগবান যেন তাদের একটি সন্তান দান করেন।

কাজেই পুস্তভালভরা দুজনে নিরালা শান্তিতে মনেপ্রাণে মিলেমিশে ছয় বছর কাটালো ভরা-ভালোবাসায়।

তারপর? শীতের এক ভোরে অফিসে গরম গরম চা খাওয়ার পরে ভ্যাসিলি এণ্ড্রিচ্ মাথায় টুপি নিয়ে ঘরের বাইরে গেল—কতকগুলি কাঠ পাঠানোর বিষয় দেখাশোনা করতে; আর সর্দি লেগে অসুস্থ হ'য়ে পড়লো। তার জন্ম বাছা-বাছা ডাক্তার আনা হ'ল, কিন্তু অবস্থা ক্রমেই খারাপ হ'য়ে দাঁড়ালো এবং চার মাসের রোগে সে মারা গেলো। অলেংকা আবার বিধবা হ'ল।

"এখন কেউ রইল না আমার, তুমি আমাকে ফেলে রেখে গেলে, প্রাণ আমার!"—স্বামীর সৎকারের পরে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। "তোমাকে ছেড়ে পোড়া কপাল নিয়ে কী করে থাকবো আমি! তোমরা সবাই আমার দিকে একবার চেয়ে দেখো, সারা দুনিয়ায় আমি একা!"

সে গভীর শোকের লম্বা কালো পোশাক প'রে চ'লতে লাগলো। টুপি ও দস্তানা

পরা জন্মের মতো ছেড়ে দিলো। কখনো বাড়ী থেকে বাইরে বেরোত না, শুধু গির্জা বা স্বামীর কবরস্থান ছাড়া; ব্রতচারিণীর জীবন কাটাতো সে। ছয় মাসের আগে সে শোকের পোশাকও ছাড়লো না বা জানলার কবাটও খুললো না। কোনো কোনো দিন তাকে দেখা যেতো, পাচিকাকে নিয়ে সে ভাঁড়ার ঘরের জিনিসপত্র কিনতে যাচ্ছে; কিন্তু তার ঘরের মধ্যে যে কি হচ্ছে, কেমন ক'রে যে সে কাটাচ্ছে তা বেশ বোঝা যায়। বাগানে পশু চিকিৎসকের সংগে ব'সে ব'সে চা খাওয়া আর অলেংকাকে তার জোরে জোরে পত্রিকা প'ড়ে শোনানো; আরো একটা ঘটনা, পোষ্ট অফিসের ওখানে তার চেনা একটি মেয়েলোকের কাছে সে বলেছিলো :

"এই সহরে ঠিক মতো পশু-চিকিৎসার তত্ত্বাবধান নেই, সেই হ'চ্ছে সব রকম সংক্রামক রোগের মূল কারণ। দুধ-সরবরাহ থেকে রোগ ছড়াচ্ছে; ঘোড়া, গরু থেকে লোকের রোগ বাঁধছে—এসব তো সবাইর শোনা কথা। গৃহপালিত প্রাণীদের স্বাস্থ্য প্রসংগে ঠিক মানুষের মতই যত্ন নেয়া উচিত।" এসব ঘটনা দেখে সকলেই ব্যাপারটা ঠিক বুঝে ফেললো।

সে পশু-চিকিৎসকের কথাই ফিরে বলছে, প্রত্যেক বিষয়ই সে তার সংগে একমত। স্পষ্টতই দেখা যায় যে ভালোবাসার কোনো আশ্রয় বিনা একটি বছরও সে থাকতে পারে না; আবার ঘরে সে নতুন সুখ খুঁজে পেয়েছে। আর কারো প্রসংগে এমনটা হোলে অপ্রীতিকর সমালোচনা হোতো, কিন্তু অলেংকার কথায় কেউ মন্দ ধরে না। তার সব কিছুই যেনো এতো সহজ স্বাভাবিক। সে নিজে বা পশু-চিকিৎসক তাদের মনের এই পরিবর্তনের কথা কাউকে কিছু বললো না, বরং সত্যিটা ঢেকে রাখতেই চেষ্টা করলো। কিন্তু আগুন চাপা থাকেনা। অলেংকা কোনো কথা পেটে রাখতে পারে না। যখন ভদ্রলোকের কাছে তার কোনো চাকুরে সাথীরা আসতো আর সে চা ঢেলে দিতো বা খাবার এনে দিতো, অলেংকা তখন গোমোড়ক, খুড় ও মুখের অসুখ এবং মিউনিসিপাল কশাইখানার কথা ব'লতে লেগে যেতো। ভদ্রলোক ভয়ানক রকম লজ্জিত হ'য়ে পড়তো এবং অতিথিরা চ'লে গেলে তার ধারে গজগজ্ ক'রতে ক'রতে ব'লতে থাকতো :

"তোমাকে আগেই বলেছি, যা বোঝোনা তা বলতে যেওনা। আমরা পশু-চিকিৎসকেরা যখন আমাদের মধ্যে কথা বলি, তোমাকে জানিয়ে রাখছি,—কথাটিও বলবে না সেখানে।. সত্যিই' বড়ো অসুবিধে করো।"

আর মেয়েটি তার দিকে বিস্ময় ও ব্যথায় তাকিয়ে থেকে বিপদে পড়ার মতো জিজ্ঞাসা করতো: "কিন্তু ভ্যালেডিট্‌কা, কী নিয়ে বলবো তবে?" জলভরা চোখে সে তার বুকে লেগে থেকে তাকে রাগ না করতে বলতো। এমনি ক'রে তারা বেশ সুখেই রইলো।

কিন্তু এই সুখ বেশীদিন টিকলো না। পশু চিকিৎসক তার দলের সংগে চলে গেলো, একেবারেই চলে গেলো,—বদলি হ'য়ে গেলো সুদূর কোথায়,—সাইবেরিয়ায় হয় তো। অলেংকা পড়ে রইলো একা।

এবারে সে একেবারেই নিঃসংগ-একা। তার বাবা মারা গেছে অনেকদিন; ধূলি-জমানো পা-ভাঙা তার একটা আরাম-কেদারা চিলকোঠায় প'ড়ে আছে। অলেংকা দিন দিন শুকিয়ে সরু হ'য়ে গেলো, সে ফিট্‌ফাট ভাব আর নেই। লোকেরা তাকে যখন রাস্তায় দেখতো, আগের মতো আর তার দিকে তাকাতো না, বা চেয়ে হাসতো না। স্পষ্টই, তার সেরা বয়স চলে গ্যাছে, পিছিয়ে গ্যাছে; আর এখন এমন এক নতুন রকমের জীবন আরম্ভ হ'য়েছে যে তা ভাবনার ভার পর্যন্ত সইতে পারছে না। সন্ধ্যায় বারান্দায় ব'সে অলেংকা তিবলীর ব্যাণ্ড-বাজনা আর আলো-বাজির ছড়্ ছড়্ পট্ পট্ শব্দ শুনতে পেতো, কিন্তু সেই শব্দ এখন আর তাকে কোনো সাড়া দেয় না। তার আঙিনার দিকে সে নিরুৎসাহের মতো তাকিয়ে থাকে, কোনো কিছুর কথাই ভাবে না, কোনো কিছুরি সাধ হয় না; এর পরে রাত এলে সে বিছানা নেয় আর স্বপ্ন দেখত: তার আঙিনা শূন্য প'ড়ে আছে। সে যে খাওয়া দাওয়া করতো—সে যেনো নেহাৎ অনিচ্ছায়। সবচেয়ে অসুবিধের ব্যাপার হোলো, কোনো বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব'লে কিছু রইলো না। চারপাশের জিনিষ দেখে, যা দেখে তা বোঝে কিন্তু তাদের উপর কোনো মন্তব্য খাড়া করতে পারে না, বা জানেও না কী বলবে; আর কোনো মতামত না থাকাটা কী ভয়ানক! এই যেমন, কেউ দেখছে একটা বোতল, বিষ্টি বা একটা চলন্ত গাড়ী কিন্তু কি জন্য এই বোতল, বিষ্টি বা গাড়ী এবং এদের অর্থই বা কী

সে বলতে পারে না, এমন কি হাজার চেষ্টা ক'রেও না। যখন কুনিন বা পুস্তভালভ বা পশু চিকিৎসক ছিলো—অলেংকা সব কিছুই বুঝিয়ে দিতে পারতো এবং যে বিষয়ে খুসী একটা মতামত পেশ করতে পারতো। আর এখন বাইরের আঙিনার মতই তার অন্তর একটা ফাঁকা মাত্র।

একে একে সহরটি চারদিকে বেড়ে উঠ্‌লো। পথগুলি সদর রাস্তা হ'য়ে গেলো, আর তিবলী ও কাঠগোলার জায়গায় নতুন পরিবর্তন, নতুন নতুন বাড়ী হোলো। কোথা দিয়ে যে সময় চ'লে যায়! অলেংকার বাড়ী নোংরা হ'য়ে গেলো, ছাদ ছাৎলা পড়লো, ঝুল বারান্দার একদিক ব'সে গেলো, জংলা গাছে ও বিছুটি পাতায় ভরে গেলো সমস্ত আঙিনা। অলেংকা সাদাসিধে ও বর্ষিয়সী হ'য়ে পড়েছে; গরমকালে সে বারান্দায় ব'সে থাকে, তার প্রাণ আগের মতই শূন্য-ধূসর ও তিক্ততায় ভরে থাকে। শীতে সে জানালায় ব'সে বাইরে তুষারের দিকে চেয়ে থাকে; যখন সে বসন্তের আসি-আসি গন্ধ পায়, বা গির্জার ঐক্যতান শোনে—পিছনের দিন থেকে চকিতে কতো স্মৃতির জোয়ার বয়ে এসে তাকে ভাসিয়ে নেয়, একটা নাম ব্যথার মতো বুকে বাজতে থাকে, আর দুটি চোখে অশ্রুর বাঁধ ভেঙে আসে। কিন্তু এ শুধু কয়েক পলক মাত্র, তার পরেই আবার সেই শূন্যতা—জীবনের সব ব্যর্থতা। কালো বেড়ালছানা মেনি, তার গা ঘ'ষে আস্তে আস্তে ঘড় ঘড় করতে থাকে, কিন্তু বিড়ালছানার এই আদরে অলেংকার মন একটুও ভরে না। সে তো এ চায়নি। এমন একটা ভালোবাসা চায় সে, যাতে সমস্ত মানুষটাকে ঢেকে দেবে, তার সমস্ত প্রাণ ও বুদ্ধিকে,—যা তার ধারণা-শক্তি ও জীবনের একটা উদ্দেশ্য খাড়া ক'রে দেবে, তার পুরোণো হিম রক্তে উষ্ণ জোয়ার ব'য়ে আনবে। বেড়ালছানাটাকে কোল থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিরক্তিতে সে বললো: "যা, চ'লে যা, তোকে চাইনে আমি।"

আর ঠিক এমনিই দিনের পর দিন, বছরের পর বছর; কোনো আনন্দ নাই, কোনো ভালো-মন্দ নাই। মার্ভা পাচিকা যাই বলতো, সে তাই মেনে নিতো।

তখন এক গরম দিনে সন্ধ্যাকালে গরুগুলিকে যখন ঘরে ফিরিয়ে আনা হ'লো, আর সমস্ত আঙিনা ধুলো ভ'রে উঠ্‌লো,—কে যেন দরজাতে কড়া নাড়লো। অলেংকা নিজেই

দোর খুলতে গিয়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো : সামনে পশু চিকিৎসক স্মার্ণিণ, ধুসর-মাথা, তার গায়ে সিভিলিয়ানের পোশাক পরা। হঠাৎ তার সবি মনে পড়লো। কেঁদে উঠে সে তার বুকে অমনি মাথা রাখলো,—একটি কথাও বলতে পারলো না। আর, প্রাণের প্রবল আবেগে খেয়ালই করলো না, কেমন ক'রে যে তারা বাগান থেকে ঘরে এসে চা খেতে বসলো।

"প্রিয় আমার! ভ্লাডিমির প্ল্যাটনিচ্! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলেম!"—আনন্দ-আবেগে কাঁপতে কাঁপতে সে বিড় বিড় ক'রে বললো।

"এখানে আমি একেবারে থেকেই যাবো, ওল্‌গা সিমিয়নাভানা" সে তাকে বললো। "চাকরী ছেড়ে দিয়েছি আমি, এখানেই থেকে যেতে এসেছি, নিজের ভাগ্য এবার নিজেই খুঁজে নেবো। তা ছাড়া, আমার ছেলেরো স্কুলে যাবার বয়স হ'য়েছে। মস্তো বড়োই হ'য়ে পড়েছে সে! জানলে, বৌর সংগে ঝগড়া মিটিয়ে মিলে গেছি আমরা।"

"সে কোথায়?"—অলেংকা জিজ্ঞেস করলো।

"ছেলেকে নিয়ে সে হোটেলে আছে, আমি এদিকে বাসাঘর খুঁজছি!"

"হায় ভগবান! কপাল আমার! বাসাঘর? আমার বাসা নাও না কেন? তাতে হবে না কি? কেনো, তাতে কি, কোনো ভাড়া নেবো না আমি।"—অলেংকা উৎসাহে অস্থির হ'য়ে বললো ও কাঁদতে সুরু করলো।

"তুমি এখানে থাকো, তা হ'লে বাড়ীটা বেশ লাগবে আমার। ও, তুমি এসেছো, আমার যে কতো আহ্লাদ!"

পরের দিনই ছাদে রঙ্ করা হোলো, দেয়ালগুলি চুনকাম করা হোলো। আর, অলেংকা বুকের উপর হাত ভাঁজ করে উঠানে ঘুরে ফিরে এটা সেটা আদেশ করতে লাগলো। তার মুখখানা আবার পুরোনো দিনের সেই হাসিতে উজ্জ্বল বেশ চঞ্চল! যেনো একটা দীর্ঘ ঘুম থেকে এবার সে জেগে উঠলো। পশু চিকিৎসকের বৌ এলো,—ছিপ্ ছিপে সাদাসিধে মহিলাটি, খাটো চুল আর খিট্‌খিটে ভাবটা। তার সংগে শাসা, দশ বছরের একটি ছেলে, বয়সের চেয়েও দেখতে ছোটো, নীল চোখ, মোটা-সোটা,

গালে টোল-পড়া। ছেলেটি আঙিনায় পা দিতেই বেড়ালছানাটা ধ'রতে ছুটে এলো : আর অমনি তার প্রাণখোলা হাসি বেজে উঠ্‌লো।

"মাসি, ওটা তোমার পুসি ?"—সে অলেংকাকে জিজ্ঞাসা করলো। "যখন এর বাচ্চা হবে, আমাদের একটা দিয়ে দিয়ো। মা'র ভয়ানক ইঁদুরের ভয় !"

অলেংকা তার সঙ্গে কথা বলতে থাকে, চা দেয়। এবার তার প্রাণটা জুড়িয়ে গেছে, বুকের মধ্যে কেমন একটা মিষ্টি ব্যথা জেগে উঠেছে, ছেলেটি যেনো তারি বুকের সন্তান ! ছেলেটি সন্ধ্যেবেলায় টেবলে ব'সে তার পড়া করে, আর অলেংকা নিবিড় করুণা নিয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। নিজের মনে ভাবে সে :

"লক্ষ্মী ছেলে আমার ! আমার সোনা মানিক !···কেমন সুন্দর ছোট্ট, অথচ এতো বুদ্ধি !"

"একটি ভূখণ্ডকে দ্বীপ বলে যার চারিদিকে সম্পূর্ণরূপে জলবেষ্টিত"—ছেলেটি জোরে জোরে প'ড়ে চ'লেছে !

"একটি ভূখণ্ডকে দ্বীপ বলে"—সেও সংগে সংগে বলতে থাকে। এতো বছরের নৈঃশব্দ্য ও ভাবনার দৈন্যের পরে এই যেনো সে একটা নির্দিষ্ট বিশ্বাস নিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করলো।

এখন তার নিজের মতামত ব'লে একটা কথা দাঁড়ালো। রাতে খাবার সময় সে শাসার বাবা-মার কাছে বলতো : "হাইস্কুলের পড়া যে কতো কঠিন হ'য়েছে। কিন্তু তা হ'লেও হাইস্কুল কমার্সিয়াল স্কুলের চেয়ে ঢের ভালো, কারণ হাইস্কুলে শিক্ষা নিলে সমস্ত পথই খোলা থাকে, যেমন ডাক্তার হও বা ইঞ্জিনিয়ার হও, যা খুশী !"

শাসা হাইস্কুলে যেতে সুরু করেছে। তার মা হারকভ তার বোনের কাছে গেলে ও ফিরে এলো না ; তার বাবা প্রত্যেকদিনই গরু-ভেড়া নানারকম পশুদের দেখতে সেই যে সোজা বেরিয়ে যেতো আর প্রায়ই দিন তিনের মধ্যেও বাড়ী মুখো হতো না। অলেংকার মনে হোতে থাকে শাসাকে যেনো তারা ত্যাগ ক'রে গেছে, তাদের বাড়ীতে তাকে দিয়ে কোনো দরকারই নেই, শাসা বুঝি না খেয়ে প'ড়ে আছে। একদিন সে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসে ছোট্ট একটা কোঠায় থাকতে দিলো।

সেই থেকে ছ মাস পর্যন্ত শাসা তার সংগেই আছে। রোজ ভোরে অলেংকা তার শোবার ঘরে এসে দেখে : নিশ্চুপ-নিশ্চিন্তে সে গভীর ভাবে ঘুমুচ্ছে, হাতটি গালের নিচে রেখে। তাকে জাগিয়ে তুলতে দুঃখ লাগে তার।

"শাসেংকা!"—করুণ ভাবে সে বলে—"ওঠো এখন, ওঠো খোকন! স্কুলের বেলা হোলো যে!"

শাসা উঠে সেজে গুজে প্রার্থনা পাঠ করে; তারপর জলখাবার খায়—তিন গ্লাস চা, দুটো বড়ো ক্রিমবিস্কিট ও কিছুটা মাখন! এই সময়টা সে ঘুমের নেশায় বুঁদ, কাজেই একটু খিট্‌খিটে থাকে।

"শাসেংকা, গল্পের পড়াটা বোধ হয় তোমার ঠিক ঠিক মনে নেই!"—অলেংকা তার দিকে চেয়ে বলতো, যেনো সে দূর বিদেশে কোথাও চলেছে! "তোমাকে নিয়ে কি মুস্কিলেই পড়েছি! খোকন, খাটো, প্রাণপণ খেটে শেখো, আর শিক্ষকদের কথা শুনো, কেমন?"

"আঃ, রাখোনা তুমি!"—শাসা ব'লে ব'সতো। তারপর সে ঢালু-রাস্তা দিয়ে স্কুলে চলতো : ছোট্ট এতোটুকু, মস্তো বড়ো টুপি মাথায়, কাঁধের উপরে স্কুল-ব্যাগ। অলেংকাও নিঃশব্দে তার পিছু পিছু চ'লতে থাকতো।

"শাসেংকা!"—সে তাকে পিছু ডাকে, আর তার হাতের মধ্যে কয়েকটা খেজুর বা একটা বিস্কিট পুরে দেয়। স্কুলের রাস্তায় পৌঁছে ছেলেটির লজ্জা লাগতো যে তার পিছু পিছু আবার লম্বা একজন বয়সী মেয়েলোক আসছে! সে ফিরে দাঁড়িয়ে বলতো :

"তুমি বরং বাড়ী চ'লে যাও, মাসী! বাকী পথটুকু একাই আমি বেশ যেতে পারবো।"

স্কুল-গেটের আড়ালে শাসা অদেখা হওয়া পর্যন্ত সে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে তার দিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকে।

আঃ, তাকে সে কতো যে ভালোবাসে! তার আগের প্রিয়জনের মধ্যে কেউই এমন ক'রে তার বুকের গভীরে নাড়া দেয়নি। এখন যেমন তার মার বুকের বৃত্তিগুলি উন্মুখ আকুল হ'য়ে জেগে উঠেছে—এমন স্বাভাবিক ও সহজ উল্লাসে তার প্রাণ আর

কোনদিন কোন আবেগের মধ্যে ধরা দেয়নি। গালে টোল-পড়া, মাথায় মস্তো বড়ো টুপি-পরা সেই ছোট্ট ছেলেটির জন্য সে সমস্ত জীবনই দিয়ে দিতে পারে, মায়ায়-ভরা চোখের জলে সবকিছুই ভাসিয়ে দিতে পারে! কেনো, কেনো যে, তা কি সে জানে?

শাসাকে শেষ চাউনি পর্যন্ত দেখে সে শান্ত-সন্তোষ নিয়ে বাড়ীতে ফিরতো, স্নেহ-মায়ায় বুকের কূল-পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠতো; তার মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো। সত্যি, এই ছয় মাসের মধ্যে তার মুখখানা অনেক কচি হ'য়ে গেছে! লোকে তার দিকে চেয়ে আবার খুসী হয়!

"এই ওলগা সিমিয়নাভানা, দুলালী আমাদের! কেমন আছো তুমি, দুলালী!"

"হাইস্কুলের পড়া আজকাল বড্ডো কঠিন হ'য়েছে"—সে বাজারে ব'সেই বুঝিয়ে বলতে সুরু করে। "বড়ো বাড়াবাড়ি হচ্ছে, ক্লাস থ্রিতে তারা সেদিন একটা গল্প আগাগোড়া মুখস্ত পড়া দিয়েছে, আর একটা ল্যাটিন অনুবাদ আরো একটা প্রবলেম! তবেই বোঝো এতত্টুকু ছেলে কি এতটা পারে!

আর সে বলতে লেগে যায় মাষ্টারদের কথা, স্কুলের পাঠ্য বই, শাসা যা যা বলে ঠিক তাই।

তিনটার সময় তারা দুজনে মিলে খাবার খেতো, সন্ধ্যা হলেই দুজনে মিলে গলা চেঁচিয়ে পড়া শিখতো। অলেংকা তাকে বিছানায় শুইয়ে রাখার সময় অনেক সময় ব'সে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতো আর বিড়বিড় ক'রে মংগল প্রার্থনা করতো। তারপর সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে স্বপ্নের চোখে ভাবতো; সেই অস্পষ্ট সুদূরের কথা: শাসা পড়াশুনো শেষ করেই একজন বড়ো ডাক্তার হ'য়েছে বা ইঞ্জিনিয়ার; নিজের তার তখন মস্তো কোঠা বাড়ী, গাড়ীঘোড়া, তারপর বিয়ে হোলো, ছেলেপিলে······বারবার ক'রে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে সে, আর তার বোজা চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে থাকে। এদিকে কালো পুশিটি তার গায়ের সংগে লেগে থেকে ঘড়ঘড় শব্দ করে চলে।

হঠাৎ দরজায় একটা জোর শব্দ।

অলেংকা জেগে ওঠে, আশংকায় তার যেন দমবন্ধ হ'য়ে আসে, বুক ধপ্ ধপ্

করতে থাকে ; পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে থাকে। "শাসার মা বুঝি তাকে হারকভে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে·····হায়রে কপাল আমার।"

সে হতাশায় ভেঙ্গে পড়তো ; মাথা, হাত, গা তার সর্বশরীর হিম হ'য়ে যেতো। আর তখন তার মনে হোতো, সারা দুনিয়ার মধ্যেও কেউ তার মতো এমন হতভাগী নেই !

কিন্তু একটা মিনিট পরেই অনেকের গলা শোনা যেতো বাইরে : পশু চিকিৎসক বোধ হয় ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরলো তবে !

"ধন্যবাদ, ভগবানকে ধন্যবাদ !"—সে ভাবতো।

আর ধীরে ধীরে তার বুক থেকে একটা বোঝা নেমে যেতো, সে আবার সুস্থ হ'য়ে উঠ্তো, শাসার কথা ভাবতে ভাবতে বিছানায় ফিরে যেতো। এদিকে পাশের ঘরে সে তখন নিশ্চিন্তে গভীর ভাবে ঘুমুচ্ছে ; আর মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে চীৎকার ক'রে উঠছে,—" তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, বেরোও, বেরোও বলছি, ফের আবার !"

ফিওডর সোলোগাব

(১৮৬৩—১৯২৭)

১৮৯০ থেকেই রাশিয়ায় সুরু হয় আধুনিক সাহিত্য অভিযান ; এর প্রধান উপাদান হোলো সৌন্দর্যবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য। এই আধুনিক দলের বিশিষ্ট রূপ আত্মপ্রকাশ করে রূপক বাদী-দের (সিম্বলিষ্ট) কবিতায়। এবং এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট এবং স্বদেশী লেখক হিসাবে প্রথম আসন হোলো সোলোগাকের। সোলাগাব Prose Symbolicist বা রূপকবাদী গদ্য লেখকদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'দি লিট্‌ল ডেমন' বা 'ক্ষুদে দানব',—অতি বিখ্যাত এক রুশীয় উপন্যাস। উপন্যাসে ঘটনাটির গ্রাম্য জীবনের বাস্তব চিত্রের অন্তরালে রয়েছে সামাজিকের চেয়েও বৃহৎ এক দার্শনিক রূপক।

লেখকের আসল নাম হোলো ফিওডর কুজামিক টেটার্নিকভ। জন্ম পিট্রার্সবার্গে (লেনিনগ্রাড), ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৩। দর্জির ছেলে। তার বাবার মৃত্যুর পর মা ঝির কাজ নেয় এবং তার মনিবই প্রতিপালন করেন সোলোগাবকে। ইনি পিটার্সবার্গে অধ্যয়ন করেন 'টিচারস ইনষ্টিটিউটে' এ ; তারপর মাষ্টারি করেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর, ১৯০৭ পর্যন্ত ; ১৮৯৭ তে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : "অনেক কবিতা ও কয়েকটি গল্প।"

প্রধান রচনা : কয়েক খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থ "সোর্‌সারি অব ডেথ" ; "দি লিট্‌ল ডেমন" (১৯০৭) ; "দি ওলড্‌ হাউস এণ্ড আদার টেলস" ; কয়েকটি নাটকও আছে এঁর।

না-হওয়া খোকার চুমো

—(এক)—

অফিসের একটা কোঠায় ব'সে কয়েকজন লেডি-টাইপিষ্ট্ পট্‌পট্ টাইপ ক'রে যাচ্ছিলো। আঁট-সাট্ জামা পরা ছোট্ট একটি ফিটফাট্ ছেলে—দরজার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বললো :

"নাদেঝ্‌দা আলেক্সেভানা-কে ফোনে ডাকছেন মিসেস কলিমষ্টেকেভা।"

সাতাশ বছরের একটি দীর্ঘ সুগঠিত মেয়ে নীচতলায় নেমে টেলিফোন ধরলো। শান্ত-সংযতভাবে সে হেঁটে আসছিলো। তার মধ্যে জেগে আছে একটা দূর-দৃষ্টি ; গভীর দুঃখ পেয়ে পেয়ে যারা বুক বেঁধে র'য়েছে,—একমাত্র তাদেরি মধ্যে তা মেলা সম্ভব। সে নিজের মনেই ভাবছিলো :

"কি হোলো আবার ?"

আগে থাকতেই জানে সে, তার বোন যদি তাকে কিছু বলতে চায়—তবে নিশ্চয়ই একটা অবাঞ্ছিত কিছু হ'য়ে থাকবে,—বাচ্চাদের অসুখ, তার স্বামী কর্মভারে ভেঙে পড়েছে, অথবা তাদের টাকার টানাটানি বা অমনি আর কিছু। তার নিজেকে সেখানে গিয়ে সব কিছু করতে হবে, —তাদের সাহায্য করা, ব্যথার ভাগ নেওয়া, সব ঠিক ঠাক ক'রে দেওয়া—সবি। তার বোন তার চেয়ে দশ বছরের বড়ো এবং সহর-পল্লীর দূর একটা অঞ্চলে থাকে ব'লে বড়ো একটা দেখা শোনা হয় না।

ছোট্ট টেলিফোন বাক্সটির কাছে এলো সে, সেখানে যেন তামাক, বিয়ার ও তেলা-পোকার মিশ্র গন্ধ ; টেলিফোন টিউবটা তুলে বললো সে—

"হ্যাঁ তানিয়া, তুমি !"

ঠিক যেমন সে ভেবেছে, উত্তরে তার বোনের সেই গলা, অশ্রুভাঙা, অস্থির, উদ্বিগ্ন !

"নাদিয়া, যে ক'রেই হোক, শিগগির এসো। ভয়ানক ব্যাপার হ'য়ে গেছে। সিরেজা আর নেই, গুলি ক'রে মরেছে।"

নাদিয়া খবরটা যেনো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না। তার ছোট্ট বোন-পো ম'রে গেছে—ছোট্ট সুন্দর সিরেজা, শুধু পনেরো যার বয়স! সে ব্যগ্র ব্যস্ততায় ছাড়া ছাড়া ভাবে বলতে লাগলো,—

"কি হোলো তানিয়া? কি সাংঘাতিক! কেনো করলো এমন? কখন হোলো?"

এবং আর কিছু না শুনে বা শুনবার জন্য দেরী না ক'রে তাড়াতাড়ি ব'লে চললো—

"এক্ষুনি আসছি আমি, এই এক্ষুনি।"

টেলিফোন টিউবটা রাখলো সে, এমন কি ঠিক জায়গায় ঝুলিয়ে রাখতে পর্যন্ত খেয়াল রইলো না দ্রুতপায়ে সে মনিবের কাছে ছুটি চাইতে গেলো।

অনিচ্ছাভরে হ'লেও ছুটি দেওয়া হোলো। "তুমি জানো, ছুটির আগটা এখন বিশেষ ব্যস্ততার সময়।"—ম্যানেজার একটু রাগের সুরেই বললেন,—"সবচেয়ে অসুবিধের সময়ই তোমার যেনো ছুটির দরকার হ'য়ে পড়ে। সত্যিই যদি দরকার হয় তো যেতে পারো, কিন্তু মনে রেখো, হাতের কাজটা সেরে রাখবে কিন্তু।"

—(দুই)—

কয়েক মিনিট পরেই নাদিয়া ট্রামে উঠে বসলো,—বিশ মিনিটের পথ। তখন তার বিমর্ষ অস্থির অনিশ্চিত অবস্থা। তার বোনের জন্য মর্মান্তিক করুণা, আর মৃত ছেলেটির জন্য দুঃখ-আক্ষেপ তার বুকের মধ্যটা যেনো একটা বাঁধ দিয়ে ধ'রেছে। ভাবতে তার ভয়ানক লাগছিলো,—এই পনেরো বছরের ছেলেটা—দুদিন আগেও ছিলো যে খুসীতে হাল্‌কা একটি স্কুলের ছাত্র—আজ সে কিনা হঠাৎ আত্মহত্যা ক'রে বসলো!—উঃ মায়ের কী অসহ্য শোক! কী কান্নাই যে কাঁদবে সে, তার জীবনটা আগাগোড়াই যে ব্যথায় বিকল হ'য়ে আছে।

তবু নাদিয়া এম্‌নি ভাবনার মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে ডুবে থাকতে পাচ্ছিলো না, আর কিসের উপরে তার মন যেনো ঘুরে ঘুরে ফিরে আসছিলো। সব সময়েই তার এমন হয়,—অভাবিত ঘটনা ভরা এই জীবনে, দৈনন্দিনের ধরা-বাঁধা দিনগুলির মধ্যে যখনি হঠাৎ কিছু এসে পড়ে। তার জীবনের পেছনেও একটা ঘটনা র'য়েছে—যে ব্যথা নিত্য নিয়ত বুকের মধ্যে কামড় মারছে, দুঃসহ ভারে তাকে ভেঙে ফেলছে। চোখের জলেরো কোনো সান্ত্বনা নেই তার! কবে তা প্রাণের উৎসমূলেই বাধা পেয়ে শুকিয়ে র'য়েছে; ভুলে কখনো দু একটি নিরালা অশ্রু বাঁধ ভেঙে চোখের কাছে ভ'রে আসে মাত্র! সাধারণত, দুনিয়াকে সে নিষ্প্রভ উদাসীনতার চোখে দেখে।

সুখ-বসন্তের সেই দিন গুলিতে যেনো এক উৎসব চ'লে গেছে! তার খুশীতে প্রসন্ন হ'য়ে সমস্ত নীল আকাশ পাখা মেলে দিয়েছে,—তার আনন্দের জন্য শ্রাবণ বরষার সেই রিমি ঝিমি! মাতাল সুরভি দিকে দিকে ছড়িয়ে-দে'য়া পাইন গাছগুলি তার কাছে গোলাপের চেয়েও ভালো লাগে। এখানে গোলাপ ফোটে না, তবু তার সমস্ত প্রাণ এ জায়গাকে আলিঙন ক'রে আছে। আলো ছায়া ভরা গভীর বনের মধ্যে সবুজ-ধূসর শ্যাওলার নরম বিছানা,—আদরের মতো। বনের ঝর্ণাগুলি উল্টে-থাকা পাথর ও নুড়ির উপর দিয়ে আধো আধো ভাঙা ভাঙা কথা ক'য়ে ফেনিল হাসিতে ছুটে চলেছে—আর্কেডির নদীর মতো! তাদের শীতল স্পর্শ কী আনন্দের, কী যে শান্তি ভরা!

ভালোবাসার ভরা জোয়ারে দিনগুলো কত দ্রুত যে ভেসে চ'লে গেলো! এলো শেষের দিন, সে জানতো না সেই যে শেষের দিন। নির্মল নীল আকাশ, স্বর্গের হাসি ফুটে আছে যেনো! চারদিকেই শুধু আনন্দ! সুরভিত পাইন বন, ছায়া-ঢাকা তার প্রশস্ত বনপথ কী শান্তি ও স্বপ্নে ভরা; পায়ের তলে নরম শ্যাওলার আদর-করা আতপ্ত স্পর্শ। চারিদিকের সমস্ত কিছুই ঠিক আগের মতোই। শুধু পাখীরা গান গাইছে না,—তারা নীড় বেঁধে কচি শিশুদের নিয়ে কোথায় উড়ে চ'লে গেছে।

কিন্তু তার প্রিয়তমের মুখের উপরে কেমন কালো ছায়া!—সেদিন ভোরে একটা অশুভ চিঠি পেয়েছে সে।

নিজেই যা বলেছে:

"একটা খারাপ খবর, যে ক'রেই হোক আমাকে যেতে হবেই। কাজেই, অনেকদিন পরে আবার তোমার সংগে দেখা হচ্ছে।"

"বুঝিয়ে বলো আমায়!"—সে বলেছিলো। তখনো তার মনে ঘা লাগেনি।

"বাবা লিখেছেন, মা রোগ শয্যায় এবং এখনি আমার বাড়ী যাওয়া উচিত।"

তার বাবা একেবারেই স্বতন্ত্র কিছু লিখেছেন—কিন্তু নাদিয়া অবশ্যি তা জানে না। এখনো সে বোঝেনি যে তার ভালোবাসায় প্রতারণা থাকা সম্ভব —যে ওষ্ঠ দিয়ে সে চুমো পিয়েছে, তাতে সত্য ছাড়া অন্য কিছুও থাকতে পারে!

সে তাকে দুই-বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে ওষ্ঠে ওষ্ঠ রেখে বলেছিলো:

"আমাকে যেতেই হবে, এছাড়া অন্য আর কোনো পথ নেই। কী একাই লাগবে আমার! একটা খুব সাংঘাতিক কিছু যে হ'য়েছে তা আমি মনে করি না—কিন্তু বাধ্য হ'য়েই আমাকে যেতে হচ্ছে।"

"হাঁা, নিশ্চয়ই!"—সে বললো, "তোমার মা যদি অসুখে প'ড়ে থাকেন, কী ক'রে দেরী করবে তুমি। রোজ একটি ক'রে চিঠি দিও কিন্তু; তুমি যাওয়ার পরের দিনগুলি আমার কী ক'রেই যে কাটবে!"

বরাবরের মতোই সে তার সংগে বড়ো রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গেলো; তারপরে বনের পথ দিয়ে বাড়ী ফিরে এলো—বুকভরা বিদায়ের ব্যথা। কিন্তু নিশ্চিতই জানে, সে ফিরে আসবে। এবং সে আর ফিরে এলো না।

তার কাছ থেকে দুটো কি তিনটে চিঠি সে পেয়েছিলো—বিচিত্র রকম, অদ্ভুত চিঠি, জড়ানো প্যাঁচালো তার ভাষা, অর্দ্ধস্বচ্ছ অনুভূতিতে ভরা, কিছু কিছু ইংগিত যার কিছুই সে বুঝে উঠ্‌তে পারেনি। তারপর, আর নয়। নাদিয়া এবার বুঝতে আরম্ভ করলো যে সে তাকে আর ভালোবাসে না। এবং গরমের শেষে একদিন হঠাৎ পথের একটা আলোচনা থেকে শুনলো যে সে বিয়ে করেছে।

"কেনো, শোনোনি তুমি? এই তো গেলো হপ্তায়। তারা নিছ-এ গিয়ে ফুলশয্যা ক'রে এলো।"

"হ্যাঁ, আচ্ছা ভাগ্য ভদ্রলোকের! খুব ধনী একটি সুন্দরীকেই বিয়ে করেছে।"

"মেয়েটি অনেক যৌতুক পেয়েছে, নিশ্চয়ই !"

"তা তো বটেই, তার বাবা........."

তার বাবা কি দিয়েছে তা শুনবার জন্ম নাদিয়া আর অপেক্ষা করলো না ; সে এদিকে চলে এলো।

সব কিছু অনেক সময়ই মনে পড়েছে তার। সে যে মনে ক'রতে চেয়েছে তা নয়, স্মৃতিকে চাপা দিয়ে আড়াল ক'রতেই চেষ্টা করেছে,—অতীতকে একেবারেই ভুলে যেতে চেয়েছে। সেই সমস্ত কিছুই এতো শোকের ও এতো অপমানের—এবং তা থেকে তার যেনো কোনদিনই আর মুক্তি নেই ! আর তখন—সে আর কাউকে বিয়ে ক'রেছে একথা জানার পরের দুর্ভার দিনগুলিতে—তার অজস্র চুমোর স্মৃতিতে আপনার-হওয়া বনের এই মধুর জায়গা গুলিতে ব'সেই—সে একদিন নিজের মধ্যে তার শিশুর স্পন্দন অনুভব করলো ;—এবং নতুন একটি জীবনের ভাবনার সাথে সাথেই এলো মৃত্যুর সংকেত। না, কখনো তার সন্তান হ'তে পারবে না !

বাড়ীর কেউ কোনো কথা জানে না,—পালিয়ে যাওয়ার কোন অছিলা খুঁজে নিলো থেকে সে। নানা দিক থেকে যেমন ভাবেই হোক পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা সে জোগাড় ক'রে নিয়ে গেলো এবং সব বন্দোবস্তও হ'য়ে গেলো।—কেমন ক'রে সে কক্ষনো ভাবতে চায় না। তারপর, বাড়ী ফিরে এলো,—দুর্বল রোগা, ফ্যাকাশে মুখ, ক্লান্ত দেহ,—তবু তার ব্যথা ও ভয়কে ঢেকে রাখার চেষ্টায় মনের একটা দৃঢ় শক্তি জাগ্রত !

স্মৃতি যে কতোবার ক'রে সব কিছু তার সামনে এনে ধরতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু নাদিয়া কিছুতেই আর তাদের কোন জোর স্বীকার ক'রবে না। যখন একটি ঝলকের মতো সমস্ত মনে পড়তো—ভয়ে শিউরে উঠতো সে, জোর ক'রে মুখ ফিরিয়ে রাখতো, তৎক্ষণাৎ সে দৃশ্য থেকে অন্য দিকে দৃঢ়ভাবে মন দিতো।

কিন্তু তার প্রাণের মধ্যে একটি স্মৃতির টুকরো সে মাণিকের মতো লুকিয়ে রেখেছে ; একটি শিশু ছিলো তার, তার নিজেরি,—যদিও কোনদিন সে মাটির বুকে এসে দেখা দেয়নি ! কিন্তু প্রায়ই সে তার সামনে দেখতে পেতো—একটি শিশুর মুখ ; এতো সুন্দর অথচ কী ভয়ংকর !

যখনি সে একলা থাকে, নিজেকে নিয়ে নিরালায় একটু বসে, আর চোখ দুটি বুঁজে আসে—শিশুটী অমনি চ'লে আসে তার কাছে। যে যেনো বেশ অনুভব করে চাঁদের মতো দিন দিন সে বড়ো হ'চ্ছে। এমন স্পষ্ট ক'রে সে তাকে দেখতে পায়,—সময় সময় মনে হ'য়েছে যে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তার শিশুকে সে নিজের কোলের কাছে নিয়ে থেকে এসেছে। তার জন্য দুটি বুক তার দুধে ভরে আসে! হঠাৎ কোন শব্দ শুনলে সে কেঁপে ওঠে,—তার খোকন বুঝি পড়ে গিয়ে ব্যথা পেলো!

সময় সময় সে হাত দুটি বাড়িয়ে দেয়, খোকনের সোনালি রঙের কোঁকড়ানো নরম চুলে হাত বুলোবে ব'লে—তার হাতের একটু স্পর্শ পাবে,—তাকে আরো বুকের কাছে টেনে নেবে ব'লে। কিন্তু সব সময়েই সে তার স্পর্শ এড়িয়ে যায়, মায়ের হাতখানি বাতাসে এসে লাগে!—কিন্তু তখনো সে ঠিক শুনতে পাচ্ছে তার কচি গলার হাসি, যেনো সে এখনো কাছে কাছে, চেয়ারটার পেছনেই লুকিয়ে আছে কোথাও!

তার মুখখানা সে ঠিক দেখতে পাচ্ছে—যে কখনো আলোতেই আসেনি, তার সেই সন্তানের মুখ। স্পষ্টই চিনতে পারে সে, এ সেই অংগ, সেই গঠন—যে তার ভালোবাসা তুলে নিয়ে পথের ধুলায় ছুঁড়ে ফেলেছে, তার প্রাণ কেড়ে নিয়ে নিঃশেষে তার সমস্ত রস পান ক'রে এখন ভুলে গেছে, সেই তার অংগ-গঠন,—যে এতো সব সত্বেও তার নিজের অংগে অংগে এতো আপনার হ'য়ে আছে!

বড়ো বড়ো ধূসর চোখ, ঢেউ-খেলানো সোনালি চুল, ওষ্ঠ ওচি বুকের ভাঁজ সবি তার বাবার। ফুলেলি ঝিনুকের মতো ছোট্ট কান দুটি, নিটোল বাহু, গোলাপ-ফোটা গালের টোলটুকু এসব তার নিজেরি।

তার ছোট্ট দেহটির সবটুকুই তার জাবা,—সবটুকু!

আর, তার ছেলেমানুষী ভাব ভংগী! কী ক'রে সে হাতটুকু তোলে, কেমন ক'রে একটির পর একটি পা ফেলে বাবার হাত ধ'রে ধ'রে—যাকে সে কখনো দেখেনি। তার হাসিটি ঠিক তার নিজেরি ঠিক তারি মতো ভংগীতে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে দিয়ে ফুটফুটে মুখখানা কেমন ঘিব্রত ও রাঙা হ'য়ে ওঠে!

কী ব্যথা ভরা সেই মধুর স্মৃতি! তার শিশুর নরম গোলাপী আঙুল যেনো তার বুকের

গভীর ক্ষতের উপরে এসে লাগে ;—এতো আদরের, তবু কী নিষ্ঠুর ! এতো নিবিড় যন্ত্রণার, কিন্তু তবু কখনো ভুলেও তাকে সে সরিয়ে দিতে চায় না।

"খোকন আমার, আমার না-হওয়া খোকন ! তোকে ছাড়া পারিনে আমি, আর যে পারি নে ! শুধু যদি তুই বেঁচে থাক্‌তি ! তোকে যদি আমি প্রাণ দিতে পারতাম !"

কারণ, এ সমস্তই স্বপ্ন-জীবন শুধু ! এ যে একান্ত তারি মাত্র। না-হওয়া খোকন তো হাসতে পারে না, কাঁদতেও পারে না। সে আছে, তবে নিজের কাছে নয়। জীবন্তের জগতে,—লোকজনের আর পৃথিবীর সমস্ত কিছুর মাঝখানে—সে নেই, তার কোন অস্তিত্বই নেই ! এতো প্রাণময়, এতো আদরের, এতো সুন্দর, আর তবুও সে নেই !

নাদিয়া নিজের কাছে বলতে থাকতো, এমনটা তো আমারি জন্য ! এখন সে ছোট্টটি, বোকা,—বোঝেনা কিছুই ! কিন্তু যখন বড়ো হবে—সবি জানবে, জীবন্ত সব খোকাখুকুর সঙ্গে নিজেকে তুলনা ক'রে দেখবে, সত্যিকার জীবনে বেড়ে উঠ্‌তে চাইবে, এবং তখন সে আমাকে দোষ দেবে, মন্দ বলবে, আর আমি মরতে চাইবো।"

বাস্তব চোখে এই সবি যে কী বোকামি—একটিবারও সে ভাবে না। একথা কল্পনাই করতে পারে না যে তার পরিত্যক্ত না-হওয়া শিশুটির মধ্যে কোনো জীবন্ত আত্মারই স্থান নেই ! না, না,—নাদিয়া এলেক্সিভানার কাছে তার না-হওয়া সন্তান বেঁচে আছে, এবং সীমাহীন অশেষ দুঃখে নিত্যনিয়ত তার প্রাণে ঘা দিয়ে দিয়ে ফিরছে।

তার কাছে সে একটি প্রদীপ্ত দীপের মতো, ঝকমকে পোশাক এঁটে পরা, ছোট্ট দুটি শুভ্র হাত, ছোট্ট দুটি পদ্মের মতো পা, নির্মল সরল চোখ, পবিত্র হাসিটুকু ! কী খুশীভরা সে হাসি, গানের মতো মিষ্টি !

যখনি তাকে সে বুকে জড়িয়ে ধরতে চায়,—খোকনও পালিয়ে ফেরে, তা সত্যি—কিন্তু বেশী দূরে তো সে চ'লে যায় না, প্রত্যেক বারেই কাছেই কোথাও লুকিয়ে পড়ে ! তার আলিংগন থেকে সে ছুটে পালিয়ে যায়, কিন্তু তা হ'লে কি হবে ? যখনি সে চুপ ক'রে নিরালায় চোখ বুজে ব'সে থাকে—খোকন এসে যেনো তার কচি হাত দুটি দিয়ে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে, তার পাঁপড়ির মতো ওষ্ঠ দুটি তার গালে চেপে ধরে। কিন্তু একবারটিও সে তার ওষ্ঠে চুমো দেয়নি।

"বড় হ'লে বুঝবে"—সে ভাবলো। "তখন দুঃখ পাবে এবং কোথায় চ'লে যাবে, আর ফিরে আসবে না কখনো। তারপর, ম'রে যাবো আমি!"

নাদিয়া তখন কোলাহলভরা ভীড়-ঠাসা ট্রামগাড়ীতে বসা, চারপাশে অজানা লোকজন, একে অন্যকে ঠেলে ঠুলে যাচ্ছে আসছে—তখনো নাদিয়া এলেক্সিভানা দুই চোখ বুজে ব'সে আছে, মনে করছে তার শিশুকে। আবারো সে তার নির্মল নীল চোখে তাকিয়ে রইলো, আবারো শুনতে লাগলো তার সেই ভাঙা ভাঙা আধো আধো কথা······পথের শেষ পর্যন্ত সমস্তক্ষণ। তারপর সে গাড়ী থেকে নামলো।

—(তিন)—

ট্রাম থামলে নাডেঝ্‌দা এলেক্সিভানা তুষার-ঢাকা রাস্তা ধ'রে বরাবর চ'লতে লাগলো,—নীচু কাঠের বাড়ী, পাথরের বাড়ী পেরিয়ে, সামনের বাগান-ক্ষেত ও দূর-পল্লীর বেড়া-দেওয়া জায়গাগুলি ছাড়িয়ে চলতে লাগলো। নিঃসংগ একেলা সে। আরো অনেক পথিকের সঙ্গে দেখা হয়েছে,—কিন্তু কেউই তার সংগী নয়! হাঁটতে হাঁটতে সে নিজের মনেই ভাবছিলো :

"আমার পাপ চিরদিনই আমার সাথে সাথে থাকবে; কখনো আর তা থেকে দূরে যেতে পারবো না। আমি সেই থেকে যে বেঁচে আছি,—কিন্তু কেনো? এমন কি ছোট্ট সিরেজাও তো ম'রে গেছে।"

একটা স্তব্ধ ব্যথা তার বুকের মধ্যটা যেনো থাবা দিয়ে চেপে ধরেছে। সে নিজের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারলো না :

"কেনো যে আমি দিনের পর দিন বেঁচে চলেছি? তবুও মরবো কেনো?"

আবার তার মনে এলো :

"আমার প্রাণের খোকন, সব সময়েই আমার সাথে সাথে আছে। কিন্তু এখন সে দিন দিন বড়ো হ'চ্ছে; আট বছর হোলো তার, এবং এখন তার সবি বোঝার সময়। আমার উপর রাগ কচ্ছেনা কেনো, খোকন? কেনো সে রাগ কচ্ছেনা? তার বাইরে

যেতে কি ইচ্ছে হয় না,—সেখানে গিয়ে সব শিশুদের সংগে খেলবে; ছোট্ট স্লেজ গাড়ীটিতে চ'ড়ে জমাট তুষারের উপর দিয়ে চ'লে যাবে। শীতের এতো সব সুন্দর দৃশ্যে তার কি মন ভোলে না? আমার তো এ সবি এতো ভালো লাগে! এতো ছায়া-মায়া থাকা সত্বেও পৃথিবীটা কি সুন্দর? কী আকর্ষণে ভরা! এও কি সম্ভব যে এমন বাস্তবের মধ্যে সে এসে বাঁচতে চায়না?"

তারপর নিঃসংগ-একেলা বরাবর এক পথে যেতে যেতে ভাবতে লাগলো তাদের কথা, এখন যাদের সে দেখতে এসেছে। অতিরিক্ত শ্রমে ভেঙে-পড়া তার ভগ্নীপতি, তার কর্মক্লান্ত বোন, খিটখিটে একঘর ছেলে মেয়ে, এটা-নয় সেটা নয় সব সময়েই কোঁদল বেঁধে আছে; দারিদ্রে-ভাঙা পাঁজর বের করা ঘর, টাকা পয়সার টান! সে তার আদরের বোন-পো, বোনঝিদের মনে করলো, এবং সিরেজাকে, যে গুলি ক'রে ম'রেছে।

কে ভাবতে পেরেছে সে যে গুলি ক'রে মরবে? ওঃ, এতো খুসী, এতো প্রাণময় ছিলো ছেলেটা!

এবং এবার তার মনে পড়লো গেছে সপ্তাহে তার সংগের সব কথা! সেদিন সিরেজা বিষন্ন ও বিপর্যস্ত হয়েছিলো। পত্রিকা থেকে সে কয়েকটা ঘটনা পড়ে শুনিয়ে তারপর বলেছিলো:

"বাড়ীতে যেদিকে তাকাও, সব খারাপ যাচ্ছে, সব দিকেই অন্ধকার! আর, পত্রিকায়ও দেখবে শুধু ভয়ানক লজ্জাকর ঘটনার পর ঘটনা!"

নাদিয়া তখন এমন কিছু বলেছিলো,—যা নিজেরি বিশ্বাসে বনেনা,—শুধু ছেলেটির মন ফেরাবার জন্যই বলেছিলো। সিরেজা একটু গম্ভীর হ'য়েই হেসে বলেছিলো,—

"কিন্তু মাসী, কি বিশ্রী কাণ্ডই যে হ'চ্ছে চারদিকে! একবার ভাবো শুধু: আমাদের চারিদিকের নিত্যকার দশা। একজন বিশিষ্ট মানুষ, বুড়ো, খুব বুড়ো সে—সোজা বাড়ী থেকে সে চ'লে গেলো—মরবার মতো একটা ঠাঁই খুঁজতে।—কী সংঘাতিক না? কারণ, স্পষ্টতই সে আমাদের চেয়ে আরো ভালো ক'রে চারপাশের ভয়াবহ অবস্থা দেখেছে এবং এ সমস্ত সহ্য করতে কিছুতেই আর বাঁচতে চায়নি। কাজেই, সে গিয়ে মরলো। ওঃ, কী ভয়ানক!"

একটুকাল চুপ ক'রে থেকে সে আবার বলতে লাগলো :

"নাদিয়া মাসী ! ঠিক যা ভেবে রেখেছি ; বলছি তোমাকে ; কারণ তুমিই আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসো এবং তুমিই সব বুঝবে। পৃথিবীতে যেখানে এমন ব্যাপার ঘটে, সেখানে কখনো আমি বাঁচতে চাইনা। জানি আমি, আর দশজনের মতোই আমি দুর্বল, আর কী করবারই বা আছে ? কেবলমাত্র পলে পলে তিলে তিলে সমস্ত কিছুই সহ্য ক'রে যাওয়া ? মাসী ! নেক্রাসফ ঠিকই বলেছেন—"ছোটো থাকতে ম'রে যাওয়াই ভালো।"

নাদিয়ার মনে আছে, এই ছেলেটার জন্যে সে উদ্বিগ্ন হ'য়ে ছিলো এবং অনেকক্ষণ ব'সে তার সংগে কথা বলেছিলো। মনে হোলো শেষ পর্যন্ত সে যেনো বুঝলোও। সেই আগের মতো মিষ্টি হেসে হাল্‌কা গলায় বলেছিলো :

"ও ! আচ্ছা বেশ, আমরা সবাই বেঁচে তো থাকি, তারপর দেখবো। অগ্রগতি ঠিক এগিয়েই চলেছে, আমরা শুধু তার লক্ষ্যপথ ঠিক ধরতে পারি না।"

আর সেই সিরেজা আজ বেঁচে নেই—আত্মহত্যা ক'রেছে। কাজেই সে বেঁচে থাকতে চায়নি, দেখতে চায়নি প্রগতির সমারোহপূর্ণ সম্মুখ-অভিযান ! তার মায়ের এখন কী অবস্থা ? হয়তো সিরেজার ছোট্ট মোম-ফ্যাকাশে হাতে চুমো খাচ্ছে ; অথবা হয়তো ক্ষিদেয়-কাঁদা শিশুদের জন্য রাতের খাবার তৈরী কচ্ছে। তারা নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গিয়ে কাঁদছে, ছেঁড়া পুরোনো ময়লা পোশাকে তাদের কী করুণই দেখাচ্ছে। হয়তো বা তাদের মাও বিছানায় প'ড়ে কাঁদছে—অবিশ্রান্ত অবিরল ধারায় কাঁদছে। নারী, ভাগ্যবতী নারী,—যদি প্রাণ খুলে কাঁদতে পেরে থাকো। চোখের জলের সান্ত্বনার চেয়ে দুনিয়ায় কী আর এমন মধুর ?

•

—(চার)—

শেষ পর্যন্ত নাডেঝদা এলেক্সিভানা তার বোনের বাড়ী এসে পৌছলো এবং সিঁড়ি দিয়ে পাঁচ তলায় উঠে এলো। পাথরে-গড়া সরু একটা সিঁড়ি, খুব খাড়া,—এবং সে এতো তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এসেছে, ঠিক যেনো দৌড়ে ; হাঁপাতে লাগলো সে। ভেতরে

যাবার আগে দম নেবার জন্য দরজার বাইরে থামলো সে। গভীর ভাবে শ্বাস পড়ছিলো তার,—দস্তানা-দেয়া হাতে সে কাছের একটা থাম ধ'রে নিলো।

দরজাটা মোটা কাপড়ে ঢাকা, তার উপরে অয়েলক্লথ দেয়া এবং এই অয়েলক্লথেরই কালো কালো সরু সরু ফালি দিয়ে তৈরী করা একটা ক্রুশ চিহ্ন; কিছুটা সম্ভবত সাজানোর ভংগীতে, কিছুটা ধর্মবিশ্বাসের যোগে। একটা ফালির অর্ধেকটা ছিঁড়ে নীচে ঝুলে আছে এবং তার পিছনে অয়েলক্লথের একটা গর্তের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আছে ধূসর ময়লা কাপড়টা। কী জানি কোনো কারণে, এই দৃশ্যটা হঠাৎ নাদিয়ার কাছে বড়ো করুণ, বড়ো মর্মান্তিক মনে হোলো। তার ঘাড় কুঁচকে কেবল উপরে নীচে উঠতে নামতে লাগলো এবং দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত ভাবে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। গায়ে যেনো তার একটু শক্তিও আর নেই। দুয়ারের পাশে উঁচু সিঁড়িটায় ব'সে প'ড়ে সে কাঁদতে লাগলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুহাতে মুখ ঢেকে সেখানে একঠাঁয়ে ব'সে রইলো; উষ্ণ অশ্রুর স্রোত ব'য়ে চললো তার দস্তানার উপর দিয়ে।

সিঁড়িটায় তখন অন্ধকার, খুব ঠাণ্ডা, কোথাও একটি শব্দ নেই,—সামনের দরজা গম্ভীর বোবার মতো দাঁড়িয়ে। অনেক সময় ধ'রে কেবল কাঁদলো সে……তখন হঠাৎ সে একটি পরিচিত পায়ের হালকা শব্দ শুনতে পেলো এবং প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে এবার যেনো অনুভব করলো,—তার খোকন কাছে এসে দুটি হাত দিয়ে ধীরে ধীরে তার গলা জড়িয়ে ধরলো, গালটুকু তার গালে চেপে রাখলো এবং তার নরম ছোট ছোট আঙুলগুলি দিয়ে মায়ের মুখখানি ঢেকে-রাখা হাত দুটি সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। এবার সে তার দুটি ওষ্ঠ তার গালের উপরে রেখে ধীরে ধীরে বললো:

"কাঁদছ কেনো? তুমি তো কোনো অন্যায় করোনি!"

নীরবে সে ব'সে ব'সে শুনতে লাগলো; একটু নড়তে বা চোখ খুলতে পর্যন্ত তার সাহস হোলো না;—কি জানি, তার খোকন যদি চ'লে যায়? ডান হাতটা সে হাঁটুর উপর এনে রাখলো, কিন্তু তখনো বাঁ হাত দিয়ে তার চোখ ঢাকা। ক্রমে তার কান্না শান্ত হ'য়ে এলো; তার,—এই পাপিষ্ঠা নারীর কান্না দিয়ে তার খোকনকে সে ভয় লাগিয়ে দেবে না।

এবার খোকন তার গালে চুমো খেতে খেতে বলছিলো,—"কোনোই অন্যায় করোনি তুমি।"

তারপর আবারো সে বলতে লাগলো ; এখন তার গলায় যেনো সেই সিরেজার কথা :

"এ পৃথিবীতে বাঁচতে চাইনে আমি। মা, মাগো—সত্যি তোমাকে আমার ধন্যবাদ।"

এবং আবারো :

"সত্যিই মাগো, আমি একটুও বাঁচতে চাই নে।"

সিরেজা যখন এই কথাই বলেছে—তার কানে তা ভয়ানক শুনিয়েছিলো, ভয়ানক, কারণ এমন একজনে তা বলেছিলো—অদৃশ্য বিধির কাছ থেকে সম্পূর্ণ মানব জীবন পাবার পর তাকে মহামূল্য রত্নের মতো যার রক্ষা করা উচিত ছিলো—এবং তাকে স্বেচ্ছায় নষ্ট করা যার মোটেই উচিত হয় নি।

কিন্তু এখন ওই কথাই এই পৃথিবীতে কোনদিন না-হওয়া তার শিশুর কাছ থেকে শুনে মায়ের বুক থেকে একটা ব্যথার ভার নেমে এলো। ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে, পৃথিবীর কণ্ঠস্বর শুনে সে যেনো ভয় না পায় এমন ভাবে জিজ্ঞেস করলো সে :

"খোকন, আমাকে ক্ষমা ক'রেছো বলো ?"

এবং সে তখন উত্তর শুনতে পেলো :

"কোনোই অপরাধ করোনি। তবু যদি আমার কাছ থেকে শুনতে চাও তো বলছি : "ক্ষমা করেছি তোমাকে।"

এবং হঠাৎ তার সমস্ত প্রাণ যেনো একটা নতুন সুখের শিহরণে ভ'রে উঠ্‌লো। কোন আশা করতেও সাহস হয় না, কী যে হবে তা কিছুই বুঝতে পারছে না—এমন অবস্থায় সে ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে দুহাত বাড়িয়ে দিলো এবং অনুভব করলো যে খোকন তার হাঁটুর উপরে উঠে বসলো, তার ছোট হাত দুটি তার কাঁধের উপরে রাখলো, দুটি ওষ্ঠ তার ওষ্ঠের উপরে এসে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর একটি মধুর চুমোতে লেগে রইলো।

তখনো তার চোখ নিবিড় ভাবে বোঁজা ; কারণ, পৃথিবীর মানুষের ভাগ্যে যা দেখবার নয়—সেদিকে তাকাতে কেমন ভয় লাগছিলো তার ; তবু তখনো যেনো তার মনে হচ্ছিলো, শিশুর চোখদুটি তার দুটি চোখে অপলক ভাবে তাকিয়ে আছে—তার মৃদু

নিশ্বাস আশীর্বাদের মতো এসে তার সমস্ত গায়ে লাগছে—এবং সে তার উপরে ভরা চাঁদের মতো আলো ক'রে আছে।

তারপর, ছোট্ট বাহু দুটি যেনো তার গলা থেকে খুলে পড়লো, সিঁড়ি দিয়ে ছোট্ট দুটি পায়ের হাল্‌কা শব্দ শুনতে পেলো সে ; বুঝলো যে খোকন তার চ'লে গেছে।

এবার সে উঠে চোখের জল মুছে নিয়ে কলিং বেল্‌ টিপলো। সে যখন ভেতরে তার বোনের কাছে এলো,—তখন প্রশান্ত, সুখী সে। তার মধ্যে আবার যেনো সান্ত্বনা ও বল-ভরসা জোগাবার শক্তি ফিরে এসেছে।

এলেকজাণ্ডার কুপ্রিন

(১৮৭০—১৯৩৮)

১৮৯০-এর পর থেকেই রাশিয়া দেশে সুরু হয় নতুন জাগরণ। মার্কসবাদ নিয়ে আসে বিদ্রোহের বিজয় বাণী। গোর্কি ও কুপ্রিন এই সময়কার; কিন্তু কুপ্রিন পুরোনো পন্থী। কুপ্রিন শিক্ষা পেয়েছেন মস্কোতে, চার্চ স্কুলে। তারপর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত রুশ সৈন্য-বিভাগে কাজ করেন—দীর্ঘ সাত বছর। তারপর প্রিয় সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। কুপ্রিনের প্রথম গল্পগুলির মধ্যে তার সৈন্য জীবনের অভিজ্ঞতাই রসদ জুগিয়েছে। প্রথম গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু 'দ্বন্দযুদ্ধ' গল্পটি (১৯০৫) প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত লেখক হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে পারেন নি; এবারে তিনি র‍্যাডিকালদের প্রিয় হ'য়ে ওঠেন। বিদ্রোহের সময় ছিলেন বলশেভিক-বিরোধী এবং শ্বেত সৈন্যদলের পরাজয়ের পরে চ'লে যান ফ্রান্সে।

লেখকের অসংখ্য গল্প চোদ্দো খণ্ডে সম্পূর্ণ; শেখভের পরের সবচেয়ে প্রিয় গল্প-লেখক হলেন কুপ্রিন। হাস্য, বিদ্রূপ ও করুণ বিচিত্র রসে সমৃদ্ধ এঁর রচনা। এঁর গল্প রাশিয়ায় বিশেষ জনপ্রিয়। অপ্রিয়ের উপরে তীক্ষ্ণ ব্যংগ দেখা যায় এঁর রচনায়; এবং ব্যংগ-বিদ্রূপের প্রয়োগ হয় সাধারণত কোনো মতবাদ, প্রতিষ্ঠান বা সমাজ-শ্রেণীর উপরে, যেমন: ন্যায়বিধান-যন্ত্র, নৃত্য-গীত, শেষ কথা। বিষয়বস্তুও জীবন থেকেই গৃহীত এবং লেখক স্বপ্নের চেয়ে বরং বাস্তবের পক্ষপাতী। সাধারণ রুশ-রচনা যেমনটা হ'য়ে থাকে তা না হ'য়ে এঁর গল্প ঘটনা-মূলক এবং গতিশীল,—সূক্ষ্ম-মার্জিত ভাষার চেয়ে বরং স্পষ্টতার পক্ষপাতী।

রচনা: ব্রেসলেট অব গরনেট্স; সাশা (১৯২০); জীবন-নদী (১৯১৬); একজন প্রাজ্ঞ (১৯১৬); ইয়ামা—পতিতা জীবনের বিখ্যাত উপন্যাস।

শেষ কথা

ভদ্র মহোদয়গণ, আমিই তাকে হত্যা ক'রেছি। আমার জন্য একটা সাময়িক মস্তিষ্ক-বিকৃতির সার্টিফিকেট আনতে বৃথাই আপনারা চেষ্টা করছেন। আমি এরকম কোনো সুযোগ নেবো না। আমি তাকে স্থিরভাবে, বিবেচনা ক'রে, নির্মম হ'য়ে হত্যা করেছি—একটি কণাও অনুশোচনা, ভয় বা দ্বিধার স্থান নেই সেখানে। যদি আপনাদের ক্ষমতা থাকতো তাকে বাঁচিয়ে তুলবার—আবারো আমি তাকে হত্যা করতাম।

সে সব সময় সবখানে আমার পিছু লেগে ছিলো। হাজার রকম মানুষের রূপ ধরে সে এবং অবস্থা বুঝে এমন কি মেয়েদের আবরণে পর্যন্ত গা ঢাকা দেয়,—এ হেন নির্লজ্জ জীব সে! আমার আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সহকর্মী, আমার পরিচিত সমস্ত লোকের ছদ্মরূপ নেয় সে, যে কোনো বয়সের চেহারা সে অবিকল নকল ক'রতে পারে—একমাত্র শিশুর ছাড়া; কেবল এখানেই সে ব্যর্থ, একেবারেই বেমানান। তাকে দিয়ে সে আমার সমস্ত জীবন আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে, বিষাক্ত ক'রে রেখেছে।

সবচেয়ে মারাত্মক কথা,—সব সময়েই আমি তার প্রত্যেকটি কথা, প্রতিটি ভংগী, প্রত্যেকটি কাজ আগে থাকতেই ঠিক ধারণা ক'রে নিতে পারি।

তার সংগে দেখা হ'লেই সে আমার হাতটা তার হাতের মধ্যে জোরে চাপ দিয়ে ধ'রবে ও টেনে টেনে বলবে:

"বাঃ, এ—এ কাকে দেখছি! তাই তো বলি, বেশ বড়োই হ'য়ে গেছো। তা ভালো তো?"

তারপর, নিজে নিজেই উত্তর দিতে থাকবে—যদিও একটি কথাও আমি জানতে চাই নি:

"আচ্ছা,—এক রকম চলছে? তাহ'লে আর কী করলে? হ্যাঁ, পড়েছো আজকের পত্রিকা?..."

একবার হঠাৎ যদি সে দেখতে পেয়েছে যে আমি লাল হ'য়ে উঠছি,—তার সংগে দেখা হবার অস্বস্তিতে ঘামিয়ে উঠছি—তবে সে কক্ষণো বলতে একটুও ভুল ক'রবে না :

"ইস, কি রকম লাল হ'য়ে যাচ্ছো যে!" যখন আমার ঘাড়ের উপর হাজার কাজের ভার—ঠিক সেই সময়টি বুঝেই সে আমার কাছে আসবে ও ঘনিয়ে ব'সে বলবে :

"ভয় হ'চ্ছে, তোমার কাজে বুঝি বাধা দিলাম? পুরো ঘন্টা ধ'রে তার কথা, তার ছেলে বৌ-এর কথা ব'লে ব'লে আমাকে যেনো সে মেরে ফেলবে। আমি চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে, ওষ্ঠ কামড়ে ধ'রে রক্ত বের ক'রে ফেলি,—আর সে ব'সে ব'সে আমার যন্ত্রণা দেখে আমোদ পায়!

সমানে পুরো একটা মাস কাজে আর মন লাগাতে না পারি, এমন ব্যবস্থা আগে থাকতেই ক'রে রাখবে সে। এবার উঠে পড়বে, ছোট্ট একটা হাই তুলবে, মোড়ামুড়ি দিয়ে বিড়বিড় ক'রে ব'লবে :

"বেশতো, এখানে কথা নিয়ে জ'মে ব'সে আছি? অনেক কাজই যে প'ড়ে র'য়েছে!"

রেলগাড়ীর কামরায় দেখা হ'লে প্রত্যেকবারই সে এই ব'লে সুরু করে :

"আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি, কতোদূর যাচ্ছেন?"

"কোনো কাজে, না··· ?"

"কোথায় চাকরী করেন আপনি?"

"বিয়ে করেছেন?"

আমি তার সব চাল-চরিত্র চিনে রেখেছি। চোখ বুঁজে তাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। সে আমার ঘাড়ে, পিঠের উপর, হাঁটুতে হাত চাপড়াতে থাকে। আমার নাক-চোখের উপরেই এমন সব ভাব-ভংগী করে যে ক্রমশই আমি সংকুচিত হ'য়ে আসি,—এখনি যেনো কোনো আঘাত এসে পড়বে। কোটের কলার ধ'রে আমাকে সে তার কাছে টেনে আনবে, আমার সমস্ত মুখের উপর তার ভ্যাপ্‌সা নিশ্বাস ছাড়বে; বাড়ীতে দেখা ক'রতে এসে টেবলের-ল্যাম্পের শেড্‌টা শব্দ ক'রে ক'রে কাঁপাতে থাকে। বেশ জ'মে-বসা দিনে সে আমার চেয়ারের পিঠে বেতালে আঙুল বাজিয়ে চলে এবং আলাপের ফাঁকে ফাঁকে টেনে টেনে বলে—"আচ্ছা, আচ্ছা, তারপর?" তাসে ব'সে সে

উঁচু উঁচু ডাক ছাড়ে, টেবলের উপরে সোৎসাহে চাপড় মারে এবং হারলেই যেনো লাফ দিয়ে ওঠে—"হ্যাঁ, তাতে কি, কি, কি আর হোলো ?"

কোনো যুক্তিতর্ক আরম্ভ করো তার সংগে—সর্বদাই সুরুতে তার :

"এ দোস্ত, বলছো কি সব, মাথা খারাপ ?"

"মাথা খারাপ কেনো ?"—তুমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করবে।

"কারণ, মানে হয়না কোনো।"

এর কী করেছি ? জানি না আমি। আমার সমস্ত জীবন সে বিষিয়ে দিতে লেগে গেছে ; তার কৃপায় এখন চাঁদ, মলয়, কবিতা, ছবি আর গান—সব কিছুর উপরেই আমার দারুণ বিতৃষ্ণা। "টলষ্টয় ?"—সে জোরে জোরে বলতে থাকবে নিজের ভাষায় এবং ছাপার অক্ষরে—"টলষ্টয় তার জমিদারী তার স্ত্রীকে দান ক'রে গিয়েছিলো। সে নিজে টুর্গেনিভের সংগে তুলনায়···আর তার জুতো সে নিজেই তৈরী করতো···আমাদের রাশিয়া-ভূমির বিখ্যাত লেখকগণ···সাবাস !" "পুশকিন ? তিনি একেবারে ভাষাই সৃষ্টি ক'রে গেছেন, তাই না ? মনে পড়ে আপনার—'নিস্তব্ধ য়ুক্রেন রাত, নির্মল আকাশ।' মনে আছে, সেই তৃতীয় অংকে মেয়েলোকটিকে নিয়ে কি ক'রেছিলো তারা ? স্‌স্‌···ভাগ্যিস্‌, কোনো মেয়েলোক নেই এখানে ! মনে পড়ে ?

"আমরা চলেছি ছোট তরনীর পরে,
তরনীর নীচে জলেরা কাকলী করে।"

"ডষ্টোভস্কি···পড়েছো। একদিন রাতে টুর্গেনিভের কাছে তিনি স্বীকার করতে গিয়েছিলেন যে···আর গোগোল,—জানেন, কী বিশ্রী ধরনের রোগ ছিলো তার ?"

কখনো যদি চিত্র-প্রদর্শনীতে যাই—এবং প্রশান্ত সন্ধ্যার প্রান্তরের এক ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বিভোর হ'য়ে দেখি—নিশ্চিতই সে তখনো আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে। আমাকে গলা জড়িয়ে ধ'রে সামনে ঠেলা দিয়ে সে তার সংগিনী মেয়েটিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে থাকে :

"কী সুন্দর আঁকা…দেখেছো দূরত্ব-জ্ঞান, আবহাওয়া!…চাঁদটা ঠিক যেনো সত্যি… নীনাকে মনে আছে না? 'নেভা' পত্রিকার সেই চিত্র-সংখ্যায়,—অনেকটা যেনো ঠিক এমনি……"

সিনেমায় 'কারমেন' শুনছি। সেখানেও সে, সর্বত্রই। আমার পিছনে ব'সে সে আমার চেয়ারের তলের রডটায় পা রেখেছে। শেষ অংকের ডুয়েটটি গুণ্‌গুণ্‌ করছে, আর তার পায়ের সাহায্যে তার দেহের সমস্ত কম্পন আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

তারপর, বিশ্রামের ফাঁকে গলা এমন চড়িয়ে বলতে থাকে—আমি যাতে স্বচ্ছন্দেই শুনতে পাই:

"জাডোভাডভদের গ্রামোফোন রেকর্ডগুলি কী চমৎকার? ঠিক যেনো শালাপিন, কোনো তফাৎই ধরতে পারবে না!

হ্যাঁ, সে বা তার মতো কেউই ব্যারেল অর্গান উদ্ভাবন করেছে এবং গ্রামোফোন, বায়স্কোপ, ফোটোফোন, বাওগ্রাফ, ফনোগ্রাফ, মোটোর গাড়ী, কাগজের কলার, অলিওগ্রাফ এবং সংবাদপত্র।"

তার আওতা থেকে পালাবার কোনই পথ নেই। রাতে আমি উন্মুক্ত সমুদ্রতীরে চ'লে আসি এবং একটা পাহাড়ের শিলাতে নিরালায় একটু শুয়ে থাকি,—কিন্তু সেই অন্ধকারেও সে পা টিপে টিপে আমার পিছু নেয়। হঠাৎ একটি আত্মতৃপ্ত স্বর এই স্তব্ধতার বুকে একটা আঘাতের মতোই এসে পড়ে! সে বলতে থাকে:

"বাঃ, কী সুন্দর রাত! ক্যাটেংকা, তাই না ক্যাটেংকা? মেঘেরা—আঃ, চেয়ে দেখো একবার,—ঠিক যেনো আঁকা ছবি! একজন চিত্রকর যদি ঠিক অমনি ক'রেই আঁকতো—কেউ কি বলতো,—'ঠিক সত্যিকার প্রকৃতির মতো হ'য়েছে'?"

আমার জীবনের সবচেয়ে পরম মুহূর্তগুলি সে মাটি ক'রে দিয়েছে—ভালবাসার লগ্ন, যৌবনের উতলা মধুর রাতগুলি! কতোবার প্রকৃতির কোনো অপরূপ ছবির বুকে ডুবে গিয়ে আমি মুগ্ধের মতো ঘুরছি বনবীথি দিয়ে; সেখানে মাটির বুকের উপর রূপোলী জ্যোছনা গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলপনার মতো আঁকা হ'য়ে আছে। আর তখনো সে

আচম্‌কা, একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই মেয়েলি কণ্ঠে আমার কাছে কথা ক'য়ে উঠবে, আমার কাঁধে তার মাথা এলিয়ে দেবে এবং সুন্দর অভিনয়ের মতো বলতে থাকবে :

"তুমি বলো, ভরা জোছ্‌নায় স্বপন দেখতে তুমি ভালোবাসো ?"

অথবা—

"এই প্রকৃতির রূপে নয়ন ভোলে তোমার, তুমি বলো আমাকে ? আমার কথা ব'ললে—প্রকৃতিকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি।"

বহুরূপী সে, বহুমুখী, আমার সেই সর্বনাশা ; কিন্তু তলে তলে সে বরাবরই একরকম। অবস্থা বিশেষে সে নানা ছদ্মবেশ ধরে,—অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, লেডি-ডাক্তার, এ্যাড্‌ভোকেট, ছাত্রী, গ্রন্থকার, এক্‌সাইস ইনস্পেক্টরের স্ত্রী, অফিসার, যাত্রী, ক্রেতা, অতিথি, অচেনা, দর্শক, পাঠক, পল্লী গৃহস্থের প্রতিবেশী ! প্রথম বয়সে বোকার মতো ধারণা ছিলো আমার,—এরা বুঝি বিভিন্ন লোক। কিন্তু এরা এক এবং অনন্য। তিক্ত জর্জরিত অভিজ্ঞতায় শেষে আমি তার নাম খুঁজে পেয়েছি। সে হ'চ্ছে, রাশিয়ার বুদ্ধিজীবির দল—"শিক্ষিত সম্প্রদায়"।

যদি কখনো এমন হ'য়েছে যে তার সংগে চাক্ষুষ দেখা হ'লো না—তবে সর্বত্র সে রেখে গেছে তার চিহ্ন, তার ভিজিটিং কার্ড। বাচু ও মাচু কার উন্নত চূড়ায় দেখেছি তার কমলা নেবু খাওয়া খোসা, তার নোনতা-মাছের টিন, আর চকোলেট-কাভারের কাগজ। এ্যালুপ্‌কা পাহাড়ে সেণ্টজনের উঁচু ঘণ্টা-ঘরে, স্ফটিকময় ইমাত্রায়, বক্‌চিচারিতে, লারমন্‌টভের গহ্বরে—তার যতো সব নামাংকন ও মন্তব্য :

"পুশিয়া—কুজিকি ১৯০৮ বৎসর ২৭ ফেব্রুয়ারী"

"আইভানফ"

"পিকোয়া মেয়ে"

"আইভানফ্"

"এম্, ডি,···পি, এ, পি···তালোট্‌কা ও আকমেট্"

"আইভানফ্"

"ট্রফিম সিনপুপক, সামোয়া সহর"

"আইভানফ"

"এ্যাডেল সোলোভিটচিক, মিন্‌স্ক থেকে"

"আইভানফ"

"এই উঁচু চূড়া থেকে সাগর দেখে খুব খুসী হ'লাম—ইতি সি নিকোডিমাস আইভানফ বেজুপ্রিকনি"।

"আইভানফ"

আমি সমস্ত ভিজিটিং বুক-এ তার কবিতা ও মন্তব্য দেখেছি এবং লারমণ্টভের চূড়ায়, পুশ্‌কিন-ভবনে ও প্রাচীন গির্জায় তার লেখা পড়েছি,—"পেন্‌জা থেকে ট্রোকাফস্‌-এ আমরা এসে ব'সেছি, সুরাপান ক'রেছি, ষ্টার্জণ মাছ খেয়েছি,—আপনারাও খেতে পারেন।" অথবা, "রাশিয়ার বিখ্যাত কবি চিচ্‌কিনের চিতাভস্ম দর্শন করেছি,—ইতি হস্তলিপির শিক্ষক, ভরোনেজ বালক-বিদ্যালয়।"

অথবা :—

"সাবাস্‌, আই পিত্রি, সাদা পাহাড়!
ফারগাছের রাজপোশাক গায়ে যার,
গতকাল আমি উঠেছি শিখরে তব।
ইতি—রিটায়ার্ড ষ্টাফ ক্যাপটেন নিকোলাই প্রোফার।"

আমার প্রিয় যে কোনো একখানা রাশিয়ান বই খোলামাত্র অমনি আমি তাকে সেখানে দেখতে পাই : "এই বইটা পড়েছি—পাফেণ্টেংকো" "লেখক একটি গাধা।" "শ্রীমান গ্রন্থকার কার্ল মার্কস পড়েন নাই।"—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে আসে পাশে তার 'নোট-করা' দেখি। তবে এটা বোধ হয় নিশ্চিতই যে, তার মতো কেউ বই-এর পাতা দুভাঁজ ক'রে, কোন ভেংগে বা পাতাশুদ্ধই ছিঁড়ে নিতে পারে না, বা তেলের দাগ লাগাতে পারে না।

ভদ্রোমহোদয়গণ, বিচারপতিবৃন্দ, তার এমনি যতো সব কার্যকলাপ বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার যা কিছু প্রিয়, প্রাণের কাছের, যা কিছু কোমল-মধুর, যা কিছু সাধনার সবি সে বিষিয়ে রেখেছে, কদর্য ক'রে তুলেছে।

নিজের সংগে যুদ্ধ করেছি অনেক। বছরের পর বছর কেটে গেলো এবং ক্রমেই আমার মেজাজ খারাপ হ'য়ে দাঁড়ালো। বুঝলাম যে দুনিয়ায় আমাদের দুজনেরই স্থান হ'তে পারে না, একজনকে স'রতেই হ'বে।

অনেকদিন থেকেই দেখছিলাম যে একটু কিছুতেই আমাকে ভয়ানক অপরাধের দিকে ঠেলে দেবে। হোলোও তাই।

আপনারা জানেন সব বিস্তৃত বর্ণনা। কামরায় একদম ঠাসা-ভিড়, যাত্রীরা এ ওর ঘাড়ের ওপর বসা। তিনি, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে—স্কুলে শিশুবিভাগের ছাত্র—তিনজনে একগাঁট মালপত্তর নিয়ে চারটা সিট দখল ক'রে বসে আছেন। এইবারে তার লোক-শিক্ষা-বিভাগীয় পোশাক পরা। আমি তার কাছে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম:

"একটা সিট হ'বে এখানে?"

তিনি যেনো নিজেকে নিয়েই ব্যাপৃত আছেন, এমন ভাবে উত্তর দিলেন,—আমার দিকে একবার তাকালেন না পর্যন্ত!—"না, এখানে এক ভদ্রলোক ব'সেছেন। দেখছেন না এ জিনিসগুলি তাঁরই? এক্ষুনি তিনি ফিরবেন।"

ট্রেণ চলতে লাগলো।

সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় ১০ মাইল এসেছি।

ভদ্রলোক ফেরেন নি। চুপ ক'রে গেলাম এবং এই ভদ্র বক্তার মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলাম,—ভরসা ছিলো যে এর মধ্যে বিবেক ব'লে কিছু একটু আছে নিশ্চয়।

কিন্তু না। ট্রেণ আরো পনেরো মাইল পেরিয়ে একটা ষ্টেশনে এলো। খাবার ঝুড়ি বের ক'রে খেতে আরম্ভ করলেন তিনি, গরম জল আনতে একটা কেটলি নিয়ে বাইরে গেলেন এবং নিজেই চা তৈরী করলেন। চায়ের চিনি নিয়ে একটা ছোটো খাটো ঘরোয়া ঝগড়া বেঁধে গেলো।

"পিটার, তুমি এক ফাঁকে একটা মোচা চিনি নিয়েছো?"

"তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, ভগবানের দোহাই নেইনি। বিশ্বাস না হয়, পকেট খুঁজে দেখো।"

"দোহাই তুলোনা, আর মিথ্যাও বলো না। আগেভাগে বুঝেই আমি ঠিক এই উদ্দেশ্যেই গুনে রেখেছিলাম—রওনা দেবার আগে···১৮টা ছিলো এখন আছে ১৭টা।

"ভগবানের নাম ক'রে বলছি।"

"ভগবানের দোহাই তুলো না। মিথ্যা কথা খুবি লজ্জাকর। সব ক্ষমা ক'রবো আমি, সোজা সত্যটা ব'লে ফেলো। কিন্তু মিথ্যা ব'লেছো কি জীবনে কখনো ক্ষমা নেই। ভীরু কাপুরুষেরাই মিথ্যা কথা বলে। যে মিথ্যা কথাই ব'লতে পারে সে না পারে কি? খুন, চুরি, রাজদ্রোহিতা, মাতৃভূমির কাছে বিশ্বাসঘাতকতা—সবি সে পারে······"

ক্রমাগত তিনি এমনি ক'রেই ব'লে যাচ্ছিলেন—আমার ছোটবেলায় আমি এমন অনেক কথা তার মুখে শুনেছি—সে যখন আমার শিক্ষয়িত্রী ছিলো, পরে ক্লাসের মাষ্টার এবং আরো পরে সে যখন পত্রিকায় লিখেছে। বাধা দিলাম আমি,—

"আপনি আপনার ছেলেকে দোষ দিচ্ছেন মিথ্যা কথার জন্য, আর আপনি নিজেই তার চোখের সামনে একটা ডাহা মিথ্যা কথা বলেছেন! আপনি ব'লেছেন এই সিট এক ভদ্রলোকের। কৈ সেই ভদ্রলোক? আমাকে দেখানে দেখি?"

বক্তাকারী এবার বেগুনে হ'তে হ'তে কালো হ'য়ে উঠলেন, তার চোখ বড়ো হ'য়ে উঠ্‌লো।

"আপনাকে অনুরোধ কচ্ছি, আপনার গায় যে পড়েনি তার গায়েও পড়তে যাবেন না। নিজেরটা দেখুন মশাই! কী ভয়ানক, কী অভদ্রতা! গার্ড, আপনি একবার শুনিয়ে দিন যে রেলকামরাতে ব'সে ভদ্রলোকদের এমন ধারা অসুবিধে করা চলবে না; প্রতিবিধান করুন এর। নইলে নিজেই আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি, এখুনি অভিযোগ-পত্রে লিখে রাখছি।"

গার্ড কিন্তু শান্তভাবেই চোখ ঘুরিয়ে বাইরে চ'লে গেলো। কিন্তু বক্তাটি তখনো তৃপ্ত হন নি, জোরে জোরে জের টেনে চলছেন।

"আপনার সংগে কেউই যায় নি কথা বলতে, কেউই আপনার গায়ে এসে পড়ে নি। হায় ভগবান, তাইতো! দেখতেও তো বেশ ফিটফাট, ভদ্রলোকটি, টুপি, কলার!—

একেবারে স্পষ্টই দেখাচ্ছে একজন শিক্ষিত দলের···কিষাণ বা মজুর নয়···শিক্ষিতই একজন।"

শিক্ষিত! আমার হত্যাকারীই নিজে আমাকে হত্যাকারী নাম দিয়েছে! সব ঠিক হ'লো এবার।······তার মৃত্যুদণ্ড সে নিজেই উচ্চারণ ক'রেছে।

ওভার-কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা টেনে নিলাম—দেখলাম ভর্তি আছে কিনা। বক্তাটির দুই ভুরুর মাঝে লক্ষ্য নিয়ে স্থির ভাবে বললাম—"শেষ প্রার্থনা ক'রে নাও।"

ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়ে সে চীৎকার করে উঠলো, "গা—র্ড······" এই তার শেষ কথা এবং আমিও গুলি ছুঁড়লাম।

আমার শেষ হ'য়েছে, ভদ্রমহোদয়গণ। আবারো বলছি আমি কোনো অনুশোচনা নেই আমার! তার জন্য আমার প্রাণের মধ্যে এককণাও দুঃখ নেই। একটি মাত্র বিষম সন্দেহ তবু জেগে আছে এবং মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তা আমার পিছু পিছু ঘুরবে—তাদেরো কি একেবারে শেষ ক'রে দেবো, জেলে বা একটা পাগলা গারদে?

একটা ছেলে রয়েছে তার। সে যদি আবার তার বাবার প্রকৃতি পায়?

লিলাক গুচ্ছ

নিকোলাই আলমাজফ তার স্ত্রীর দোর খুলে দেবার জন্য আর দেরী করলোনা,—হ্যাট্‌কোট্‌ পরা অবস্থায়ই সোজা চলে এলো লাইব্রেরী ঘরে। কুঞ্চিত ভুরু আর দাঁত-চাপা ওষ্ঠ দেখেই তার স্ত্রী বুঝলো যে ভয়ানক একটা কিছুই ঘটে থাকবে।

নীরবে সে পিছু পিছু এলো তার। আলমাজফ লাইব্রেরী ঘরে এসে একটুকাল দাঁড়িয়ে রইলো, বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে রইলো ঘরের কোনের দিকে, তারপর মেজেতে ছুড়ে ফেলে দিলো হাতের ফাইলটা। কাগজ পত্তরগুলি ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। নিকোলাই এবার ধপ ক'রে ব'সে পড়লো আরাম কেদারাটায় এবং আঙুল মোচড়াতে লাগলো উদভ্রান্তের মতো।

বেচারা এক সৈন্য বিভাগের অফিসার,—অফিসারদের শিক্ষায়তনে যোগ দিয়ে সে বক্তৃতা শুনছিলো কিছুদিন থেকেই; আজো এই মাত্র ফিরলো তার ক্লাশ থেকে। আজ সে প্রফেসারের কাছে দেখাতে গিয়েছিলো এই অঞ্চলের একটা ম্যাপ-চিত্রণ; এবছরের হাতের কাজের মধ্যে এটাই হোলো সবচেয়ে দরকারী পাঠ।

এপর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় ভালোই করেছে সে। কী যে খাটুনি গেছে তার,—সে জানেন একমাত্র ভগবান, আর তার স্ত্রী .... সেই সব কথা বলতে গেলে,—প্রথমে তো এই একাডেমিতে ঢোকাই হ'য়ে দাঁড়ালো এক অসম্ভব ব্যাপার। পর পর দুবছরই সে ফেল করলো একেবারে হতাশরকম,—তৃতীয় বারেই সংকল্প ও ধৈর্য ব'লে বাধা বিপত্তি কাটিয়ে উঠেছে। অবশ্য, পেছনে তার স্ত্রী না থাকলে এতো পরিশ্রম করার উৎসাহ কিছুতেই সে বজায় রাখতে পারতোনা, হাল ছেড়ে দিতো কবেই। কিন্তু ভিরোট্‌কা তাকে ভেঙে পড়তে দিতোনা, সব সময়েই বল-ভরসা জোগাতো সে। প্রত্যেক দোষ ত্রুটি ও হতাশার সামনেই সে দাঁড়াতো এসে উজ্জ্বল আশার মতো—এমনকি আনন্দের মতোই। প্রত্যেকটি অসুবিধাই আপন ক'রে নিয়ে এগিয়ে দিতো সে সবরকম ছোটখাটো সাহায্য,—মানসিক পরিশ্রম ক'রতে হোলে কতো রকম জিনিষই তো হাতের কাছে পাওয়া

দরকার। সে নিজেই একাধারে হোতো তার সেক্রেটারী, লিপিকারী, পাঠক, শ্রোতা এবং তার নোট্‌বুক পর্যন্ত!

একটুকাল সব নিস্তব্ধ নীরব,—কেবলমাত্র তাদের দেয়ালের পুরোনো ঘড়িটার একটানা বিরক্তিকর শব্দ এক দুই তিন্‌-ন্‌ ন্‌। প্রথম দুটো টিক্‌টিক্‌ শব্দ, তৃতীয়টা যেনো ভাঙা কাসার উপরে হাতুড়ির ঘা। আলমাজফ তখনো সেই হ্যাটকোট পরা অবস্থায়ই একদিকে মুখ ফিরিয়ে ব'সে আছে চেয়ারে…দুহাত দূরেই ভিরোট্‌কা, সেও নীরব; তার সুন্দর উন্মুখ মুখখানিতে স্পষ্ট ব্যথার ছায়া। অবশেষে সে-ই এবারে কথা বললো, ধীরে সহৃদয় সাবধানে, কোনো কঠিন রোগীর সামনে মেয়েরা যেমন কথা বলে।

"কোলিয়া, তোমার আঁকা সেই ম্যাপটারই কি কিছু হ'য়েছে? ভালো হয়নি বুঝি?"

কোলিয়া ঘাড় কোঁচকালো শুধু, কোনো কথা বললো না।

"ওটা বুঝি ভালো হয়নি, কোলিয়া! বলো তুমি, দুজনে মিলেই আলোচনা করা দরকার।"

আলমাজফ স্ত্রীর দিকে ফিরে খিট্‌খিটে ভাবে রাগতই যেনো বলতে লাগলো,—কোনো অপমান অনেকক্ষণ ধ'রে হজম করতে থাকার পরে কেউ যেমন ব'লে থাকে:

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ফেরৎ দিয়েছে,—এবারে হোলো তো? চোখ দিয়ে দেখ্‌ছো না? গেছে, চুলোয় গেছে সব, যতো সব জঞ্জাল!"—সংগে সংগেই পা দিয়ে ঠেলে দিলো সেই ফাইলটা—"এই জঞ্জালগুলি চুলোয় ফেলে দিলেই চুকে যেতো ল্যাঠা! একাডেমি,—একাডেমি,—এখন হোলো তো তোমার একাডেমি! সামনে মাসেই চ'লে যাচ্ছি আমি সৈন্য বিভাগে। কী অপমান! আর তাও শুধু একটা জঘন্য দাগের জন্য…যাক্‌, গোল্লায় যাক সব!"

"কিসের দাগ, কোলিয়া?"—বললো ভেরা—"এ বিষয়ে শুনিনিতো কিছু।"

এবারে সে কোলিয়ার চেয়ারটারি পাশে ব'সে হাতখানি রাখলো তার কাঁধের উপরে। কোলিয়া ঠেলে দিলো না, কিন্তু তখনো সে আহতভাবেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঘরের এক কোনে।

"কোন দাগ কোলিয়া ?"—আবারো সে জানতে চাইলো।

"সে সাধারণ একটা দাগ,—সবুজ রংয়ের একটা দাগ। তুমি তো জানো, কাল রাত দুটো অবধি জেগে জেগে ম্যাপ আঁকা শেষ করেছি। খসড়াটা হ'য়েছিলো চমৎকার,—প্রত্যেকেই দেখে প্রশংসা করেছে। কিন্তু, কালরাতে ওখানটায় ব'সে কাজ করতে করতে খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়লাম, কখন যে হাতটা নড়ে গিয়ে দাগ পড়লো একটা, মস্তোই বড় একটা······তুলে ফেলতে চেষ্টা করলাম······কিন্তু সে আরো বিশ্রী হ'য়ে গেলো। দুহাতে মাথা আঁকড়ে ধ'রে ভাবলাম ব'সে—এখন উপায় ? ভেবে ভেবে ঠিক করলাম একগোছা গাছ এঁকে দেই।······কাজটা হোলো এমন নিখুঁত, ধরবার আর সাধ্য নেই যে কোনোরকম দাগ ছিলো সেখানে। তারপর, আজ সেটা নিয়ে গেলাম প্রফেসরের কাছে। 'বেশ, বেশ',—বললেন তিনি—'চমৎকার হ'য়েছে ; কিন্তু—এখানকার ওগুলি কি, লেফটানেণ্ট ? এই ঝোপটা এলো কোত্থেকে ?' তখন অবশ্যি আমারই বলা উচিত যে ব্যাপারটা কি ? হয়তো, তিনি একটু হাসবেনই মাত্র······না, না, যে কড়া পণ্ডিত তিনি, আরো জার্মান,—কোনোই লাভ হবেনা। কাজেই বললাম—'কয়েকটা গাছ রয়েছে ওখানে ?' 'না, না, সে হ'তেই পারেনা,—এসব জায়গার নাড়ীনক্ষত্রও চেনা আমার ! কোনো গাছ ওখানে থাকতেই পারেনা।' আমি বলি—'হ্যাঁ, ঠিকই আছে।' কাজেই কথা কাটাকাটি হোলো খুব। সেখানে কয়েকজন অফিসার ব'সে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। প্রফেসর শেষে বললেন—'আচ্ছা বেশ ! তোমার বিশ্বাস যদি দৃঢ়ই থেকে থাকে, কাল ভোরেই সেখানে চলো আমার সংগে, তখন দেখা যাবে। প্রমাণ ক'রে দেবো যে এক নয় তুমি কাজ করেছো অসাবধান হাতে, অথবা মস্তো বড়ো বিশদ মানচিত্রের জায়গায় করেছো ইঞ্চি-মাপের মানচিত্র !···' "

"কিন্তু এতো নিশ্চিন্ত তিনি হ'লেন কি ক'রে যে কোনোই ঝোপ নেই সেখানে।"—ভেরা বলে।

"কি যে বলো !—বোকার মতো প্রশ্ন করো কেন ? প্রায় বিশ বছর ধ'রে দেখে দেখে জায়গাটা তাঁর মুখস্তই হ'য়ে গেছে,—নিজের ঘরের চেয়েও ভালোভাবে চেনেন এসব।

সারা দুনিয়ায়ও এমন সাংঘাতিক পণ্ডিত আর দ্বিতীয়টি নেই···আচ্ছা জার্মান···অবশ্য হাতেনাতেই ধরা পড়বে আমার ভুল, তাই কথা কাটাকাটি কচ্ছিলাম······”

কথা বলতে বলতে এতোক্ষণ ধরেই একাগ্রভাবে সে এ্যাশ-ট্রে থেকে পোড়া দেশলাই কাঠি তুলেছিলো, আর টুকরো টুকরো ক’রে ভাঙছিলো। কথা শেষ ক’রে এবারে সেগুলি সে ছুড়ে দিলো মেজেতে। নিকোলাই অবশ্যি শক্ত মানুষ, তবু তার অবস্থা প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ার মতো। তার মুখ দেখেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছিলো।

ভিরোট্‌কা তখন বললো—“শোনো কোলিয়া, এখুনি যেতে হবে আমাদের, তাড়াতাড়ি করো, তৈরী হ’য়ে নাও চট্‌ ক’রে।”

নিকোলাই মুখ কুঞ্চিত ক’রে ছিলো শুধু,—যেনো ভয়ানক একটা যন্ত্রনা পাচ্ছে সে।

“ভেরা, যা খুসী বলছো পাগলের মতো? ভেবেছো, গিয়ে একটু ক্ষমা চাইলেই ব্যস্‌ মিটে গেল সব। ভেবেছো তাই, না? সে হবে শাস্তি চাওয়ারই নামান্তর। বুঝলে, বোকামি করোনা বলছি!”

“বাঃ রে, বোকামি কিসের?”—ভেরা জোর দিয়ে বলতে থাকে। “কেউই বলছে না তোমাকে গিয়ে ক্ষমা চাইতে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারোনা তুমি,—সেখানটায়ই যদি কোন গাছপালা নাই বা থাকে, সোজা গিয়ে কতোগুলি লাগিয়ে দিলেই হোলো।”

“কি লাগিয়ে দেবো, গাছ?”—নিকোলাইর চোখ স্থির হ’য়ে যায়।

“হ্যাঁ—কয়েকটা লাগিয়ে দেবো। কথা যদি সত্যি না ব’লে থাকো, সত্যি ক’রে নিলেই হোলো। চলো শিগগির ক’রে, আমার টুপিটা দাও তো···আর কোটটা··· না, না, ওখানে না—আল্‌নায়···ছাতাটা আবার গেলো কোথায়?”

আলমাজফের কোনো আপত্তিই কানে তুলছিলো না সে। কাজেই সেও উঠে ভেরার টুপি ও কোট খুঁজছিলো,—ভেরা এদিকে ড্রয়ার খুলে বের করলো নানা রকম ছোট ছোট বাক্স ও কেস্‌।

“ইয়ার-রিং···না, ও সুবিধের হবেনা। কারোর উপর জুলুম ক’রে লাভ নেই তো! হ্যাঁ ঠিক আছে,—এই যে হীরা বসানো আংটিটা। তা একদিন আবার কিনলেই হবে,—

ওটা ছাড়তে প্রাণে লাগছে আমার। ব্রেসলেট? তা—ওটার দামই বা হবে আর কতো—, পুরোনো, যে রকম দুমড়ে গেছে······কোলিয়া, তোমার সিগারেট কেসটা কোথায়?"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভেরার সমস্ত মূল্যবান জিনিষপত্রই ভর্তি হ'য়ে গেলো তার ব্যাগের ভিতর। ভেরা ঠিকঠাক হ'য়ে নিয়ে চারদিকটা দেখে নিলো আবার,—দরকারী কিছু যদি ফেলে গিয়ে থাকে!

"চলো এবার!"—সংকল্পের মতোই বললো সে। "কিন্তু যাবো কোথায়?"—আলমাজফ আবারো আপত্তি করতে চাইলো—"তা ছাড়া, এখুনি তো অন্ধকার হ'য়ে আসবে; আর, সে জায়গাও তো পুরো আট মাইল দূরে।"

"আচ্ছা বোকা দেখছি, আগে এসো না?"

প্রথমেই গেলো তারা বন্ধকী এক দোকানে। অনেকদিন থেকেই দেখে দেখে পাকা হ'য়ে গেছে দোকানদার, মুখের চেহারা দেখেই ঠিক ধ'রে নেয় সে,—কারোর উপর এককণাও সহানুভূতি জাগে না তার, বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিখুঁত নজরে দেখে সে; জিনিসের মূল্য ঠিক করতেই এতোটা সময় নিলো যে ভেরার তো মাথাই গরম হ'য়ে উঠ্‌লো। সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার,—লোকটা এসিড্ দিয়ে পরীক্ষা করলো তার আংটিটা, আর ওজন নিয়ে দাম বললো মাত্র তিন রুব্‌ল!

"একদম খাঁটি যে এটা!"—ভেরা বেচারী ব'লে উঠ্‌লো—"আস্তো পঁয়ত্রিশটি রুব্‌ল দিয়ে কেনা, আর কিনেও ছিলাম শস্তায়ই।"

বন্ধকী-দোকানদার এমন ভংগীতে চোখ বুজে রইলো, যেনো স্পষ্টতই বিরক্ত হ'য়ে যাচ্ছে।

"তা, দেখুন আমার কাছে সবি সমান।"—আর একটা জিনিষ ইতিমধ্যেই নিক্তিতে তুলে বলছিলো সে,—"পাথরের কোনো কারবারই নেই আমার,—শুধু ধাতুটা, হ্যাঁ!"

ভেরা কিন্তু এবারে আশ্চর্যই হ'য়ে গেলো, পুরোনো তার দুমড়ানো ব্রেসলেটটারি দাম হোলো বেশী! সব মিলে পেলো তারা ২৩ রুব্‌ল,—এতোটা লাগবেও না তাদের।

এক মালীর বাড়ী তারা এসে পৌঁছলো।

পিটার্সবার্গের শুভ্র রাত তখন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত আকাশে; হাওয়ায় হাওয়ায় রূপোলি

আলোর ঢেউ। এই মালী একজন চেক। এইমাত্রই সে বাড়ী এসে ঘরের সবাইকে নিয়ে খেতে বসেছে। নিকোলাইদের অনুরোধ শুনে তো সে অবাক! আর তা ছাড়া, —আর তা ছাড়া এতো রাতে কোনো অর্ডার নিতে পারে না সে। সে ভাবলো, নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে এরা। তাই ভেরার বারবার অনুরোধ সত্বেও শুষ্ক ভাবেই সে বললো—

"দুঃখিত আমি,—এতোরাতে মজুরদের কাজে পাঠাতে পারিনা; কাল ভোরে,—হাঁ, সানন্দেই ক'রে দেবো আপনার কাজ।"

সেই কালো দাগের সমস্ত কাহিনীটা না ব'লে তখন আর কোনো উপায় নেই; ভিরোটকাই বললো সব। প্রথমে সন্দেহ বশতই শুনছিলো সে এবং মনটা বে-মোড়েই দাঁড়িয়ে ছিলো। কিন্তু ভেরা যখন এবার তার মতলবটা খুলে বলতে লাগলো—কয়েকটা গাছের ঝোপ মাঠটাতে লাগিয়ে দিলেই হবে,—মালীটা আরো মনযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো, সারা মুখে অনুমোদনের হাসিও খেলে গেলো কয়েকবার।

"ও, এই তো! তা এ আর একটা বেশী কি?"—ভিরোটকার মুখে সমস্তটা শুনে এবারে সে রাজী হ'য়ে গেলো,—"কোন রকমের ঝোপ চান আপনি?"

কিন্তু তার বাগানের গাছপালার মধ্যে ঠিক লাগসই চোখে পড়লোনা একটাও, তবে, একমাত্র লিলাক ঝোপটাই চলতে পারে তবু।

আলমাজফ বৃথাই তার স্ত্রীকে বারবার অনুরোধ কচ্ছিলো বাড়ী ফিরে যেতে। সমস্ত পথই জোর ক'রে তার স্বামীকে সংগে নিয়ে এলো সে এবং সমস্তক্ষণ দেখলো ব'সে সেই ঝোপটা লাগানো, এটা সেটা নির্দেশও দিলো মজুরদের, নিজ হাতে দেখিয়েও দিলো সব। ভেরা যখন দেখলো যে ঝোপের নীচের ঘাস ও চারপাশের ঘাস আলাদা ক'রে আর চেনা যায় না—তখনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে সে বাড়ী ফিরতে রাজি হোলো।

······পরের দিন ভোরে প্রতীক্ষায় ছটফট্ করছিলো ভেরা,—স্বামীকে অনেক দূর থেকে দেখেই সে বাইরে ছুটে গেলো। অনেকদূর থেকেই তার স্বামীর চলনের হাল্‌কা ভংগী চোখে পড়তেই ঠিকই বুঝতে পারলো সে, বিপদ কেটেছে তা হ'লে।·········

সত্যই, নিকোলাইর সর্বাংগ ধূলিভরা, ক্লান্তিতে হাঁটতে পারছেনা সে……কিন্তু বিজয় গৌরবে মুখখানি তার উজ্জ্বল।

"চমৎকার ভেরা!"—স্ত্রীর অধীর উন্মুখ মুখখানি দেখে হাত দশেক দূর থেকেই ব'লে উঠলো সে।—"ভাবো ব্যাপারখানা আমরা দুজনে তো গেছি সেই ঝোপটার কাছে,—প্রফেসর ফিরে ফিরে দেখতে লাগলেন,—এমন কি একটা পাতা ছিঁড়ে চিবিয়ে দেখলেন পর্যন্ত। 'ওটা কি গাছ'—জানতে চাইলেন তিনি।"

"দেখুন, নাম জানিনা তো"—আমি বললাম।

"ছোটো বার্চ বোধ হয়—" বললেন তিনি।

"হ্যাঁ, সম্ভবত, তাই……।"

প্রফেসর তখন হাত দুখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। "দেখো লেফটানেণ্ট, তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আমি।"—তিনি বলছিলেন—"সত্যিই তাহ'লে বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছি, ঐ ঝোপটার কথাটা ঠিক মনে ক'রেই উঠতেই পারিনি।" চমৎকার মানুষ এই প্রফেসরটি, সত্যিকার জ্ঞানীলোক; তাকে ঠকালুম বলে দুঃখই লাগছিলো আমার। আমাদের প্রফেসরদের মধ্যে এমন আর একটিও নেই; তার জ্ঞান দেখলে অবাক হ'য়ে যেতে হয়, দেখেই প্ল্যান করে ফেলেন, অথচ একেবারেই নিখুঁত! সত্যিই আশ্চর্য মানুষ।

কিন্তু এসব বর্ণনা শুনবার জন্য মোটেই উদগ্রীব নয় ভেরা। বারবার ক'রে সে শুনতে চায় ঐ ঝোপগুলির কথা প্রফেসর নিজে কী বললেন। খুঁটিনাটি সব কিছুই শোনার জন্য উদগ্রীব সে,—প্রফেসরের মুখের ভাবটা তখন কি রকম, বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছেন একথা বলার সময় তার গলা শোনাচ্ছিলো কেমন এবং কোলিয়ারই বা তখন কি রকম লাগলো…

হাত ধ'রে হাসতে হাসতে এমন ভাবে হাঁটতে লাগলো তারা—যেনো সমস্ত পথেই দুজনে একা! পথিকেরা দাঁড়িয়ে থেকে দেখছিল, এমন জোড়াটি আর কেউ কখনো দেখেনি!

সেদিনের মতো এমন আরামে নিকোলাই কোনদিনই আর ভোজন সুখ উপভোগ

করেনি। খাওয়ার পরে ভেরা লাইব্রেরী ঘরে তার স্বামীকে চা দিতে এলো ও হঠাৎ দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়েই হেসে উঠ্‌লো। "বাঃ রে, হাসলে কেনো?"—ভেরা জিজ্ঞেস করলো। "তা,—তুমি হাসলে কেন?"—স্বামী বললো। "ও ছেলেমানুষি! ভাবছিলাম ঐ লিলাকগুলির কথা। কিন্তু তুমি?" "আমিও তাই,—সেই লিলাকগুচ্ছের কথা। এই মাত্রই আমি বলতে যাচ্ছিলাম,—আজ থেকে লিলাকই হবে আমার প্রিয় ফুল…"

ম্যাক্সিম গর্কি

(১৮৬৮—১৯৩৬)

লেখকের মূল নাম এলেক্সি ম্যাক্সিমভিচ্ পেশ্ কভ। এলেক্সির পিতার মৃত্যু হয় তিনি যখন পাঁচ বছর বয়সের শিশু। মায়ের পুনর্বিবাহের পরে ইনি লালিত পালিত হন মাতামহের দরিদ্র ঘরে; কিন্তু দুস্থ পরিস্থিতির জন্য মাত্র নয় বৎসর বয়সেই তাকে পেটের চিন্তায় নামতে হয়,—কঠিন কর্মক্ষেত্রে। এই থেকে ২৪ বছর পর্যন্ত ইনি বিভিন্ন কাজে ও কাজের খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন নিঝনি থেকে দাণিয়ুব ও জর্জিয়া পর্যন্ত সমস্ত দক্ষিণ ও পূর্ব রাশিয়া। কখনো ফিরিওয়ালা, কখনো কুলীমজুর, ডকের শ্রমিক, ভব ঘুরে…এবং বিচিত্র জীবনানুভূতির মধ্য দিয়েই একদিন বিখ্যাত এক রুশলেখক,—জগদ্বিখ্যাত প্রতিভাবান মনীষি। ছন্নছাড়া নানা কাজের মাঝেই নিজে নিজে পড়াশুনো করেন যথেষ্ট এবং প্রথম থেকেই লিখতে-সুরু করেছিলেন। টিফ্লিতে রেলওয়ে কারখানায় কাজ করার সময় গর্কি (তিক্ত) এই বেনামে তার একটি গল্প প্রকাশিত হয় এবং এই নামেই তিনি চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পিটার্সবার্গের নামজাদা এক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত গল্প 'চেলকশ' এবং ছ-বছর পরেই একটি গল্পের বই। অভাবিত সাফল্যে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন এবার—এবং টলষ্টয়ের পাশাপাশিই সাহিত্য-আসন লাভ করেন। সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের সংগে যোগাযোগের ফলে লেখক বন্দী হন; বিদ্রোহী সাম্যবাদী দলে যোগ দিয়েছিলেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এবং বিদ্রোহী দলের পূর্ণ-বিজয়ের পরে লেখক রাশিয়া-সংস্কৃতির মুখপাত্র রূপে নিযুক্ত হন। ১৯২২ তে স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় জার্মানী প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ শেষে ১৯২৮এ রাশিয়ায় ফিরে আসার সময় বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত হন—দেশের প্রিয় মনীষি রূপে।

নিপীড়িত শ্রমিকের বিপ্লব-জাগরণের বিখ্যাত উপন্যাস গর্কির "মা"; এবং এইটিই এই জাতীয় সর্বপ্রথম উপন্যাস। লেখকের বিখ্যাত গল্প: চেলকশ, ছাব্বিশজন মানুষ ও একটি মেয়ে, শরতের একসন্ধ্যা, ঋষি ইত্যাদি। লেখকের নিজ জীবনের স্মৃতি-লেখা হ'লো: শৈশব, পৃথিবীর বুকে, আমার বিশ্ববিদ্যালয়। নবজাগরণ-দীপ্ত রাশিয়ার পটভূমির উপরে বাস্তব দৃষ্টিতে নিখুঁত-গভীর চরিত্র চিত্রণ—গর্কির অসামান্য প্রতিভার নিদর্শন; সর্বহারার উপরে লেখকের গভীর দরদ। রোমান্স ও কঠিন রিয়ালিজ্মের অপূর্ব মিলন গর্কির রচনার বিশিষ্ট সুর।

চেলকশ

১

ডকের ঘনীভূত ধূলি-ধূমে পশ্চিমের নীল আকাশ অন্ধকার ক'রে আছে। সবুজ সমুদ্রের দিকে জলন্ত সূর্যদেবের দৃষ্টি ঘোলাটে,—যেনো একটা ধূসর মলিন পর্দা সামনে ঝুলানো। জলে কোনো রকম প্রতিচ্ছায়া পড়েনি ; কারণ দাঁড়ের অবিশ্রান্ত ঝুপ ঝাপ আঘাত, ষ্টিমার চাকার ঘূর্ণী-চলন, তুর্কী জাহাজের তীক্ষ্ণ-গভীর অগ্রভাগের জল-চেরা গতি ও জনবহুল বন্দর উজিয়ে দিগ্বিদিকে বেগবান অন্যান্য সব জাহাজ এই সমস্ত কিছুতেই জল অনবরত বিক্ষুব্ধ হ'চ্ছে।

সমুদ্রের মুক্ত তরংগদল বন্দরের কোলে গ্রানাইট্-প্রাচীরে বন্দী। মাথার উপরকার বিপুল ভারে বিধ্বস্ত হ'য়ে তারা জাহাজের পার্শ্বদেশে গায়ে গায়ে ও তীরে তীরে ভেঙে পড়ছে ; মথিত জল ফেনরাশিতে ঘূর্নিল ও ডকের সমস্ত রকম আবর্জনায় বিষাক্ত!

নোঙর শৃঙ্খলের ঝং ঝং শব্দ, মাল-টানা ওয়াগনগুলির সংযোগ-শৃঙ্খলের কট্ কট্, পাথুরে মেজেতে লৌহ-পিণ্ড পতনের ক্র্যাং ক্র্যাং ধাতব ধ্বনি, গাছের ধপ ধপ, ভাড়া খাটা গাড়ীর ক্যাঁচ ক্যাঁচ, ষ্টিমার-হুইসেলের তলোয়ার-তীক্ষ্ণ ক্যাংশ-ক্রেংকার, ডক-মজুরদের চীৎকার, নাবিক ও শুল্কবিভাগের অফিসারদের গণ্ডগোল—এই সমস্ত শব্দ মিলে শ্রবণশক্তি চিরদিনের জন্য রুদ্ধ ক'রে দেওয়ার মতো। কর্মব্যস্ত দিনের প্রচণ্ড ঐক্যতান প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ঘুরে ঘুরে বন্দরের ঊর্ধ্বে বন্দী হ'য়ে আছে ; আর, মাটি থেকে নব নব শব্দ তরংগ অবিশ্রাম জেগে উঠছে সেখানে যোগ দেবার জন্যে। সেই শব্দের গম্ভীর বেদনার্ত গর্জনের অনুকম্পনে সমস্ত দিক ভূমিকম্পের মতো কম্পিত, তীক্ষ্ণ তীব্র ধ্বনিতে চিরে যাচ্ছে মানুষের শ্রবণ, ধূলিধূম্র ও উত্তপ্ত বাতাস।

এই গ্রানাইট, লৌহ, কাষ্ঠ, বন্দরের বাঁধানো পাথর, জাহাজ আর যতো লোকজন—সমস্ত মিলে যেনো বিশ্বকর্মার এক বিরাট বন্দনা গান ব্যাকুল ভাবে ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে।

এর মধ্যে মানুষের হারিয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর বড়ো দুর্বল, বড়ো হাস্যকর শোনায়! এই শব্দ-সমুদ্রের মধ্যে এই সমস্ত কিছুরি স্রষ্টা মানুষের রূপ কী হাস্যকর, কী করুণ! তাদের ধূলিমাখা, খর্ব-ভগ্ন ব্যস্ত দেহ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, কর্মের ভারে বাঁকানো, ধূলি-ঝাপটায় উৎপীড়িত, শব্দ-তাপের কুণ্ডে অর্দ্ধমৃত। আর, তাদেরি হাতে গড়া এই প্রকাণ্ড লৌহদানব পার্সেল স্তূপের পর্বত-ভার, বজ্রনাদী মালগাড়ী—এই সমস্তের তুলনায় এতো ক্ষুদ্র, এতো তুচ্ছ তারা! মানুষের সৃষ্টির হাতেই মানুষ আজ ভৃত্য, বন্দী; ব্যক্তিত্বের স্বাধীন অহংকার এখানে চূর্ণ হ'য়ে গেছে।

প্রকাণ্ড ষ্টিমার বাষ্প উড়িয়ে 'হুইস্‌ল' দিচ্ছে, হিস হিস শব্দ কচ্ছে,—যেনো দানবীয় দীর্ঘশ্বাস! এর প্রত্যেকটি শব্দে র'য়েছে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের নির্মম ঘৃণা—এই ধূলিমাখা উৎফুল্ল নরাকৃতিদের জন্য—যারা তারি ডকে সুড়্ সুড়্ ক'রে ঘুরে ঘুরে তাদের দাসত্ব-দীপ্ত পরিশ্রমের ফসল দিয়ে জাহাজের বিরাট গহ্বর ভ'রে তুলতে ব্যস্ত। কী নির্মম হাস্যকর, কী করুণ—ঐ ভগ্ন ডক মজুরদের সুদীর্ঘ পরিপূর্ণ শ্রেণী! বাঁকানো পিঠে হাজার হাজার টন রুটির বোঝা ব'য়ে ব'য়ে তারা জাহাজের লৌহ-জঠর পূর্ণ কচ্ছে,—আর ঠিক তার থেকেই দুএক টুকরো মাত্র ফিরে পাচ্ছে এই পোড়া পেটে পোরবার জন্য!

সবাই এখানে ভগ্নশীর্ণ, ঘর্মে ক্লেদাক্ত, অমানুষিক ক্লান্তি ও শব্দাঘাতে বুদ্ধিভ্রষ্ট ও বোকা হ'য়ে গেছে; এদিকে মানুষ্টারি গড়া লৌহযন্ত্রের প্রত্যেকটি প্রয়োজন সযত্নে পরিপূর্ণ,—রৌদ্রের মধ্যে প্রোজ্জ্বল প্রশান্ত তাদের রূপ! গভীর ভাবে দেখলে: বাষ্প দিয়ে এদের বিপুল গতি-স্পন্দনের জন্ম হয়নি, হ'য়েছে মানুষের মাংসপেশী মুচড়ে, চেড়া হৃৎপিণ্ডের লাল রক্তে!

এই দুই বিরুদ্ধ দৃশ্যের মধ্যেই আছে মর্মান্তিক পরিহাসের এক বিরাট কাব্য!

শব্দের এই আর্তনাদ আত্মার উপরে এক গভীর নির্যাতন; নাকের মধ্যে ধূলোর ঝাঁঝ ঝাপটার যন্ত্রনা, চোখ অন্ধপ্রায়, অগ্নি তাপে শরীর অর্দ্ধদগ্ধ, পরিশ্রান্ত—অবস্থা এমন যে এই সমস্ত দালান-কোঠা, লোকজন, বাঁধানো পাথর, ধৈর্য ধ'রে আর যেনো থাকতে পারছে না, এক্ষুনি একটা ভয়ানক বিপর্যয়, একটা সাংঘাতিক বিদ্রোহের মধ্যে ভেঙে পড়ে বিধ্বস্ত হ'য়ে যাবে।

তারপর, সন্ধ্যা-শান্ত নির্মল আকাশে শান্তির সহজ নিশ্বাস বইবে, সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি আর বিশ্বাস ভ'রে থাকবে। এই ক্লেদাক্ত শব্দিত সমারোহ, স্নায়ু-ছিন্ন তীক্ষ্ণ গর্জন,—মানুষকে যা নৈরাশ্যে উন্মাদ করে তোলে—এর কিছুই আর থাকবে না এবং সহরে, সাগরে, আকাশে বাতাসে তখন শুধু নির্মল শান্তি ও প্রশান্ত মহিমা!

পর পর ঘণ্টার বারোটা শব্দ বেজে উঠলো। শেষ শব্দটির কম্পন যখন মিলিয়ে গেলো, শ্রমের হিংস্র-বর্বর মিলিত অভিযানের জোরও অনেকটা যেনো কমে এলো, এক মিনিট পরেই সুরু হোলো নিষ্প্রভ গণ্ডগোল। এখন মানুষের গলা, সমুদ্রের ঢেউয়ের ঝাপটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দুপুরের খাওয়ার ছুটি পেলো।

ডক-মজুরেরা কাজ ফেলে রেখে ডকের এদিকে ওদিকে গোল হ'য়ে ব'সে গণ্ডগোল কচ্ছে, ফেরিওয়ালার কাছ থেকে খাবার কিনছে, ডকের বাঁধানো উঠানের এক ছায়াকোনে ব'সে উবুড় হ'য়ে খাচ্ছে।—এমন সময় তাদের একেবারে মধ্যখানে গ্রিশকা চেলকশ এসে হাজির। লোকটা একটা সাংঘাতিক জীব; বিষম মাতাল আর সাহসী সুদক্ষ চোর ব'লে সমস্ত ডকেই সুপরিচিত। খালি পা, খালি মাথা, পুরানো জীর্ণ একটা ট্রাউজার পরা আর ছাপানো রঙের সার্ট; ছেঁড়া কলারের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার শুষ্ক কোন-জাগা হাড়, তামাটে চামড়া টান করে ঠেলে উঠেছে। তার কালো ঈষৎ ধূসর চুলের এলোমেলো অবস্থা আর তীক্ষ্ণ 'ডাকাতে' মুখের উপরে এই ঝিমন্ত চোখ দেখে বোঝা যায়, এইমাত্র সে ঘুম থেকে উঠে এসেছে। তামাটে গোঁফের মধ্যে একটা খড়ের টুকরো ঢুকে আছে, আর একটা কামানো বাঁ-গালের জুলপীর উপরে, কানে 'লাইম' গাছের একটা তাজা ডাল সন্ত গোঁজা। লম্বা হাড়গিলে, বরং কিছুটা ঝুঁকে পড়া তার দেহ; ডকের পতাকার কাছটা সে আস্তে আস্তে পা ফেলে পেরোলো। তার হিংস্র-দর্শন বর্শার মতো নাকটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে সে চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে চলছিলো; ডকের মজুরদের মধ্যে কাউকে খুঁজে নেবার চেষ্টায় তার হিম-ধূসর চোখ দুটি যেনো জ্বলছে। দীর্ঘ গোঁফের দুপাশটা নড়ছে, ঠিক বেড়ালের মতো! সে পেছনের দিকে দুহাত নিয়ে তার লম্বা লম্বা বাঁকা আঙুল-গুলিতে কেবল মোচড় দিচ্ছিলো। এখানে এই তারি মতো বিশিষ্ট ভগ্ন চেহারার কতো জীবই রয়েছে, কিন্তু তার উপরে গিয়ে সবারি দৃষ্টি পড়লো। দেখতে যেনো সে পার্বত্য

শকুন; শীকারের উপরে ঝাঁপ দেবার মতো তার অদ্ভুত চলার ভংগী। দেখতে সহজ কিন্তু আসলে একরোখা ও তীক্ষ্নসতর্ক,—ঠিক শিকারী পাখীর ছোঁ মারার মতো।

কয়লাস্তূপের পিছনে ছেঁড়া জামাপরা বিশ্রামরত একটা মজুরদলের কাছে সে এসে পৌছলো ও তার সামনে মোটা সোটা এক যুবক এসে দাঁড়ালো; তার ভিজা ন্যাকড়ার মতো মুখখানা নীলাভ ব্রণে ভরা, ঘাড়ের উপরে আঁচড় কাটা, শিগগিরি বেত খাওয়ার চিহ্ন। উঠে সে চেলকশের কাছে এসে চাপা গলায় বললো,—

"দুটো মালের টের পেয়েছে বাবুরা, খোঁজে আছে।"

"আচ্ছা?"—চেলকশ শান্তভাবে তার উপরে চোখ বুলালো।

"আচ্ছা মানে? তারা খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে, বুঝলে?"

"খোঁজ করতে বুঝি আমারো সাহায্য চাচ্ছে?"

—চেলকশ হেসে স্বেচ্ছা-নৌবাহিনীর ভাঁড়ার ঘরের দিকটা ভালো ক'রে একবার দেখে নিলো।

"মরবে তুমি!"—তার সংগী যাবার জন্য মোড় ফিরলো।

"আঃ, থামো না একটু! বাঃ, তোমাকে বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে তো!……আচ্ছা তুমি কি মিশ্‌কাকে দেখেছো এদিকে?"

"না অনেক দিন দেখিনি—" চড়া গলায় উত্তর দিয়ে সে তার অন্য সংগীদের মধ্যে গেলো। চেলকশ চলতে লাগলো, প্রত্যেকের কাছেই তার পরিচিত অভ্যর্থনা। বরাবর সে বেশ আমুদে ও রংগ-রসিক, কিন্তু আজ তার নিশ্চিতই মন ভালো নেই, কাটা-কাটা দুএক কথায় জবাব দিলো সবাইকে।

মালঘরের পিছন দিয়ে একজন পাহারাওয়ালা বেরুলো, ঘন তামাটে তার ধুলিভরা দেহ, সৈন্যের মতো সটান সোজা। চেলকশের পথ জুড়ে সে এসে দাঁড়ালো, যেনো তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করার ভংগী। বাঁ হাত দিয়ে তা'র তলোয়ারের গোড়ালি ধরা, আর হাত দিয়ে সে চেলকশের সার্টের কলার ধ'রতে চেষ্টা কচ্ছে।

"থামো, কোথায় যাচ্ছো এদিকে?"

চেলকশ এক পা পিছিয়ে দাঁড়ালো, চোখ তুললো ও পাহারাওয়ালার দিকে তাকিয়ে

শুকনো হাসি হাসলো। পাহারাওয়ালার ধুর্ত মুখটা দেখতে বেশ মজারই; ভয় দেখাবার প্রচেষ্টায় গাল দুটো ফুলে গোল নীলাভ হ'য়ে এসেছে, ভুরু উঠেছে কুঁচকে, চোখ হ'য়ে গেছে গোল,—ফলে দেখতে বেশ মজারই দেখাচ্ছিলো।

"তোমাকে আগেই বলা হ'য়েছে, ডকের মধ্যে পা বাড়িয়েছো কি পাঁজর ভেঙে দেবো একেবারে। আবারো তুমি এখানে!"—লোকটা ভয় দেখিয়ে গর্জে উঠলো।

"আঃ, চটো কেনো, সিমিয়নিক! অনেকদিন পরে আমাদের দেখা হোলো।"—চেলকশ আস্তে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়।

"ধন্যবাদ, এই যেনো শেষ দেখা হয়! বেরোও, সোজা বেরিয়ে যাও।"—

সিমিয়নিক কিন্তু বাড়ানো হাতখানা ধরে।

"আমাকে তুমি একটু বলো দেখি—" চেলকশ ব'ললো, তার আঙুলগুলি তখনো সিমিয়নিকের হাত আকড়ে আছে,—বন্ধুর মতোই সে হাতটায় ঝাঁকানি দিলো—"মিশ্‌কাকে দেখোছো?"

"মিশ্‌কা, কে মিশ্‌কা? কোন্ মিশ্‌কা? কোনো মিশ্‌কাকে চিনিনে আমি। চলে যাও হে, নইলে ইন্‌স্পেক্টরেরা কেউ দেখে ফেললে—"

"আরে, লালচুলের সেই লোকটা, গোলাবার কোস্ট্রোমায় যার সংগে কাজ করেছি—" চেলকশ কথা আদায় করবেই।

"তোমার চুরির সাগরেত কে, তার আমি কি জানি?"

"তোমার মিশ্‌কা সে হাঁসপাতালে, তার একটা পা লোহার কড়ি প'ড়ে ভেংগে গেছে। এবারে যাও, যাও হে সোজা ভদ্দর লোকটির মতো; নইলে গলাটা 'ক্যাচ' ক'রে কেটে রেখে দেবো।"

"এই তো, ঠিক হ্যায়? তাহ'লে তুমি—তুমি না বলেছো মিশ্‌কাকে চেনো না? দেখলে তো? আচ্ছা, অতো চটো কেনো সিমিয়নিক"।

"দেখো গ্রিশকা, আর টু শব্দটিও না, যাও।"

পাহারাওয়ালা চ'টে উঠলো এবং এদিক ওদিক দেখে চেলকশের মুঠো থেকে হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা ক'রলো।

চেলকশ তার ঘন ভুরুর নীচু দিয়ে স্থির ভাবে তাকালো এবং হাতটা ছেড়ে না দিয়েই বলতে লাগলো, "তাড়িয়ে দিচ্ছো কেনো? তোমার সংগে একটু কথাই ব'লে যাই। তারপর, কেমন আছো তুমি। বৌ, বাচ্ছা কাচ্চা সব ভালো তো?"—চোখে একটা ঘৃণার ঝলক দিয়ে সে বললো—"কতদিন থেকে যে ভাবছি তোমার সংগে একবার দেখা করি,—কিন্তু সময় পাইনি। আর বোঝই তো, সব সময়ে মদে ডুব মারলে কি—"

"এখন রাখো ওসব ঠাট্টা তামাসা! আচ্ছা লোক তো? ঠিক ধ'রেছি।...... পথে পথে সব ঘর-বাড়ীতে সিঁদকাটার তালে আছো বুঝি, না?"

"কী আর দরকার।......এখানেই এতটা র'য়েছে যে জীবন ভোর আমাদের বেশটি চ'লে যাবে,—তোমার আর আমার। সত্যি বলছি, প্রচুর র'য়েছে। তা হ'লে দুটো মাল গলিয়ে দিয়েছো? এঃ! দেখো সিমিয়নিক, আরো সামলে চলো; একদিন ফাঁদে পড়ে যাবে।"

ক্রুদ্ধ সিমিয়নিক কাঁপতে লাগলো, নিজের মধ্যে যেনো সে যুদ্ধ করতে লাগলো কিছু বলার জন্য। চেলকশ এবার হাত ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবেই ডক-গেটের দিকে এগিয়ে গেলো। শুল্ক বিভাগের পাহারাওয়ালারা ক্ষেপে গিয়ে পিছু পিছু ছুটলো, যাচ্ছে-তা চীৎকার ক'রে। চেলকশ এখন আরো শান্ত, দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিস দিয়ে দিয়ে চলেছে, পকেটের মধ্যে হাত দুটো পুরে ছুটির দিনের আমেজে মজুরদের ঠাট্টা কেটে চলে যাচ্ছে সে সোজা ডানেবায়ে, আর তারাও সমানে উত্তর দিচ্ছে। "দেখো, গ্রিশকা! কর্তাদের একেবারে পোষাটি তুমি।"—একদল মজুর খাবার খেয়ে মাটিতে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেলো তারাই চেঁচিয়ে ব'ললো।

"হ্যাঁ, পাটা খালি র'য়েছে কিনা, তাই কর্তারা নজর রাখছে কোথাও না লাগে আবার।"—চেলকশ বললো।

গেট পর্যন্ত পৌঁছল তারা। দুটি সৈন্য-পাহারা চেলকশকে বেশ ক'রে দেখে নিলো ও ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে রাস্তার মধ্যে এগিয়ে দিলো।

চেলকশ রাস্তা পেরিয়ে সরাইয়ের ঠিক উল্টো দিকে একটা পোষ্টে হেলান দিয়ে বসলো। ডকের গেট দিয়ে বোঝাই গাড়ীর পর গাড়ী গড় গড় ক'রে আসছে, আর কতগুলি খালি

গাড়ি সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, তাদের ড্রাইভারেরা সিটের উপর এপাশ ওপাশ দুলছে। সমস্ত ডকেই উৎক্ষিপ্ত শব্দ আর ধূলোর উদ্গীরণ!

চেলকশ এই উন্মত্ত গর্জনে অভ্যস্ত, তার মনে বেশ স্ফূর্তি। সামনে তখন লুব্ধ লাভের আশা, একটু পরিশ্রম আর বেশ একটু দক্ষতা হোলেই হোলো। সেই গুণ চেলকশের যথেষ্ট মাত্রায়ই আছে। চোখ দুটি আধোরকম বুঁজে সে যেনো দেখতে থাকলো: কাল ভোরে আচ্ছা একটা পাক দিয়ে ঘুরে আসা, তারপর "ব্যাপারটা" শেষহ'লেই পকেটে ভর্তি নোটের খস্‌খসানি। তারপর, তার সংগী মিশকার কথা। সে থাকলে আজ রাতে কতো কাজই না হোতো, তার পা-টা যদি না ভাঙতো!

চেলকশ নিশ্চিতই বুঝলো: মিশকাকে ছাড়া একেবারে একা, কী জানি হয় তো, সে সেরে আসতে পারবে না। সে রাতটাই বা কী রকম হবে? চেলকশ আকাশের দিকে, রাস্তার দিকে সোজা তাকালো।

তার কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে বাঁকাচোরা পাথর বাঁধের উপর, পাথর থামের গায় হেলান দিয়ে ব'সে আছে একটি যুবক। মোটা সোটা একটা নীল রঙের গরম সার্ট গায়ে, পরণে একটা ব্রিচেস আর সুন্দর কালো জুতো, আর একটা ছেঁড়া লালচে টুপি মাথায়। কাছেই একটা ছোট্ট থলে, হাতল নেই, একটা কাস্তে ও খড়ের গাদা। যুবকটির চওড়া কাঁধ আড়েপাশে সমান, ঠিক কবাটের মতো। মুখখানা রোদে পোড়া ও নানা ঋতুর ঘায়ে পোক্ত। তার মস্তো বড়ো দুটি চোখ দিয়ে সে সরল বিশ্বাসে চেলকশের দিকে তাকিয়ে ছিলো। চেলকশ তার দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষলো, জিভ বের ক'রে ভয়ানক একটা মুখ বানিয়ে চোখ লাল ক'রে তাকালো।

যুবকটি প্রথমে বিস্ময়ে চোখ কোঁচকালো, তার পরে হোঃ হোঃ ক'রে হাসিতে ভেঙে পড়লো। "ওঃ, বেশ মজা তো!"—মাটি থেকে আধেকটা উঠে থলেটা টেনে, কাস্তেটা পা দিয়ে পাথরের উপরে ঠক্ ঠক্ ক'রে ঠুকে নিয়ে বিদঘুটে রকম মোড়ামুড়ি দিয়ে সে এলো চেলকশের কাছে।

"এই তুমি একটা মৎলবে আছো, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে!"—একটা পা থেকে ট্রাউজার গুটিয়ে নিয়ে চেলকশকে বললো সে।

"হ্যাঁ রে, হ্যাঁ বাচ্ছা, যা বলেছো!"—চেলকেশ সোজাই স্বীকার করলো, আর তার শিশুর মতো নির্মল চোখ দিয়ে সে জোয়ান এই সরল যুবকটির কাছে যেন এগিয়ে গেলো।

"দাইতে গিয়েছিলে বুঝি?"

"হ্যাঁ একটা মস্তো বড়ো ভুঁই দাও তো পাবে মোটে সের দুই। ছোঃ, আর লোক সে কী লোক! দুর্ভিক্ষের অঞ্চল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছে; তারা মজুরী নামিয়ে দিয়েছে, কিছুই হয় না এখন! কুবানে দিচ্ছে তারা ৬০ কপেক; আর আগের দিনে দিতো তিন চার পাঁচ রুবল···

"আগের দিনে? কেনো, এই তো আগের দিনে একজন রুশীয়ের দর্শন মাত্রই দিত তারা তিন তিন রুবল। দশ বছর আগে তো সোজা ব্যবসাই ফেঁদে বসেছিলাম। কোনো এক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কেউ বললেই হ'তো—"এই আমি একজন রুশ।" ব্যস্, অমনি তারা হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে দেখতে গলে পড়তো, একেবারে বিস্মিত হ'য়ে পড়তো,—আর তুমিও তিনটে রুবল পেয়ে যেতে। তারপর, সে কী খাওয়া-দাওয়া, সেখানে যতদিন খুসী থাকো আনন্দে! কোনো ভাবনাই নেই!"

যুবকটি প্রথমে হাঁ করে ঝুঁকে প'ড়ে চেলকশের কথা গিলছিলো, তার গোল মুখখানাতে জেগে আছে বিমূঢ় উল্লাস। কিছু পরেই যখন ধরতে পারলো যে এই শীর্ণ লোকটা তাকে নিয়ে বেশ একটু ঠাট্টাই করছে, তখন ঠোঁট চাটতে চাটতে হাসতে হাসতে একেবারে গড়িয়ে পড়লো।

চেলকশ গোঁফের আড়ালে হাসিটুকু লুকিয়ে রেখে গম্ভীর হ'য়ে রইলো।

"আচ্ছা লোক তো! এমন ক'রে বলছে যেনো সাচ্চাই, আমিও শুনে শুনে বিশ্বাস করি! না, মাইরি বলছি, আগের দিনে—"

"বাঃ রে, আমিও তো তাই বললাম! সত্যি কথা বলতে, আগের দিনে···"

"আচ্ছা, চালাও ভাই!"—ছেলেটি হাত নেড়ে দেয়,—"ফিরিয়ালা, কাপড়-কাটা, কি তুমি হে?"

"আমি?"—চেলকশ জিজ্ঞাসার মতো মাথার ভংগী করলো এবং একটু কাল ভেবে বললো—"জেলে!"

"জেলে, সত্যি? জাল ফেলে মাছ ধরো?"

"মাছ ধরবো কেনো? এখানকার জেলেরা শুধু মাছই ধরে না। তারা জলে ডোবা লোক, পুরোনো বন্দর, ডুবানো জাহাজ—এই সমস্ত কিছুর জন্যেই জাল ফেলে। তারা এ সব কাজে ঠিক বর্শির মতো কিনা?"

"তারপর? এই ধরনের জেলেদেরি বুঝি এমনি সব গান:

আমরা ফেলি জাল
যে ব্যাংকে জ্বলবে বাতি লাল,—
সাজের ঘরে, কাজের ঘরে
যে ঘরে সব তাজা খাবার মাল!

"কেনো, তেমন কাউকে দেখেছো বুঝি?"—চেলকেশ তার দিকে চেয়ে ঠাট্টার ভংগীতে হাসলো।

"না, দেখিনি, বলতে শুনেছি!"

"কি রকম লাগে তাদের?"

"কি রকম লাগে? এই আর কি! চমৎকার লোক তো! সাহসী স্বাধীন সব……"

"স্বাধীনতায় তোমার কি আসে যায় হে? তুমি তার কি বোঝো?"

"বুঝি ব'লেই তো মনে হ'চ্ছে। নিজের কর্তা নিজেই, যেথায় খুসী ফেরো, করো যা খুসী! হ্যাঁ, একটিবার যদি জানলে কেমন ক'রে চলবে, আর কাঁধের উপর যদি কোনো ঝামেলা না থাকে—সাবাস, চমৎকার! যতদুর পারো করো স্ফূর্তি, হ্যাঁ, কেবল ঐ উপরের দিকে একটু নজর রেখো।"

চেলকশ ঘৃণায় 'প্যাক্' করে থুথু ফেললো, এবং যুবকটির দিক থেকে ঘুরে আলোচনা বন্ধ করলো।

"আমার ব্যাপারটা হচ্ছে এই"—যুবকটি হঠাৎ উৎসাহে আরম্ভ করে, "বাবা

মারা গেলো, বিষয় সম্পত্তি তো একটুকরো জমি, মা-ও বুড়ো, জমিটুকুও শুকিয়ে কাঠ, কী করি তখন ? বাঁচতে হবে তো, কিন্তু কেমন ক'রে যে কে ব'লবে ?

"ভালো-ঘরে বিয়ে করবো ? হোলে তো ভালোই হোতো। শুধু যদি তারা মেয়েকে তার অংশটি আলাদা ক'রে দিয়ে দিতো।

"তা কিছুতেই না, বুড়ো কঞ্জুষটা তা মরলেও দেবেনা। কাজেই, তার কাছে চাকরের মতো থেকে খাটতে হবে। চিরদিন, সারা বছর! মজা মন্দ না কিন্তু।

"কিন্তু একশো কি দেড়শো টাকাও যদি কামাতে পারতাম! নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিয়ে সেই বুড়ো আন্টিকের সামনে বুক ফুলিয়ে সোজা মুখের উপরেই ব'লে দিতাম— 'মার্ফার অংশটা দিয়ে দেবেন আপনি ?' না ? বেশ। সমস্ত গাঁয়ে, ভগবান করলে, সে-ই সবে-ধন একমেয়ে নয়!' তখন আমি একেবারে মুক্ত পাখীটি, যেথায় খুসী বাঁধো বাসা।"

"আঃ, ঠিক তাই!"—যুবকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "কিন্তু অবস্থা যেমন, কোনো ভরসাই নেই আর, একমাত্র শ্বশুরের ঘরে প'ড়ে থাকা ছাড়া! ভাবছিলাম কি, একেবারে কুবাকেই চলে যাবো এবং ঠিক চারশোটি রুবল পকেটে নিয়ে ফিরে আসবো। বেশ ভদ্রলোকটি তখন। কিন্তু তা আর হোলো কৈ ? মনে হচ্ছে, ভাড়াই খাটবো খুব সম্ভব ; কারণ, ঠিক নিজে কিছু করতে পারবো ব'লে ঠেকছে না!"

ভাবী শ্বশুরের অধীনে থাকাটা যুবকটি একেবারেই পছন্দ করে না; মুখখানা তার কালো মলিন হ'য়ে গেলো। কেমন ভাবে সে মাটী থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো।

চেলকশ জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় যাচ্ছো ?"

"কোন চুলোয় যাবো আর, সোজা বাড়ীতে।"

"তা ঠিক নাও হ'তে পারে তো, সোজা তুরস্কেও যেতে পারো।"

"তু—র—স্কে—" যুবকটি টেনে টেনে বললো, "কেনো, কোন ভালো মানুষটায় যায় সেখানে ? আমি তো কক্ষনো না।"

"আস্তো একটি গাধা।" চেলকশ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আবার সে তার সংগীর দিক

থেকে ঘুরে বসলো। এই লম্বা-চওড়া যুবকটি তার মধ্যে কী যেনো অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে। বিরক্তি ও অস্পষ্ট অস্বস্তি স্বভাবতই তার বুকের গভীরে আলোড়ন তুলেছে, আজ রাতে সে যে কী করবে সেই ভাবনার নিশ্চিত কেন্দ্রগতিতে বার বার বাধা দিচ্ছে।

যুবকটিকে চেলকশ এমন রুক্ষভাবে জবাব দিলো যে সে বিড় বিড় করতে করতে বারবার চেলকশের দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকাতে লাগলো। তার গাল দুটো হাস্যকর ভংগীতে ফুলে উঠ্‌লো, ওষ্ঠ ফাঁক হ'য়ে গেলো, চোখ দুটো কপালে উঠ্‌লো, ও সেই চোখ কেবল পিট পিট্ করতে লাগলো। এই লম্বা লোকটার সংগে কথাবার্তার শেষে এমন ক্রুদ্ধ অপমান-জনিত মন্তব্য সে নিশ্চয়ই আশা করেনি। চেলকশ কিন্তু তার দিকে লক্ষ্যও করলো না, পাথরের পোষ্টটায় ব'সে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে শিষ দিতে লাগলো ও খালি নোংরা পা দিয়ে তাল ঠুকে যাচ্ছিলো।

কৃষক যুবকটিও তাকে সমানে দেখে নেবে, ঠিক করলো।

"এই, এই, জেলের পো! মধ্যে মধ্যে বুঝি এমনি চালাও খুব?"—বলতেই আরম্ভ কচ্ছিল ছেলেটা, কিন্তু চট্ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো চেলকশ—

"বলছি কি হে, দুধের বাচ্ছা, আজ রাতে কাজ ক'রবে আমার সংগে? এঃ, ব'লে ফেলো শিগগির।"

"কি ধরনের কাজ?"—ছেলেটির চোখে অবিশ্বাস।

"মানে? যাতে লাগাই। মাছ ধরতে যাচ্ছি, নৌকো চালাবে।"

"আচ্ছা, বেশ, তাই হবে। কাজের আবার বাছ-বিচার! তবে একটা কথা, তোমার সংগে গিয়ে শেষে জড়িয়ে পড়তে চাইনা। গভীর জলের মাছ তুমি! ঠিক যেনো অন্ধকার, চেনা দায়!"

চেলকশের বুকের মধ্যে যেনো একটা তপ্ত শলাকা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। নির্মম রাগে সে চাপা-গলায় বললো:

"ভালো চাও তো আর টু শব্দটিও করোনা, যে ভাবনাই মাথাই গজাক। আর নইলে, নইলে সোজা লাথি মেরে খিলু উড়িয়ে হালকা ক'রে দেবো!"

পোষ্ট থেকে সে লাফ দিয়ে উঠে বাঁ হাত দিয়ে গোঁফটা মোচড়াতে লাগলো; স্নায়ু

জাগা ডানহাতটায় লোহার পিণ্ডের মতো একটি মুষ্টি উদ্যত হ'য়ে উঠলো,—চোখদিয়ে নামলো আগুন!

যুবকটি ভয় খেয়ে তাড়াতাড়ি চারদিকে তাকাতে লাগলো অস্বস্তি ভরে, পিট্ পিট্ ক'রে—এবং সেও লাফ দিয়ে উঠলো। এ ওকে চোখ দিয়ে যেনো মেপে দেখে চুপ ক'রে গেলো।

"বুঝ্লি ?"—চেলকশের মধ্যে যেনো আগুন টগবগ ক'রে ফুটছে। এই এঁড়ে-ছোঁড়া, যার সংগে ঘৃণাভরেই সে কথা বলছিলো,—সে কিনা তাকে অপমান করতে সাহস পায়! চেলকশ উত্তেজনায় কাঁপছিলো। ছেলেটাকে সে একান্ত ভাবেই ঘৃণা করতে লাগলো। যেহেতু: তার আছে নির্মল-নীল চোখ, কেমন বীর্যবান রৌদ্রোজ্জ্বল মুখ, লোহার মতো শক্ত দুটি হাত,—যেহেতু কোথাও আজ তার নিজের গাঁ, তার বাড়ী, আর এক ধনী কৃষক তাকে জামাই করতে চায়,—যেহেতু সে সমস্ত জীবনে ভরে,—বিশেষ ক'রে সে (চেলকশের তুলনায় যে খোকাটি)—সেও কিনা স্বাধীনতা চায়? স্বাধীনতার সে বোঝে কি? স্বাধীনতার কথা তো তার কাছে একান্তই অবাস্তব। একটা লোক,—যাকে তুমি তোমার চেয়ে হীন বা জঘন্য মনে করো—তার ভালোমন্দ রুচি যদি ঠিক তোমারি মতো হয় অর্থাৎ সে তোমারি সমপর্যায় স্থান নেয়,—তবে তা চিরদিনই তোমার খুব বিশ্রী লাগার কথা।

কৃষাণ যুবকটি চেলকশের দিকে তাকিয়ে তার মধ্যে একজন মনিবকেই দেখতে পেলো যেনো।

"আচ্ছা!"—সে বলতে লাগলো—"তাই হোক! হ্যাঁ, কাজই খুঁজছি আমি! কার জন্যে কাজ কচ্ছি কিছুই আসে যায় না আমার,—সে তুমিই হও বা আর কেউ। আমি শুধু বলছিলাম, মজুরের মতো দেখায় না তোমাকে, একটু বেশী-যেনো······হ্যাঁ, তা যে কোনো লোকেরি এমন হ'তে পারে। এঃ ভগবান! বলছি কি! মাতাল আর যেনো দেখিনি, রোজই ঢের দেখছি—এবং তোমার চেয়ে আরো সাংঘাতিক রকমের······"

"বেশ, বেশ, রাজী আছো তবে?—"চেলকেশ যেনো ঘনিয়ে এসে বললো এবার।

"আমি? সানন্দেই! তবে চুক্তি?"

"তা কাজের হালচাল বুঝে, এই বলতে পারো আমাদের শিকার অনুপাতে,—পাঁচটাকা পাবে, কেমন ?"

এখন টাকার প্রসংগটা বাকী এবং কৃষাণটি এ বিষয়টা খোলাসা ক'রে নিতে চায় ; মনিবের কাছ থেকে সে মজুরীর নির্দিষ্ট সংখ্যাটা জানতে চাইলো। তার অবিশ্বাস ও সন্দেহ আবার চাড়া দিয়ে উঠেছে।

"এভাবে কারবার করিনে আমি।"—চেলকশও তার দিকটায় শক্ত।

"তর্ক থাক ; খানায় চলো আগে।"

রাস্তা দিয়ে তারা পাপাপাশি চলতে লাগলো। চেলকশের যেনো ঠিক মনিবের গর্বিত ভংগী, দুহাত দিয়ে গোঁফ মোচড়াচ্ছে সে। যুবকটির ভাব এমন যে মনিবের কাজে তাকে সে তক্ষুনি লাগিয়ে দিতে চায়, অথচ মনের মধ্যে অবিশ্বাস ও অশান্তিও যেনো জেগে আছে।

"তোমার নাম কি ?"—চেলকশ জানতে চাইলো।

"গার্ভিলা।"

"নোংরা স্যাঁতসেঁতে একটা রেস্তোরাঁয় এলো তারা। চেলকস অভ্যস্তের মতো উদাসীন ভংগীতে এক বোতল ভোদকা, আলুর ঝোল, মাংস ও চপ্ অর্ডার দিলে এবং ওয়েটারও নীরবে মাথা নোয়ালে,—গার্ভিলা তার মনিবকে সম্মানের চোখেই দেখতে আরম্ভ করলো ;—লোকটাকে একটা দাঁড়কাকের মতো দেখালেও এখানে এতো ঘনিষ্ঠ সে, এতো বিশ্বস্ত !

"হ্যাঁ, এবার খেতে খেতে কথা বলা যাবে ; চুপ ক'রে ব'সে থাকো, এক মিনিটের মধ্যেই ফিরছি আমি।"

সে বেরিয়ে গেলো। গার্ভিলা চারদিক চেয়ে দেখছিলো। রেস্তোরাঁটা একটা নীচু জায়গায়। স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার ; ভেতরকার ভ্যাপসা গন্ধ, তামাকের ধোঁয়া, আলকাতরা, এবং আরো কিসের তীব্র গন্ধে জায়গাটা ভুর ভুর করছে। গার্ভিলার সামনের টেবলে একটা মাতাল নাবিক, লাল তার দাড়ি, সর্বাংগে কয়লার গুঁড়ো, আর আলকাতরা ; প্রতিমিনিটে 'হিক্কা' তুলে সে ভাঙা ভাঙা একটা মাথা-পাগ্‌লা গান গুন্

গুন্ করছিলো, গলার মধ্যে আশ্চর্য রকম হিস্ হিস্ শব্দ ক'রে। লোকটা নিশ্চিতই রুশীয় নয়।

তার পেছনে দুজন মণ্ডারের মেয়েলোক; ছেঁড়া-জামা গায়ে, মাথার চুল কালো দুটি রৌদ্রে-পোড়া জীব। তারাও মাতাল হ'য়ে গান গাইছিলো।

দূরের অন্ধকার থেকে আরো অনেক চেহারা বেরিয়ে এলো,—সকলেই আশ্চর্য রকম বিপর্যস্ত, আধোমাতাল, চঞ্চল হ'য়ে চীৎকার করছে শুধু।

একা ব'সে ব'সে গার্ভিলার মন খারাপ হ'য়ে গেলো। তার মনিব এখনো চ'লে আসছে না কেনো? রেস্তোরাঁর গণ্ডগোল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সব মিলে প্রত্যেক মুহূর্তেই তীব্রতর একটা ধ্বনি—যেনো কোন জন্তু-জানোয়ারের গর্জন, শত শত বিপর্যস্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর যেনো এই ঠাণ্ডা গুহা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য যুদ্ধ ক'রে মরছে, কিন্তু কেনো পথই খুঁজে পাচ্ছে না। খাবার ঘরে তাদের সেই ব্যস্ত ঘোরপাক অনুভব ক'রে গার্ভিলার সমস্ত অংগে কি যেনো বিড় বিড় ক'রে বেড়াতে লাগলো—দুঃস্বপ্নময় যন্ত্রণার মতো।

চেলকশ এসে খেতে সুরু করলো। মদ খেতে খেতেই কথা বলতে লাগলো। তিন গ্লাসেই গার্ভিলার নেশা ধরেছে; চাঙা হ'য়ে উঠে সে প্রীতিকর কিছু একটা বলতে চাইলো তার মনিবের কাছে। মনিব এখন পর্যন্ত তার কোনো উপকার না করলেও কেমন আগ্রহ ক'রে তাকে খেতে অনুরোধ কচ্ছে! কিন্তু সমস্ত কথাই তার গলা পর্যন্ত উজিয়ে এসে কেনো যেনো জিভে আটকে যাচ্ছিলো, জিভটা হঠাৎ যেনো দু ইঞ্চি পুরু হ'য়ে গেছে!

চেলকশ তার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ ক'রে হাসছিলো।

"হ্যাঁ! পাঁচ গেলাসেই কিস্তি মাত! একেবারে দুধের পাউরুটি। কাজ করবে কি ক'রে!"

"দোস্ত!'—গার্ভিলা বিড়বিড় ক'রে বললো,—"ভয় নেই, তুমি পাশে থাকলেই, ব্যস্! এবার এসো তোমাকে একটা চুমোই খাই, এঃ।

"আচ্ছা, সাবাস্! এই আর এক গ্লাস!''—গার্ভিলাও খেলো; শেষ পর্যন্ত তার এমন দশা হোলো যে সমস্ত কিছুই যেনো তার চোখের সামনে বেসামাল

দোল খাচ্ছে! কেমন বিশ্রী লাগতে আরম্ভ করলো তার, বোকা উৎসাহ-ভরা মুখখানা, কিছু বলতে গিয়ে কেবল ওষ্ঠ চাটছে আর হাউ হাউ করছে। চেলকশ তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে গোঁফে মোচড় দিতে দিতে বিষণ্ণভাবে হাসতে লাগলো।

মাতালের চীৎকারে রেস্তোরাঁ ফেটে যাচ্ছিলো যেনো। লালকেশী নাবিকটি টেবলে দুই কনুই রেখে ঘামছে।

"আচ্ছা, চলো এবার!"—চেলকশ উঠে দাঁড়ালো।

গার্ভিলা উঠবার চেষ্টা করলো—কিন্তু পারলো না এবং যাচ্ছেতা একটা গাল দিয়ে মাতালের মতো অর্থহীনভাবে হেসে উঠলো।

"একেবারে ধ'রেছে!'—সামনে ব'সে প'ড়ে চেলকশ আবার বললো।

গার্ভিলা তখনও হোঃ হোঃ ক'রে হাসিতে ফেটে পড়ছে, আর তার নতুন মনিবের দিকে ঘোলাটে চোখ দুটো ঘুরোচ্ছে। চেলকশ তার দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে—তীক্ষ্ণ সতর্ক, চিন্তিত দৃষ্টি। সে দেখছিলো,—সামনের এই লোকটা তার হিংস্র থাবার মধ্যে একেবারে বন্দী! তাকে নিয়ে সে যা খুসী করতে পারে! একটা তাসের মতো 'ফাৎ' ক'রে ছিড়ে ফেলতে পারে, অথবা এই কৃষাণ দেহটাকে সোজা শক্ত ক'রে লটকে রাখতে পারে। নিজেকে আর একটা লোকের হর্তাকর্তা অনুভব ক'রে ভাবলো সে: এই চেলকশের হাত দিয়েই নিয়তি তাকে আজ যে সাংঘাতিক সুরা পান করালো—এ রকমটি আর কখনো কোনোদিন সে পান করেনি। এখন এই যুকটির উপর তার অনুকম্পাই হ'লো বিদ্রূপও জাগলো। এই তারি মতো এমন কতো হাতে গিয়ে সে আবারো পড়তে পারে,—সেকথা মনে ক'রে সে এমন কি উদ্বিগ্নই হ'য়ে উঠলো। এবং এই সমস্তই ভাবনাই শেষ পর্যন্ত চেলকশের মধ্যে একটি মাত্র রূপ নিয়ে দাঁড়ালো—পৈত্রিক সম্পত্তি বোধের মতো! ছেলেটার জন্য তার দুঃখ হোলো, এখন সে নিতান্তই প্রয়োজনের বস্তু। চেলকশ এবার গার্ভিলাকে বাহু দিয়ে ধ'রে হাঁটু দিয়ে ধাক্কা মেরে রেস্তোরাঁর উঠানের বাইরে নিয়ে এলো ও সেখানে একটা কাষ্ঠস্তূপের ছায়ায় শুইয়ে দিলো; তারপর পাশে ব'সে পাইপ ধরালো। গার্ভিলা একটু ন'ড়ে উঠে কী যেনো বিড় বিড় করলো, তারপর আবার ঘুমিয়ে রইলো অচেতনের মতো।

(২)

"চলো, সব ঠিক আছে ?"—চেলকশ গার্ভিলাকে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো ; গার্ভিলা অলসভাবে দাঁড়টা নাড়তে নাড়তে বললো,—"এই যে ! দাঁড়ের এই কড়াটা এখানে আলগা, এক ঘায়ে ভেঙে ফেলবো ?" "না, না, একটুও শব্দ না, হাত দিয়ে ঠেসে ভিতরে ঢুকিয়ে দাও, ঠিক সোজা চ'লে যাবে।"

নিঃশব্দে তারা একটা নৌকো বের ক'রে নিলো। সেটা ওক গাছের গুঁড়ি-বোঝাই গাদা বোটশ্রেণী ও বড়ো বড়ো তুর্কী ষ্টীমারের সংগে বাঁধা ছিলো। ষ্টীমারগুলির অর্ধেক মাল নাবানো হ'য়েছে, আর অর্ধেকটা এখনো পাম তৈল, চন্দনকাঠ ও ছাইপ্রেসের মোটা গুড়িতে বোঝাই।

সেদিন নিবিড় অন্ধকার রাত্রি, আকাশ-পথে স্তরে স্তরে ছড়ানো ঘন-মেঘের সমারোহ ; নীরব শান্ত কালো সমুদ্র, জমাট তেলের মতো। ভিজা নোনা গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে সমুদ্র, জাহাজের গায়ে গায়ে তীরে তীরে ফেনিলজল ভেঙে পড়ছে ; চেলকশের নৌকো দোল খাচ্ছিলো। সমুদ্রের বহুদূরে জেগে উঠেছে অনেক জাহাজের রেখান্বিত কালো-রূপ। বিচিত্র রঙের বাতি দেয়া তাদের মাস্তুলগুলি আকাশে উঁচিয়ে উঠেছে ; সমুদ্রের উপর তার প্রতিচ্ছায়া, জলের বুকে পীত কম্পিত আলোর ঝিলিমিলি চিত্রিত হ'য়ে আছে। সেই নরম-শান্ত মসৃণ কালো-জলে তার চমৎকার খেলা। সমুদ্র গভীর ঘুমে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে,—দিনের কর্মভারে ক্লান্ত শ্রমিকের মতো।

"তা হ'লে চলেছি !"—গার্ভিলা দাঁড়টা জলের মধ্যে ঝপ ক'রে ফেলে বললো।

"হ্যাঁ"—হালটাকে একটা দমকা টানে ঘুরিয়ে চেলকশ দুটো ফ্লাটের মধ্য দিয়ে নৌকাটা চালিয়ে দিলো। এবার তারা মসৃণ সমুদ্রের উপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ; দাঁড়ের আঘাতে জলের উপরে নীলাভ 'ফসফরাস' জ্ব'লে জ্ব'লে উঠছে। হালের পিছনে সেই নীল আলোর কম্পমান প্রশস্ত ফিতা অর্ধবৃত্তের মতো ঘুরে ঘুরে জলছে।

"এই, কেমন লাগছে, মাথা কামড়াচ্ছে ?"—দরদী গলায় বললো চেলকশ।

"ভয়ানক রকম! তাতানো রড্ দিয়েই যেনো কেউ বাড়ি মারছে। তা, এক্ষুনি খানিকটা জল দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে নিচ্ছি।"

"বরং ভেতরটাই ঠাণ্ডা ক'রে নাওনা? সব সেরে যাবে"—একটা বোতল গার্ভিলার কাছে সে এগিয়ে দিলো।

"আঃ, আল্লার দোয়া!—তার গলার মধ্যে হাসির ফেনিল আওয়াজ।

"আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা! খুব চীজ! যাক, আর না।"—চেলকশ তাকে থামিয়ে দেয়।

নৌকাটা আবার তীরের মতো ছুটে চলেছে, নিঃশব্দে, আলগোছে জাহাজগুলির মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে পথ ক'রে। জাহাজের ভিড়-করা কুণ্ডলী থেকে বেরুতেই সহসা তাদের সামনে পড়লো, বিরাট শক্তিমান সমুদ্র! দূরদিগন্ত প্রসারিত সেই জলরাশি থেকে ভিড় ক'রে ক'রে উপরে উঠছে কতো রঙের মেঘশ্রেণী: বেগুনেমেশা নীলাভ হলুদ রংঙের—পেঁজা তুলোর মতো যার কিনারা, কতগুলি সাগর-জলের মতো সবুজ, আবার শিসে-রঙ মেঘের মতো কতো—ধূসর-ভারী ছায়া ফেলে ফেলে চলে যারা। একে একে আস্তে আস্তে তারা উপরে উঠছে, একটি আর একটির মধ্যে গলে মিলিয়ে যাছে, একে আর এককে এসে ঢেকে দিচ্ছে; তাদের রং ও রেখান্বিত চেহারা হারিয়ে গিয়ে আবার জেগে উঠছে নতুন নতুন বিজয়ী বিষণ্ণ রূপ! এই আত্মাহীন ছায়া-শ্রেণীর ধীর অবিশ্রান্ত গতির মধ্যে নিয়তির মতোই কি যেনো বিরাজমান। যেনো সমুদ্রের বিস্তৃত সমতল থেকে জাগ্রত যে এই অসংখ্য ছায়ারূপ এরা অনন্তকাল ধ'রে অসীম আকাশের উপরে বুকে ভর ক'রে সুড়্ সুড়্ ক'রে সারি বেঁধে চলবে। আকাশকে তার বিচিত্র-রঙ্ উজ্জ্বল তারার অজস্র স্বর্ণ-চোখ দিয়ে,—যে চোখ স্বপ্ন-কিরণে ভরা, যার গভীর ব্যথা-মহিমায় প্রেমিকের বুক ভ'রে ওঠে—সেই সুন্দর চোখ দিয়ে আকাশ যাতে ঘুমন্ত সমুদ্রের প্রশান্ত রূপ একটুও উঁকি মেরে দেখতে না পারে—সেজন্য বিস্তৃত মেঘেরা সমবেত চেষ্টায় আকাশকে ঈর্ষাভরে ঢেকে ফেলতে ব্যস্ত।

"এঃ, কী সুন্দর সমুদ্র!"—চেলকশ বললো।

"চমৎকার! কিন্তু আমার যেনো কেমন ভয় লাগছে!"—গর্ভিলা জোর তালে দাঁড় ফেলে বললো। জলে তার আঘাতের ফেনময় শব্দ; আর, উজ্জ্বল ঝিলমিলে নীলাভ আলো।

"ভয়? আচ্ছা বোকা!"—চেলকশ বিদ্রূপের মতো বিড় বিড় ক'রে বলে।

চোর, সেও সমুদ্রকে ভালোবাসে! তার চঞ্চল, অপ্রকৃতিস্থ উদ্দাম প্রকৃতি, নতুনত্বে লুব্ধ; এই সমুদ্রের অসীম-উন্মুক্ত বিরাট কালো-রূপের দিকে চেয়ে চেয়ে কখনই তার ক্লান্তি হয় না। তার ভালোবাসার সমুদ্রের উপরে যুবকটির এমন মন্তব্য শুনে সে আঘাত পেলো। হালে ব'সে সে জল চিরে চলছিলো। শান্তদৃষ্টি সামনের দিকে; বুকে অকূল সাধ,—এই মসৃণ সমুদ্রের উপর দিয়ে চ'লে যাবে দূরে, বহু দূরে,—যেনো শিগগিরি আর ফিরে আসতে না হয়।

সমুদ্রে এলে সব সময়ই তার একটা উদার সুখের অনুভূতি জেগে ওঠে, সমস্ত আত্মাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে; তা দৈনন্দিনের নীচতা থেকে তাকে যেনো মুক্তি দেয়। তাই সে একে গভীর মূল্য দেয়, এবং নিজেও যেনো নতুন ক'রে জেগে ওঠে এই জল হাওয়ার মধ্যে;—সেখানে জীবনের সমস্ত প্রয়োজন, এমন কি জীবন পর্যন্ত তার তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলে, ভবিষ্যতের কোন ভাবনাই সেখানে ঠাঁই পায় না। রাতে সমুদ্রের উপরে ঘুমভরা নিঃশ্বাসের শব্দ ঘুরে বেড়ায়; এই ভাবনাহীন শব্দে মানুষের মন শান্তিতে ভ'রে ওঠে,—কুবৃত্তি কুঁকড়ে ম'রে যায়, দুলে ওঠে নতুন এক দীপ্ত স্বপ্ন!

"কিন্তু সাজ-সরঞ্জাম সব কোথায়?" গার্ভিলা নৌকোর তলায় উঁকি মেরে ব'লে উঠলো।

চেলকশ হঠাৎ চমকে উঠলো যেনো,—

"সে সব নৌকোর পিছনটায় রেখেছি।"

"কি রকম?"—গার্ভিলা ঠিক ঠিক জানতে চায়; কিন্তু এই ছেলেটার কাছে মিথ্যাকথা বলতে চেলকশের অপমান লাগছিলো।

কিষাণ ছেলেটা চেলকশের চিন্তার সূত্রটি তার চকিত প্রশ্নের ঘায়ে কেটে দিয়েছে। চেলকশ তাই দুঃখিত হ'লো, এবং হঠাৎ ক্রুদ্ধই হ'য়ে উঠলো। একটা তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত অনুভূতি তার বুকের মধ্যটা ঝলসে পুড়িয়ে দিয়ে চ'লে গেলো। গার্ভিলাকে বললো সে,—জোরালো কর্কশ তার ভাষা।

"যেখানে ব'সে আছিস, ঠিক ওই খানটাই চুপটি করে ব'সে থাক। সব কিছুতেই

নাক গলানো? দাঁড় টানার জন্যেই এনেছি, সোজা দাঁড় টান। ফের যদি বক্ বক্ শুনি তো টের পাবি! শুনছিস?"

নৌকোটা কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেলো। দাঁড়গুলি ফেনিল জলে নীরব। গার্ভিলা অস্বস্তি ভরে তার জায়গায় মোড় ফিরে বসলো।

"চালাও!"—

একটা যাচ্ছেতা গাল বাতাসে শব্দ ক'রে ওঠে। গার্ভিলাও দাঁড়গুলি চালাতে আরম্ভ করে। নৌকোটা মাঝে মাঝে অস্থির ঝাঁকানি দিয়ে সশব্দ বেগে জল কেটে ছুটছে। "সোজা স্থির ভাবে।"—

চেলকশ গলুই থেকে উঠে দাঁড়ালো, হাতে তখনো দাঁড়টা, হিমার্ত-হিংস্র দৃষ্টি গার্ভিলার কুঞ্চিত মলিন মুখের উপর নিবদ্ধ। সামনে সে ঝুঁকে পড়লো, শিকারী বেড়াল যেনো এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। সংগে সংগে তার ক্রুদ্ধ দন্ত-ঘর্ষনের কড়কড় শব্দ, আর ঝাঁকানি-দেয়া হাড়ের মধ্যে কট্‌কট্ ধ্বনি।

"কে ওদিকে?"—সমুদ্র থেকে একটা ক্রুদ্ধ আওয়াজ গর্জে উঠ্‌লো।

"চালা, পাজী শয়তান, চালা, এখন। আস্তে! খুন ক'রে ফেলবো শয়তান। হ্যাঁ, চালা : এই এক, দুই, তিন! যদি একটু শব্দও করো তো সোজা ঘাড়টাই মটকে দেবো।"

—চেলকশের চাপা গর্জন।

"ওঃ, ভগবান, ওঃ!"—গার্ভিলা বিড় বিড় করতে লাগলো। শ্রমে আর শংকায় সে সংকুচিত ও অবশ হ'য়ে গেছে।

নৌকটা এবার আস্তে আস্তে ঘুরে গেলো এবং বন্দরের দিকে মোড় নিলো,—ঐ দূরে যেখানে অনেক আলো ভিড় ক'রে আছে, খাড়া মাস্তুলগুলিও দেখা যায় দূরে।

"কে?"—আবার দূর থেকে আওয়াজ আসে। শব্দ এবার আরো দূরে। চেলকশ আবার শান্ত হ'য়ে এলো।

"তুই নিজেই চীৎকার করছিস!"—সেই শব্দের উদ্দেশ্যে মাথা তুলে বললো সে, তারপর গার্ভিলার দিকে ফিরলো। তখনও সে প্রার্থনা কচ্ছে।

"দেখো দোস্ত, বড়ো ভাগ্য তোমার। এই শয়তানগুলো যদি একবার ধ'রে ফেলতো,

তবেই হ'য়ে গিছলো। বুঝলে? অমনি তোমাকে জলে উল্টে ফেলে মাছের ভোজে লাগিয়ে দিতাম।"

চেলকশ শান্ত সুরে, এমন কি ব্যংগ ভরেই বলছিলো,—কিন্তু ভয়ে গার্ভিলার সর্বশরীর তখনো কাঁপছে; সে অনুনয় করছিলো:

"শোনো, আমাকে যেতে দাও!—যীশুর নাম ক'রে বলচি, তীরে কোথাও তুলে দাও।" কাঁদো-কাঁদো অবস্থা গার্ভিলার। "আমার সব সর্বনাশ হোলো। ধর্মের দিকে চেয়ে আমাকে রেহাই দাও। কী হবে আমাকে দিয়ে? আমি তা পারবো না। এমন কাজ করিনি কখনো। জীবনে এই প্রথম! ভগবান, আমি গেছি একেবারে! এমন ক'রে জড়ালে আমাকে? এযে পাপ! কেনো, তোমার কি ধর্মভয়ও নেই! এমন কাজ!"

"কেমন কাজ"?—শক্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলো চেলকশ। "বল্ কোন কাজ?"

ছেলেটির ভয় দেখে সে মনে মনে মজা পেয়ে গেছে। চেলকশ নিজে যে একটা সাংঘাতিক লোক এই চেতনায় সে আমোদই পেলো।

"গা-ঢাকা কারবার,—আমাকে সত্যি যেতে দাও! আমি তোমার কিছুই না, যেতে দাও দোস্ত।"—বলে গার্ভিলা।

"চুপ, একদম চুপ। নিজে আসতে না চাইলে কখনো আনতাম না; কাজেই চুপ, একদম!"

"ভগবান!"—গার্ভিলা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"আঃ যথেষ্ট হ'য়েছে; আগে বুঝলেই হোতো!"—

চেলকশের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

কিন্তু গার্ভিলা নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলো না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো, নিজের জায়গায় সে মুখ গুঁজে বসলো; তখনো সে বিপর্যস্ত ভাবে বেগেই দাঁড় টেনে যাচ্ছে। নৌকো ছুটে চলেছে তীরের মতো। জাহাজের কালো শ্রেণী পথের উপরে জেগে উঠ্‌লো; নৌকোটা সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে ঢুকে দুই জাহাজের মাঝে সরু জল-পথে ঘুরে চললো।

"এবার শোনো! কেউ যদি কিছু চাইতে আসে, চুপটি ক'রে ব'সে থাকবে—ধড়ে প্রাণ নিয়ে ফিরতে চাও যদি! বুঝলে?"

"ওঃ!"—এই ভয়ানক উপদেশের উত্তরে গার্ভিলা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও তিক্তভাবে বললো—"গেছি আমি!"

"কান্না থাক।"—চেলকশের চাপা ধমক।

এই চাপা কথা গার্ভিলার ভেতরকার সমস্ত বুদ্ধিসুদ্ধিই লোপ ক'রে দিলো, তাকে নির্মম নিয়তির মুখে নিমজ্জমান একটা অচেতন যন্ত্রের মতোই ক'রে রাখলো। যন্ত্রের মতোই সে পিছনে ঝুঁকে, তার পায়ের দিকে শূণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড় টানতে লাগলো।

ঢেউগুলি নৌকোর গায়ে গায়ে ভেঙে পড়ছে অশুভ সূচনার মতো; তাদের ঝিমানো শব্দে যেনো একটা বিপদের সংকেত,—গার্ভিলার খুব ভয় করতে লাগলো। এবার ডকে পৌঁছে গেলো তারা। গ্রানাইট দেয়ালের মধ্য থেকে আসছে মানুষের গলার আওয়াজ, আর সংগে সংগে জলের ঝাপটা, গান ও বাঁশীর তীক্ষ্ণ সুর।

"থামাও!"—চেলকশ ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো। দাঁড় টেনো না, দেয়াল ধ'রে এগোও। আস্তে, এই পাজি।"

গার্ভিলা পিছল-পাথর আকড়ে ধ'রে নৌকাটাকে দেয়ালের পাশ দিয়ে নিয়ে চল্‌লো, উজ্জ্বল সবুজ পাথরের কোল ঘিষে নিঃশব্দে।

"থামো, দাঁড়গলি দাও, তোমার পাশপোর্ট? এই ব্যাগে? শিগগিরি ব্যাগটা দাও তো! হ্যাঁ, তুমি না পালাও সে জন্যে! দাঁড় ছাড়া যদিও যেতে পারতে কিন্তু পাশটা ছাড়া যেতে নিশ্চয়ই সাহস পাবে না। এখানে ব'সে থাকো। কিন্তু—যদি উঁকি মারো তো। সোজা সমুদ্রের তলায় ঢুকিয়ে দেবো।"

হঠাৎ চেলকশ হাত দিয়ে কি যেনো ধ'রে শূন্যে ঝুলে উঠ্‌লো এবং দেওয়ালের ওধারে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

গার্ভিলা আশংকায় কেঁপে উঠ্‌লো। সমস্ত কিছুই এতো দ্রুত ঘটে যাচ্ছে! তার মনে হোলো,—যে অভিশপ্ত ভয়ে সে এই গোঁফওয়ালা শীর্ণ চোরটার কাছে মৃতপ্রায় হ'য়ে ছিলো, এখন যেনো তা তার দেহ মন থেকে আল্গা হ'য়ে খুলে গেছে! ছুটবে এখন? স্বস্তি

ভরে নিশ্বাস টেনে চারদিক তাকালো সে। তার বাঁ দিকে একটা মস্তো বড়ো ভাঙা জাহাজ, মাস্তুলহীন। একটা প্রকাণ্ড শবাধার যেনো, আর একদিকে পোতাশ্রয়ের শূন্য নির্জন বাঁধ। প্রত্যেকটা জলের ঝাপটা এদের গায়ের মধ্যে একটা ফাঁপা-গম্ভীর প্রতিধ্বনি তুলছে, গভীর দীর্ঘশ্বাসের মতো। ডান দিকে পোতাশ্রয়ের বাঁধটা বেঁকে গেছে, ঠাণ্ডা দেহ সাপের মতো। তার পেছনেও দেখা যায় কালো আকারের কিছু একটা। সামনের দেয়াল ও জাহাজের মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছে—নিঃশব্দ পাথরের মতো সমুদ্র, ঝোড়ো মেঘ তার উপর দিয়ে গুড়ি মেরে চলছে। নিঃশব্দ বিরাট শ্লথগতি ভয়ংকরের দল! তারা জগদ্দল ভারে সবাইকে চূর্ণ ক'রে দেবে ব'লে সেজে আছে। সমস্ত কিছুই ঠাণ্ডা, অশুভ সূচক, ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ।—গার্ভিলা যেনো চীৎকার ক'রে উঠবে। চেলকশের ভয়ের চেয়ে এই ভয় আরো মারাত্মক। হিমার্ত হাতে কে তার বুকের মধ্যটা যেনো থাবা দিয়ে ধ'রে জমাট বাঁধিয়ে দিয়েছে, নৌকোর গলুইর উপরে তাকে পুঁতে রেখেছে,—একটা ভীরু মাংসপিণ্ডের মতো।

চারদিক নিঃশব্দ, নীরব। তার মাঝে সমুদ্রের একটানা দীর্ঘশ্বাস। মেঘেরা সমুদ্রের উপরে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে, ঠিক আগের মতোই। আকাশও যেনো একটা সমুদ্র, কিন্তু নীচের ঐ শান্ত মসৃণ ঝিমন্ত সমুদ্রের উপরে সে এক বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। মেঘেরা কুঞ্চিত ধূসর ফেনার মতো পৃথিবীতে ঝাপটে পড়ছে, মহাশূন্যে গিয়ে হাওয়ার চোটে আবার ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর, উত্তাল মেঘ-তরংগদল,—এখনো যারা ভয়ানক সংঘাতের ফেনিল কুজ্ঝটিকার মধ্যে হারিয়ে যায়নি,—তাদের গায়ের উপরে গিয়ে বারবার আছড়ে পড়ছে।

নিঃশব্দ এই বিষণ্ণ সৌন্দর্য গার্ভিলাকে চেপে ধরলো যেনো। সে একান্তভাবে তার মনিবের জন্য প্রতীক্ষা করছিলো। যদি সে না আসে, তবে? ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সময় চলেছে, আকাশের গুড়ি-মেরে-চলা মেঘের চেয়েও আস্তে। যতই সময় যেতে লাগলো—নিস্তব্ধতা আরো ভয়ানক অমংগলের মতো হ'য়ে উঠ্‌লো। পোতাশ্রয়ের বাঁধের ওখানে জলের ঝাপটা, কলকল শব্দ, ফিসফিস কথা। মনে হ'লো, গার্ভিলা ভয়ে এক্ষুনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়বে।

"এঃ, ঘুমোলে? এই ধরো, সাবধান!"—চেলকশের ফাঁপা স্বর।

দেয়ালের উপর থেকে ত্রিকোনাকার ভারী কি একটা নীচে ফেলানো হলো। গার্ভিলা

নৌকোয় তুললো অমন আরো কয়েকটা,—তারপর চেলকশের লম্বা পা ঝুলে ঝুলে নেবে এলো, দাঁড়গুলি কোত্থেকে বেরিয়ে এলো, গাভ্রিলার ব্যাগ তার পায়ের কাছে ধপ্ ক'রে পড়লো এবং চেলকশ খুব বড়ো ক'রে একটা শ্বাস টেনে নিয়ে হাল-গলুইতে গেলো।

গাভ্রিলা খুসীভরে ভীরুর মতো একটু হেসে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"ক্লান্ত?" "তা না তো আরাম? অপদার্থ! এবার খুব জোরে চালাও। বেশ হোলো আজ! দোস্ত! আর্ধেকটা কাজ হ'য়ে গেলো। এখন শুধু পাজি-ব্যাটাদের নাকের তলা দিয়ে গলে যেতে পারলেই হয়। তারপর তোমার পিয়ারীর কাছে চ'লে যাবে। তোমার একজন পিয়ারী আছে, না? কিরে বাচ্চা?"

"ন্-না"—গর্ভিলা আপ্রাণ চেষ্টায় দাঁড় টানতে লেগে গেছে। বুকের ছাতিটা বারবার ছুটো ঢেউয়ের মতো উঁচিয়ে উঠছে, হাত ছুটি ষ্টিল-স্প্রীংএর মতো বারবার বেড়ে উঠছে। নৌকোর নীচে জলের কলকলানি, পেছনের নীল আলো আরো মোটা হ'য়ে ঘুরছে। গার্ভিলা ঘামে একেবারে ভিজে গেছে, তবু তখনও সে প্রাণপণে এগোচ্ছে। এক-রাতে ছু ছুবার মৃত্যু-ভয় থেকে বেঁচে উঠে সে তৃতীয়বারের জন্য আশংকায় কাঁপতে লাগলো। শুধু একটি মাত্র আকাংখা একান্তভাবে জেগে আছে তার প্রাণে: এই অভিশপ্ত কাজ যতো শিগগির শেষ করা যায়—যতো শিগ্গির তীরে এসে ওঠা যায়, আর এই লোকটার আওতা থেকে একেবারে পালিয়ে যাওয়া যায়—এবং তাকে তার সত্যসত্যিই খুন ক'রে ফেলার বা জেলে পুরে দেবার আগেই। স্থির করলো সে, কোনো কথাই আর বলবেনা, বিরুদ্ধতা করবেনা, যা সে বলবে শুনবে, আর যদি সে তার মুঠো থেকে একবার ছাড়া পায় তবে কালকেই মানত্ করে আসবে পীর-দরগায়। একটা আকুতি-ভরা প্রবল প্রার্থনা তার বুক থেকে ঠেলে উঠছিলো যেনো,—কিন্তু সামলে নিয়ে সে ব'সে রইলো, বাষ্প-ইঞ্জিনের মতো কেবল নিশ্বাস ফেলতে লাগলো, ভুরুর নীচ দিয়ে চেলকশের দিকে তাকিয়ে রইলো নিঃশব্দে।

চেলকশের লম্বা শীর্ণ দেহ সামনে ঝুঁকে-পড়া, উড়বার মুখে পাখীর মতো; তার ভীষণ শকুনে-দৃষ্টি সামনের অন্ধকারে নিবদ্ধ। তার লুব্ধ বর্শার মতো নাকটা সে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে একহাত দিয়ে হালের হাতলটা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরলো, অন্য হাত গোঁফ পাকাতে ব্যস্ত, ওষ্ঠ ছুটি হাসিতে কুঞ্চিত।

চেলকশ এখন সবকিছুতেই বেশ সন্তুষ্ট, তার নিজের উপরে ও ছেলেটির উপরে। ছেলেটি কী ভীরু,—একেবারেই চাকর ব'নে গেছে। খুব পরিশ্রম করছে সে,—তাই চেলকশ তাকে উৎসাহ দিতে চাইলো।

"এঃ"—আস্তে একটা শব্দ ক'রে সে বললো—"খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না ?"

"তা না !"—গাভ্রিলা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও গলা পরিষ্কার ক'রে নিলো।

"দেখো, এখন আর দাঁড় টেনে পরিশ্রম না করলেও চলবে। আরাম ক'রে নাও ! একটা জায়গা আছে শুধু, গা-ঢেকে পেরোবার ! একটু বিশ্রাম নাও এখন !"

গাভ্রিলা বাধ্য জীবের মতো থামলো, সার্টের নীচটা দিয়ে ঘাম মুছে নিলো এবং জলে আবার দাঁড় ফেললো।

"এবার খুব আস্তে, জলে ফেনা না ওঠে। এখন শুধু গেটটা। আস্তে, আরো আস্তে ! বুঝলে দোস্ত ! তারা কিন্তু সাংঘাতিক লোক। এক পলকেই সাবাড় ক'রে দিতে পারে। মাথার উপর এমন এক ঘা লাগিয়ে দেবে যে 'বাপ্' বলতে আর সময় পাবে না !"

নৌকাটা এখন জলের উপর দিয়ে এগোতে লাগলো প্রায় নিঃশব্দেই। দাঁড় থেকে শুধু ফোঁটা ফোঁটা জলে পড়ছে, আর সেখানে একটু নীল আলো জ্ব'লে উঠছে ! রাত্রি আরো স্তব্ধ ঘন হয়ে এসেছে। আকাশে কোনো তারা নেই, মেঘেরা সমস্ত জায়গা জুড়ে বিরাট এক কালো চাঁদোয়ার মতো নীচু হ'য়ে জলের উপরে ঝুলে আছে। সমুদ্র এর চেয়ে আরো শান্ত, আরো কালো ; জলের নোনা গন্ধের ঝাঁঝ এখন ভয়ানক রকম উগ্র।

"আঃ, বর্ষা হোতো যদি !"—চেলকশ ফিসফিস্ ক'রে বললো। "তা হ'লে সোজা বেরিয়ে যেতাম, আড়াল দিয়ে !"

নৌকোর ডানে বায়ে কতগুলি গাঁদা-বোট দাঁড়িয়ে, কালো জলের মধ্য থেকে উঠে আসা বাড়ীর মতো। নিশ্চল কালো ; নিঃশব্দ গম্ভীর। উপরে আলো নড়ছে, কেউ নিশ্চয়ই বাতি নিয়ে ওঠা-নামা কচ্ছে। সমুদ্র মিনতির মতো তাদের দুপাশে ফাঁপা শব্দ ক'রে চলছে, তাদের সে কী ঠাণ্ডা প্রতিধ্বনি,—যেনো কোনো কিছুর কাছেই তারা

হার মানবে না। "পাহারাওয়ালা শালারা!"—চেলকশের গলা শ্বাস ফেলার চেয়েও ক্ষীণ।

যে মুহূর্ত থেকে চেলকশ গাভ্রিলাকে আরো আস্তে নৌকা চালাতে বলেছে, তখন থেকেই তাকে যেনো এক অমংগল প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় পেয়ে বসলো। অন্ধকারে ঘাড় বাড়িয়ে ক্রমেই যেনো সে দীর্ঘ হ'য়ে এলো; তার হাড় ও স্নায়ু ব্যথা লাগার মতো টান হ'য়ে গেলো, একটি মাত্র ভাবনা ব্যস্ত মাথার মধ্যে কামড় মারছে, পিঠের চামড়া কুঁচকে উঠেছে, তার পায়ের মধ্যে যেনো তুহিন-তীক্ষ্ণ অজস্র পিন ও সূঁচ ঢুকে গেছে! অন্ধকারে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ধ'রে গেছে তার; শংকিত একটা প্রতীক্ষা,—অন্ধকারের মধ্য থেকে যে কোনো মুহূর্তে একটা কিছু লাফ দিয়ে এসে ধমকাতে পারে: "চোরের দল, থাম, এখানে।"

চেলকশ যখন এবার 'পাহারাওয়ালা' শব্দটা চুপি চুপি তার কানের কাছে বললো—গার্ভিলা যেনো আঁৎকে উঠ্‌লো। একটা তীব্র ঝলসানো ভাবনা তার মধ্য দিয়ে পুড়ে চ'লে গেলো, তার সটান স্নায়ুতে ঝাঁকানি লাগলো; একটা অদম্য ইচ্ছা জাগলো—তার সহায় হ'তে সবাইকে ডাক দেবার জন্য। তার ওষ্ঠ ফাঁক হ'য়ে গেলো; বসবার জায়গা থেকে অর্ধেকটা উঠে পুরো একটা দম টেনে নিয়ে চীৎকার ক'রেই উঠ্‌ছিলো—কিন্তু হঠাৎ চোখ বুঁজে আবার আগের জায়গায়ই ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়লো—যেনো ভয়ানক একটা চাবুক 'সপাৎ' ক'রে তার সমস্ত শরীরে এসে কেটে পড়েছে।

নৌকোর সামনে দূর দিক-চক্রবালে সমুদ্রের কালোজল থেকে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা নীলাভ অগ্নি-অস্ত্র; রাতের অন্ধকারকে দুখণ্ড ক'রে ছিঁড়ে মেঘের মধ্য দিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়েছে তার ফলা, সমুদ্রের বুকের উপর তার নীল প্রশস্ত ছায়া, আঘাতের দাগের মতো। সেই আলো-পথে অন্ধকারের মধ্য থেকে হঠাৎ এবার জেগে উঠ্‌লো রাতের কুয়াসা ঢাকা অনেক জাহাজ,—কালো নিস্পন্দ নীরব। মনে হোলো যেনো তারা এতোদিন অত্যাচারী সমুদ্রের ভীষণ দাপটে তলদেশে বন্দী হ'য়ে ছিলো; আর এখন, সমুদ্রজাত এই নীল অগ্নি-অস্ত্রের নির্দেশে তারা উপরে জেগে উঠেছে এবং আকাশ ও জলের দিকে চেয়ে আছে। তাদের মাস্তুলের উপরে জড়ানো রয়েছে দড়ি-কাছি,—সমুদ্রতল থেকে

উঠ্‌বার সময় তাদের গায়ে গায়ে যেনো আটকে প'ড়েছে নানা শস্পদল। এই ভয়ংকর নীল অস্ত্র একবার সমুদ্র থেকে উপরে উঠে এসে অন্ধকার রাত্রিকে দুখণ্ড ক'রে ফেলছে; আবার অতর্কিত আঘাতের মতোই অন্য দিকে গিয়ে পড়ছে। সেখানেও জেগে উঠ্‌ছে নতুন নতুন জাহাজ-শ্রেণীর ছবি।

চেলকশের নৌকা যেনো দ্বিধায় দুলতে লাগলো। গার্ভিলা নৌকোর তলায় উবুড় হ'য়ে আছে, হাত দিয়ে সজোরে চোখ চাপা। চেলকশ তাকে পা দিয়ে খোঁচা দিয়ে চাপা গর্জনে কিন্তু নরমভাবে বললো,—"আচ্ছা বোকা, ওটা কাষ্টম ক্রুজার, আর ওটা বিজলী আলো। ওঠো এখন! এই এক্ষুনি আমাদের দিকে আলো ঘুরোবে। নিজের মাথা নিজে খাবে হারামজাদা, আমাকে শুদ্ধ খাবে। চলো!"

তার পায়ের বুটের একটা জোর ঘা যখন গার্ভিলার গায়ে এসে লাগতেই সে লাফ দিয়ে উঠলো, চোখ তখনো বোজা; নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো সেও দাঁড় হাতড়ে নিয়ে বাইতে লাগলো।

"আস্তে, একেবারে থুইয়ে দেবো। আগেই বলিনি? হ্যাঁ, আস্তে! গোল্লায় যা গে হারামজাদা! ভয়টা কিসের, বোকা! একটা বাতি। ব্যস্, ব্যাপারটা তো এই! আস্তে দাঁড় টান, উল্লুক। চোর-গুণ্ডা খুঁজে ফিরছে তারা। অবশ্যি পাবে না আমাদের, বেশী দূরে স'রে গেছে। ভয় নেই, বাচ্চা, আমাদের পাবে না তারা, আমরা এবার"— চেলকশ গর্বভরে চারিদিকটা একবার তাকিয়ে দেখলো। "ব্যস্! হ'য়ে গেলো সব, নাগালের বাইরে এসে গেছি! ফুঃ! এসো দোস্ত, বরাত ভালো তোমার। কিন্তু আস্তো একটি বোকা তুমি!"

গার্ভিলা নিশ্চুপ,—দাঁড় টানছে, হাঁপাচ্ছে আর দেখছে কোথায় সেই নীল অস্ত্র উঠছে আর নামছে। সে কিছুতেই চেলকশের কথা বিশ্বাস করতে পারছেনা। শুধুও একটা যান্ত্রিক আলো! যে নিষ্ঠুর নীল আলো অন্ধকারকে চিরে দুটুকরো ক'রে সমুদ্রকে পর্যন্ত ঝলসে দিয়েছে—নিশ্চয়ই তার মধ্যে অবর্ণনীয় ও অমংগলজনক কোনো আছে; গার্ভিলাকে তা একটা করুণ ভয়ের নেশায় বিমূঢ় ক'রে রাখলো। যন্ত্রের মতোই সে বেয়ে চললো, কুঁচকে দলা পাকিয়ে,—যেনো উর্ধ্ব থেকে একটা আঘাত এক্ষুনি এসে পড়বে।

তার মধ্যে এখন কোনো চিন্তা বা ইচ্ছার আলোড়ন বা অপেক্ষা নাই, শূন্য প্রাণহীন সে। সেই সাংঘাতিক রাত্রি তার মধ্যের যা-কিছু মানবীয় সমস্তই কামড়ে কামড়ে গ্রাস ক'রে ফেলেছে।

চেলকশের এখন বেশ বিজয় ভংগী। পরিশ্রমে অভ্যস্ত তার স্নায়ুতন্ত্রী ইতিমধ্যেই বিশ্রাম পেয়ে গেছে। তার গোঁফ জোড়া উল্লাসে নড়ছে, চোখে উৎসুক দীপ্তি। চমৎকার লাগছিলো তার, দাঁতের ফাঁকে সে শিষ দিয়ে ফিরছে, আর উতাল সমুদ্র বাতাস প্রাণ ভরে টেনে নিচ্ছে। অন্ধকারে সে চারিদিকে কেবল তাকাতে লাগলো এবং গার্ভিলার দিকে চোখ পড়তেই মিষ্টি ক'রে হাসলো।

হাওয়া দিতে লাগলো; ছোট ছোট ঢেউয়ের নাচে জেগে উঠেছে সমুদ্র। মেঘেরা স্বচ্ছ ও হালকা হ'য়ে এসেছে। আকাশ তখনো মেঘে ঢাকা। হাওয়া তেমন জোরালো না হ'লেও সমুদ্রের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে ব'য়ে চলেছে,—মেঘেরা তবু নিথর নিশ্চল, তারা যেনো কোন ধূসর দুঃস্বপ্ন দেখছে।

"দোস্ত্, ঠিক হ'য়ে নাও এবার। বাঃ রে! এ কী হচ্ছে। যেনো সমস্ত হাওয়া বেরিয়ে চুপসে গেছো, এক ঝুড়ি হাড়ই প'ড়ে আছে মাত্র! সব তো চুকেই গেলো, হ্যাঁরে!"

কারও সাহসের কথা শুনতে গার্ভিলার ভালো লাগছিলো,—হোক বা সে চেলকশের।

"শুনেছি"—সে আস্তে আস্তে বললো।

"তাহ'লে, দুধের বাচ্চা, এসো এদিকে! এখানে হালে এসে বসো, আমি দাঁড় টানছি এবারে। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত তুমি!"

গার্ভিলা যন্ত্রের মতোই জায়গা বদলালো, চেলকশ তার সংগে জায়গা বদলাতে গিয়ে গার্ভিলার দিকে তাকিয়ে দেখলো যে তার পা কাঁপছে, টলছে সে। ছেলেটির জন্য তার আবারো খুব দুঃখ হোলো। তার কাঁধে সে হাত চাপড়ে বললো:

"হ'য়েছে, হ'য়েছে, আর ঘাবড়িওনা। আজকে বেশ কিছু আয় ক'রে নিয়েছো! তোমাকে অনেকটাই দিয়ে দেবো। পঁচিশ রুব্‌ল? কেমন?"

"আমি,—আমি কিছুই—চাইনে। শুধু তীরে যাবো!"

চেলকশ তার লম্বা হাতটা অনেক দূর পর্যন্ত ছুড়ে 'থপ্' ক'রে থুথু ফেললো এবং দাঁড়টা টানতে আরম্ভ করলো।

ঘুম থেকে জেগে উঠেছে সমুদ্র। ছোটো ছোটো ফেনিল ঢেউয়েরা চঞ্চল খেলায় দুলে দুলে একটা আর একটার উপরে ঝাপিয়ে পড়ছে, আর সুন্দর জল কণা উড়ে চলেছে।

ফেনরাশি গ'লে গ'লে হিস্ হিস্ কচ্ছে, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে; সমস্ত কিছুই জলোচ্ছ্বাস ও কলশব্দে সংগীত-মুখর। সমুদ্রজোড়া অন্ধকার যেনো আরো জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে।

"আচ্ছা?"—চেলকশ সুরু করলো। "তুমি তো এবার গাঁয়ে ফিরবে এবং বিয়ে করবে, চাষ করবে, ফসল ফলাবে, বৌয়ের বাচ্ছাকাচ্ছাও হ'লো, তারপর খাবার জুটবেনা, কাজেই সমস্ত জীবনটা শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে। আচ্ছা, এর মধ্যে কি এমন মধু?" "মধু, তা বলতে কি"—গার্ভিলা ভীরুভাবে কম্পিত গলায় বললো—"খুব একটা কিছু না।"

এখানে সেখানে হাওয়ারা মেঘ দলকে ফুটো ক'রে দিচ্ছে। তারি ফাঁক দিয়ে দেখা যায় এক টুকরো নীল আকাশ, আর একটা ছুটো তারা। লীলা-চঞ্চল সমুদ্রের ঢেউয়ের উপরে প্রতিফলিত তারাগুলি নাচছে, অন্ধকারে নিভে যাচ্ছে, আবার জ্ব'লে উঠছে।

"আরো ডান মোড়ে!"—চেলকশ বললো। ওইখানে পৌঁছে গেলেই, ব্যস, সব কাবার। পাওয়া গেছে যথেষ্টই! একটা রাত, ব্যস্ হাতে পেলে পঁচিশটা রুবল। এঃ কি বলো হে।"

"পঁচিশ?"—গার্ভিলা বিস্ময়ে টেনে টেনে উচ্চারণ করে। "সবটাই পেতাম আমি।"—দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। হঠাৎ মনে পড়লো তার নিজের সেই ছোট্ট জমিজমা, দারিদ্র, তার মা—তার প্রাণের প্রিয় সমস্ত কিছু,—কিন্তু সেসব এখন এতো দূরে! তার জন্যেই তো সে কাজ খুঁজতে বেরিয়েছে, এই রাতে এতো যন্ত্রণা সহ্য করছে। তার গ্রামের কতো স্মৃতির জোয়ার ভেসে এলো, পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে বেয়ে নদীর পাড়ে সেই বিরাট পাইন-ঝাউ দেবদারু বনের গভীরে তা ধীরে ধীরে হারিয়ে গেলো! "আঃ, কী চমৎকারই হ'তো।"

—ব্যথা-ভরে সে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"ঠিকই ধ'রেছি, তা' হ'লে সোজা গাড়ী চেপে বাড়ী ছুটবে এখন! সেখানে মেয়েরা এসে কতো প্রণয় করবে, তাই না? যাকে খুশী পাকড়ে নেবে; নিজেই একটা বাড়ী করবে। না অতো টাকা পাবে কোথায়?"

"তা ঠিক, সে হবেনা। আমাদের দিকে কাঠ চড়া।"

"হোক না, পুরোণোটাই সেরে নেবে। একটা ঘোড়া চাইনা? নিজের আছে?"

"ঘোড়া? তা—বুড়ো কাহিল রকম!"

"তবে একটা ঘোড়াও কিনে নেবে; চমৎকার একটা! একটা গরু, একটা ভেড়া, নানা রকম মুরগী। আঃ।"

"থাক্, আর ব'লোনা। সত্যিই পেতাম যদি! আঃ ভগবান—জীবনটা কী সুন্দরই হ'তো যে!"

"আঃ দোস্ত, সব দোবো তোমায়। নিজের তো বিবেক আছে একটা! আমার নিজেরই বাড়ী ছিল একদিন। গাঁয়ের মধ্যে সব চেয়ে ধনী ছিলো আমারই বাবা।"

চেলকশ ধীরে ধীরে দাঁড় চালাচ্ছিলো। ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৌকোটা দুলছে—কিনারে কিনারে জলের হালকা ঝাপটা। বড়ো একটা চলছে না নৌকা,—সামনে জলের চঞ্চল খেলা। দুলে-ওঠা নৌকোতে ব'সে দু'টী লোক স্বপ্নে-বিভোর, বিষণ্ণভাবে তারা চারিদিকে তাকাচ্ছে। গার্ভিলার মধ্যে উৎসাহ ও আশা জাগাবার জন্য চেলকশ গ্রামের দিকে তার চিন্তা ঘুরিয়ে দিলো। প্রথমে অবিশ্বাসের সুরে চিবিয়ে চিবিয়ে নিজের কাছেই বলছিলো সে—কিন্তু সংগীর কথার উত্তর দিতে গিয়ে এবং তাকে গ্রাম্য জীবনের মাধুর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে ক্রমেই সে স্মৃতির রাজ্যে ভেসে চললো। নিজেও সে আজ কতোযুগ হ'লো গাঁ থেকে এসেছে, প্রায় ভুলেই গেছে সব! কৃষাণ-ছেলেটিকে তার গ্রামের কথা জিজ্ঞেস না ক'রে নিজেই যেনো কেমন অজ্ঞাতে সে বর্ণনা সুরু করলো,—

"পল্লী জীবনে সবচেয়ে বড়ো সুখ হ'লো স্বাধীনতা। তুমি নিজেই নিজের প্রভু। তোমার নিজের বাড়ী রয়েছে, হোকনা কানাকড়ি তার দাম,—তোমার একান্ত নিজেরি তো। জমিজমা র'য়েছে, একটুকরা হ'লেও নিজের মাটিতে তুমি রাজার মতো! স্বাধীন স্বচ্ছন্দ মানুষ তুমি, প্রত্যেকের কাছেই মান সম্মান, ঠিক তাই, না?"

গার্ভিলা তার দিকে উৎসাহ ভরে তাকালো এবং সে নিজেও এই সুখ-স্মৃতিতে ডুবে গেলো। গার্ভিলা ভুলে গেলো, কার সংগে কথা কইছে, চেলকশ যেনো তারি মতো এক কৃষক, যুগে যুগে বংশে বংশে কতো শ্রমের ঘাম দিয়ে চিরদিনের মতো মাটির সংগে নিবিড় ক'রে গাথা, শৈশবের কতো স্মৃতি দিয়ে বাঁধা। সে সেই দুঃখের বাঁধন স্বেচ্ছায়ই ছিঁড়ে ফেলেছে, এবং আজ এই বিচ্ছেদের অনিবার্য শাস্তি ভোগ করছে।

"ঠিক বলেছো ভাই, খুব সত্যি কথাই! একবার নিজের দিকেই চেয়ে দেখোনা? মাটির কোল ছেড়ে তুমি কি হ'য়েছো? আহা, মাটি তো মায়ের মতো, ভাই! বেশীদিন তাকে ভুলে থাকা যায় না।"—বলে গার্ভিলা।

চেলকশ হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে যেনো দিবা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো। তার বুকের সেই পোড়ানি আবার জ্ব'লে উঠ্‌লো,—প্রায়ই এমন হয় তার যখনি তার দুঃসাহসী গর্বে এসে কেউ আঘাত দেয়, বিশেষ ক'রে নগন্য কেউ যখন আঘাত দেয়।

"জিভ্‌টা চটর চটর করছে তো খুব! উপড়ে ফেলবো নাকি?" হিংস্রের মতো বললো সে,—"ভেবেছো, সত্যি সত্যিই বলেছি এসব না, কক্ষনো না!"

"বেশ মজার লোক তো,"—গার্ভিলা ভয়ানক ভয় পেয়ে বললো,—"তোমার কথা বলছি নাকি? কেনো, তোমার মতো এমনি কতোই তো আছে! আঃ, দুনিয়াতে কতো যে দুর্ভাগা, কতো যে ভবঘুরে—"

"দাঁড় ধর, ব্যাটা হাঙর।"—চেলকশের সংক্ষিপ্ত আদেশ। কোনো কারণে তার বুক থেকে গলা অবধি বিষিয়ে ঠেলে-ওঠা গালিগালাজের বন্যা সে চেপে রাখে।

আবার জায়গা বদল হয়। বস্তাগুলোর উপর দিয়ে যেতে যেতে চেলকশের অদম্য ইচ্ছা জাগে গার্ভিলাকে এক লাথিতে উড়িয়ে ফেলে দেয় সমুদ্রের জলে।

সংক্ষিপ্ত কথাবার্তাও বন্ধ হ'লো এবার। চেলকশের মনে হোলো,—গার্ভিলার এই নিস্তব্ধতাও যেনো পল্লীর স্মৃতিতে মুখর। অতীতের কতো কথা জেগে উঠলো তার প্রাণে, হাল ধরতেও মনে রইলো না। খেয়ালহারা নৌকো স্রোতের টানে ভেসে চললো সাগরের দিকে! ঢেউয়েরাও যেনো বুঝতে পেরেছে, নৌকাটা পথ হারাচ্ছে, খেলাভরে আস্তে

আস্তে তারা নৌকোটাকে উচুঁতে উঁচুতে দোলা দিতে লাগলো, আর দাঁড়ের তলে তলে জ্ব'লে উঠলো নীল বাতি। চেলকশের সামনে ভেসে চলেছে অতীতের, দূর-অতীতের কতো ছবি! আজ থেকে তেরটি বছরের বিরহ-ব্যবধান। সে দেখতে থাকে: ছোট্ট শিশুটি সে, তার গ্রাম, তার মা-মায়ের নরম ধূসর দুটি চোখ; আর তার বাবা, কঠিন মুখ ও লালচে দাড়ি ছিলো তার। তারপরে এলো প্রেম, তার বৌ আন্টিসা, তার কালো চোখ-দুটি ছিলো কী নরম ব্যথাভরা, লম্বা বেণী বুকের উপর দোলানো, মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সে গার্ড-সৈন্য হ'লো, তখন সে সুন্দর যুবকটি। তারপর, তার বাবার চুল শাদা হ'য়ে গেলো, শ্রমে ভেঙে পড়লেন, মার মুখে কুঞ্চিত রেখা পড়লো, কুঁজো হ'য়ে গেলেন তিনি।...একটা দিনের সে কি দৃশ্য!—সে যখন যুদ্ধ থেকে বাড়ী ফিরে এলো। সমস্ত গাঁয়ের সামনে তার বাবার বুক গর্বে ফুলে উঠলো সেদিন। তার এই গ্রিগরি—লম্বা-চওড়া গোঁফওয়ালা সুন্দর চটপটে ছেলে গ্রিগরির জন্য! স্মরণ-স্মৃতি দুর্ভাগাদের জীবনে ব্যথা জাগিয়ে তোলে, অতীতের পাষাণে পর্যন্ত প্রাণ সঞ্চার ক'রে রাখে। এমন কি, সেদিনের বিষের পাত্রও নতুন ক'রে মধুর রসে উছলে পড়ে......

চেলকশের চারিদিকে যেনো নিজের বাড়ীর দরদী আবহাওয়া। মার কতো আদরের কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে তার গম্ভীর বাবার কাজকর্ম, দামী উপদেশ! কতো বিস্মৃত কাকলী, সা-মাটির সরস গন্ধ, সদ্য-গোলা চাষ-করা মাটির! দুদিনেই সবুজ শস্যের রেশমী আস্তরণে ঢেকে যায় সব। আর এখন নিজকে তার মনে হোলো বিধ্বস্ত ভগ্ন নিঃসংগ ছিন্নভিন্ন। যে জীবন তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত রক্তকে পবিত্র ক'রে রেখেছিলো—সেই জীবন থেকে আজ সে চিরদিনের মতো নির্বাসিত!

"এঃ, যাচ্ছো কোথায়?"—গার্ভিলা হঠাৎ ব'লে ওঠে। চেলকশ চমকে উঠলো, চারিদিক তাকিয়ে দেখলো, চোখে তার শিকারী পাখীর সতর্ক দৃষ্টি!

"আঃ, নৌকোটাকে শয়তানে ঠেলে নিচ্ছে। ঠিক আছে, একটু জোরে চালাও। এই সোজাই ওখানে পৌছাচ্ছি।"

"তুমি স্বপ্ন দেখছিলে?"—চেলকশকে হাসিমুখে জিজ্ঞেসা করে গার্ভিলা।

"হাঁ, খুব ক্লান্ত আমি!—"

"এখন তা হ'লে, মনে হচ্ছে, এগুলো নিয়ে আর ধরা পড়বো না ?"—গার্ভিলা পা দিয়ে ছালাটা ঠুকে দেখালো।

"না, নিশ্চিন্ত থাকো। এটা তাদের সোজা হাতে হাতে দিয়ে দেবো, আর টাকাটাও নেবো হাতে হাতে। ব্যস !"

"পাঁচশ ?"

"একটি পয়সাও কম না, ঠিকই বলছি।"

"ইস্, সে-যে অনেক ! আমি, এই হতভাগ্য আমি পেতাম যদি ! কী চমৎকার হ'তো আমার।"

"তোমার নিজের বাড়ীতে ?"

"আলবৎ, চ'লে যেতেম সোজা……"

সংগে সংগেই স্বপ্নে ভেসে চললো গার্ভিলা। চেলকশ নীরব। তার গোঁফ নীচু হ'য়ে নেমেছে, তার দেহের বামপাশটা ঢেউয়ের ছলছলানিতে ভিজা, চোখ দুটি বসানো, নিষ্প্রভ। একটা ব্যথাভরা ভাবনা এসে তার শিকারী পাখীর মতো চেহারাটা ঢেকে ফেললো। সার্টের ভাঁজে ভাঁজেও তার মলিন ছায়া !

হ্যাঁচকা টানে সে নৌকাটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে লাগলো,—জলের মধ্য থেকে কালো কি একটা উঁচু হ'য়ে আছে—সেই মুখে।

আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে, কেমন সুন্দর বর্ষা নামলো, ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় তার বাজনা।

"সাবধান, স্থির হ'য়ে"—চেলকেশ আদেশ করলো। নৌকার আগে গলুইটা জাহাজের গায়ে হঠাৎ ধাক্কা খেলো।

"ব্যাটারা, ঘুমিয়েছে নাকি ?"—নৌকোর বর্শি দিয়ে জাহাজের একটা দড়ি টেনে ধ'রে চেলকশ গর্জে উঠলো : "হেই, মইটা নাবাও, ইস্, কী বিষ্টি ! আগে বিষ্টি এলে যেনো অশুদ্ধ হ'য়ে যেতো সব। হেই, কুম্ভকর্ণের দল।"

"চেলকশ নাকি ?"—মাথার উপরে বিড় বিড় ক'রে কে বললো যেনো।

"আরে, মইটা নাবাও না ?"

"কালিমেরা চেলকশ?"

"মইটা নাবাও আগে; ব্যাটা, গাঁজা খেয়েছো নাকি?"—চেলকশ চেঁচিয়ে ওঠে। "গার্ভিলা, ওঠো"—সংগীকে বলে সে।

একটু কালের মধ্যেই তারা জাহাজের ডকে গিয়ে পড়লো। সেখানে কালো কালো কয়েকটা দাড়িওয়ালা লোক কী এক বর্বর ভাষায় আলোচনা করছিলো, আর চেলকশের কাঁধের উপর দিয়ে নৌকোর দিকে তাকাচ্ছিলো। লম্বা আলখাল্লা পরা আর একটি লোক চেলকশের কাছে এগিয়ে এসে, নিঃশব্দে তার হাতে হাত দিলো ও গার্ভিলার দিকে সন্দেহ ভরে তাকাতে লাগলো।

"ভোরেই টাকাটা তৈরী রেখো।"—চেলকশ সংক্ষেপে জানালো। "এখন ঘুমুতে যাচ্ছি; এসো গার্ভিলা, ক্ষিদে পেয়েছে?"

"ঘুম পাচ্ছে।"—গার্ভিলা উত্তর দেয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জাহাজের এই নোংরা গহ্বরে তার গভীর নাসিকা গর্জন শোনা যেতে লাগলো। চেলকশ তার পাশে ব'সে অন্য কারো জুতো পরে দেখলো, তারপর ঝিমুতে ঝিমুতেই একদিকে থুথু ফেলে দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিষ দিতে লাগলো। এবারে সে গার্ভিলার পাশে শুয়ে প'ড়ে গোঁফ দুটো টানতে লাগলো।

জাহাজটা চঞ্চল জলে আস্তে আস্তে দুলছে, কোথায় যেনো বনের মধ্যে কর্কশ মড়্ মড়্ শব্দ, ডেকের উপরে বিষ্টির নরম আওয়াজ, জাহাজের গায়ে জলের ঝাপটা। সমস্ত কিছুই বিষাদে ভরা, চির-রুগ্ন ছেলের মায়ের ঘুম-পাড়ানী গানের মতো!

চেলকশ দাঁত বের ক'রে হেসে মাথা তুলে একবার চারিদিকে তাকালো, নিজের মনেই কি যেনো ফিস্ ফিস্ ক'রে আবার ঘুমিয়ে পড়লো……পা দুটো খুব ফাঁক হ'য়ে আছে। তাকে দেখাচ্ছিলো তখন মস্তো বড়ো একজোড়া কাঁচির মতো।

(৩)

চেলকশই প্রথম ঘুম থেকে উঠে অস্বস্তি ভরে চারদিকে তাকাতে লাগলো; কিন্তু তখনি আবার সংহত ভাব এনে ঘুমন্ত গার্ভিলার দিকে স্থির চোখে চেয়ে রইলো। নিশ্চিন্তে

সে নাক ডাকছিলো, ঘুমের মধ্যে তার রোদে-পোড়া, স্বাস্থ্য-উজ্জ্বল কিশোর মুখখানাই হাসছিলো যেনো। চেলকশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরু একটা মইয়ের দড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো। জাহাজের গায়ের গর্তের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় শিশে-রঙ্ একখণ্ড ফ্যাকাশে আকাশ, ভোরের ক্ষীণ আলো দেখা যায় শরতের বিষণ্ণ-ধূসর আকাশে।

দু ঘণ্টা পরে চেলকশ ফিরে এলো। তার মুখ বেশ রক্তাভ, গোঁফ দুটো বাঁকিয়ে উঠেছে আড়ম্বরের মতো। খুব মজবুত, উঁচু বুটজুতো পায়ে, গায়ে একটা জ্যাকেট, আর চামড়ার ব্রিচেজ—ঠিক একজন খেলোয়াড় যেনো। সমস্ত পোশাকই পুরোনো, কিন্তু মজবুত। মানিয়েছে তাকে চমৎকার, আরো চওড়া দেখাচ্ছে, শরীরের কোনাকার ভাবটা ঢেকে গেছে। দেখাচ্ছে ঠিক ঘোড়ার মতোই!

"এই বাচ্চা, ওঠো!"—চেলকশ তাকে পা দিয়ে একটা ঠেলা দেয়।

গার্ভিলা লাফ দিয়ে উঠে ব'সে চিনতে না পেরে আশংকায় তার দিকে সে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে। চেলকশ হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠলো।

"আচ্ছা? তোমাকে দেখাচ্ছে যেনো—" গাভিলা একেবারে দাঁত বের ক'রে হাসতে থাকে,—"এই যাকে বলে ভদ্রলোক!"

"হ্যাঁ, শিগগিরি রূপ বদলাই আমরা। কিন্তু, তুমি একটুতেই তো ভয়ে পেয়ে যাও বেশ? এই, কাল রাতে মরবার জন্য কবার মাথা কুটেছো? এঃ কি হে?"

"তা—ভেবে দেখো, এই কারবার জীবনে এই প্রথম! আর, একেবারেই তো শেষ হ'য়ে যেতে পারতাম।"

"আচ্ছা, আবার যেতে সাধ আছে? কেমন?"

"আবার? আচ্ছা,—তা—কী ক'রে বলি? কিসের চারে,—সেইটে হ'চ্ছে কথা।"

"বেশ, শ'য়ের দুনো হ'লে?"

"মানে দু-শ বলছো? তা,—পারি।"

"কিন্তু, বলছি কি,—তখন আত্মার দশা কি হবে তোমার?"

"হ্যাঁ, তা,—তা আর ছেড়ে যাবে কোথায়?

"না গেলেই ভালো, পরকালে কাজ দেবে।"—বেশ আমুদে ঢংএ হাসলো চেলকশ। "ব্যস্! যথেষ্ট ঠাট্টা হোলো! এখন পায়ে চলো।"

নৌকোয় উঠে চেলকশ বসলো সেই হালে, গাভিলা দাঁড়ে। উপরে ধূসর আকাশে মেঘগুলি ছড়ানো। ঘোলা সবুজে সমুদ্র তাদের নৌকোটাকে নিয়ে খেলছে, ঢেউয়ের উপর দুলিয়ে দিচ্ছে সশব্দে; আর, নোনাজলের ফোঁটা এসে পড়ছে। নৌকোর গলুইয়ের দিকে সামনে অনেক দূরে দেখা যায় বালুতীরের পীতাভ রেখা, নৌকোর পিছনের দিকে দূরান্তে প্রসারিত নৃত্যচঞ্চল উন্মুক্ত সমুদ্র,—চারদিকে ধাবন্ত তরংগদলের বন্ধুর পথ-চলার গভীর দাগ, স্থানে স্থানে চলিষ্ণু ফেন রেখা। দূরে অনেকগুলো জাহাজ চলছে সমুদ্রের বুকের উপরে। বাঁ দিকে দূরে মাস্তুলের পর মাস্তুলের অরণ্য, আর সহরের সাদা ছাদের বিস্তৃত ছবি। সেইদিক থেকে চাপা একটা গর্জন ঢেউয়ের ঝাপটার শব্দের সংগে একাকার হ'য়ে ধ্বনিত ক'রে তুলেছে এক আশ্চর্য-গম্ভীর সংগীত। চারিদিকে সবকিছুর উপরেই ছাই-রঙ্ কুয়াসার পাতল আবরণ, তার মধ্য দিয়ে সমস্তই মনে হয় যেনো আরো দূরে দূরে বিস্তৃত।

'আঃ! রাতে চমৎকার নাচনই সুরু হবে।'—চেলকশ সমুদ্রের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বললো।

"ঝড়?"—গার্ভিলা জিজ্ঞেস করলো। বেগে সে দাঁড় টানছিলো। সমুদ্র থেকে বাতাসের বেগে ব'য়ে-আসা জলকণার ঝাপটায় ঝাপটায় ইতিমধ্যেই সে ভিজে গেছে একেবারে।

'হ্যাঁ'—চেলকশ সায় দিলো।

গাভিলা উৎসুকভাবে তার দিকে তাকায়…

"তা হ'লে তোমাকে কতো টাকা দিয়েছে?"—শেষ পর্যন্ত সে নিজেই জিজ্ঞেস করলো,—চেলকশ আলোচনার মোড় কিছুতেই আর ওদিকে ফেরাচ্ছেনা।

"এই দেখো!"—চেলকশ পকেট থেকে কিছু টেনে এনে গাভিলার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

নানা-রঙের অনেকগুলি নোট। গাভিলার সামনে সমস্ত কিছু বিচিত্র রঙে নাচতে

লাগলো শুধু। "তাই তো আমি ভাবছিলাম, বুঝি বড়াই কচ্ছো শুধু? কতো তা হ'লে?"

"পাঁচশ, তার ওপরে আরো চল্লিশ।"

"চমৎকার।"—বিড়বিড় ক'রে বলে গার্ভিলা। লুব্ধ চোখ দিয়ে সে দেখছিলো: পাঁচশ চল্লিশ রুব্‌ল; চেলকশ টাকাটা আবার তার পকেটের মধ্য রাখলো। "এতোটা জীবনেও কোনোদিন...এত তোগুলো টাকা!"—তার দীর্ঘশ্বাস সম্পূর্ণ হতাশার।

"এবার আচ্ছা ক'রে খাওয়া যাবে, কেমন বাচ্চা?"—চেলকশ আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে যেনো,—"এঃ, যথেষ্ট পেয়েছি আমরা, কোনো ভয় নাই দোস্ত! তোমাকে তোমারটা দিয়ে দেবো। তোমাকে ৪০ রুব্‌ল,—খুসী তো? যদি চাও তো এখুনি দিয়ে দিচ্ছি।"

"যদি—তুমি কিছু মনে না করো, তা—আমি না বলতে চাইনা"।

অনিশ্চিত অস্থির উত্তেজনায়—হৃৎপিণ্ড থাবা দিয়ে ধরা কেমন একটা অস্বস্তিতে গার্ভিলা কাঁপছিলো। "হাঃ হাঃ হাঃ! ধর্মপুত্তুর! 'আমি না বলতে চাই না!' নাও, এই নাও দোস্ত, বাঃ রে, হ্যাঁ, এই নাও! এতো টাকা দিয়ে আমি কি যে করি,—কিছুই মাথায় আসছেন। তুমিই সাহায্য করো আমাকে, কিছু নিয়ে নাও, এই যে।" —চেলকশ কতগুলি নোট গার্ভিলার কাছে বাড়িয়ে ধরলো। কম্পিত হাতে গার্ভিলা সেগুলি নিয়ে দাঁড়টা ছেড়ে দিলো এবং টাকাটা বুকের মধ্যে পুরে রাখলো। তখন তার লুব্ধ চোখ দুটি গোল হ'য়ে গেছে, জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে সে, —যেনো গরম কিছুই এইমাত্র গিলে ফেলেছে। চেলকশ বিদ্রূপের হাসিতে তাকে লক্ষ্য করছিলো। গার্ভিলা আবার দাঁড়টা অস্থিরভাবে টানতে লাগলো, তাড়াতাড়ি ক'রে চোখ নামিয়ে—যেনো কোনো কিছুর ভয় কচ্ছে সে, তার কাঁধ ও মুখ কুঁচকে উঠেছে।

"লোভী তুমি! সেটা অন্যায়! কিন্তু হ্যাঁ,—তুমি অবশ্যি গেঁয়ো!"—চেলকেশ ভেবে বললো।

"কিন্তু টাকা দিয়ে কতো কী যে করা যায়।"—গার্ভিলা জোরেই বললো।

হঠাৎ সে কেমন এক উত্তেজনায় জেগে উঠ্‌লো; গ্রাম্যজীবনে টাকা থাকা আর না থাকা নিয়ে সে খুব বলতে লাগলো,—ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ক'রে। যেনো

সে তার তার চঞ্চল ভাবনাকে অনুসরণ করছে আর উড়বার মুখে কথাগুলিকে ধ'রে ফেলেছে— সম্মান, সচ্ছলতা, শান্তি এই সব কিছুর কথাই বলছিলো সে।

চেলকশ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো, মুখ তার গম্ভীর, দুটি চোখে স্বপ্ন! মাঝে মাঝে সন্তোষের একটুকরা হাসি। "এসে গেছি!"—চেলকশ গার্ভিলাকে বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো।

একটা ঢেউ এসে নোকাটাকে ধ'রে তীরে বালুর উপরে নিয়ে গেলো।

"এবারে হোলো তো? এসো দোস্ত, নৌকোটাকে অনেক উপরে টেনে তুলি, ঢেউয়ে ভেসে না যায়! যাদের নৌকা এসে নিয়ে যাবে'খন। আচ্ছা, তাহলে আজকের মতো বিদায়।—এখান থেকে সহর চার মাইল; তা হ'লে, কি ঠিক ক'রলে? সহরেই ফিরছো আবার? এ্যাঁ?"

খুসীর হাসিতে চেলকশের মুখখানা উজ্জ্বল; খুব আনন্দের কিছু একটা ভেবে রাখার মতো এবং গার্ভিলাকে বিস্মিত ক'রে দেবার মতো চেলকশের সমস্ত ভাবটা। পকেটের মধ্যে হাত দুটো পুরে সে নোটগুলিতে খস্‌খস্ শব্দ করতে লাগলো। "না—আমি যাবোনা, আমি—" গার্ভিলা হাঁপাচ্ছিলো, গলা যেনো কিসে আটকে ধরেছে। চেলকশ বিমূঢ়ের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলো,—"হোলো কি তোমার?"

"না……"—গার্ভিলার মুখখানা ঝলসে উঠে হঠাৎ কালো হ'য়ে গেলো; সে অস্থির অস্বস্তিভরে এগোলো. যেনো চেলকশের উপরেই লাফ দিয়ে পড়ার সংকল্প,—যেনো অসম্ভব কোনো আকাংখায় বিপন্নপীড়িত সে।

ছেলেটির এই উত্তেজনা দেখে চেলকশ বেশ খুসী হোলো। সে বিস্ময়ে উন্মুখ হ'য়ে রইলো: এই উত্তেজনা এখন কোন রূপ নেবে?

গার্ভিলা অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগলো, হাসিটা অনেকটা ফোঁপানির মতোই। তার মাথাটা আনত, মুখের ভাবটা চেলকশ দেখতে পাচ্ছেনা; গার্ভিলার কানটাই শুধু কিছুটা দেখা যায়, কানটা লাল হ'য়ে উঠে তারপরেই কালো হ'য়ে গেলো।

"কি হে,"—চেলকশ হাতটা দুলিয়ে দিলো, "প্রেমে পড়েছো নাকি? না, আর কিছু? ঠিক একটি মেয়ের মতো যে! আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে

গিয়েই এমন কচ্ছো? হাঁরে, বাচ্চা, বলো না কি ব্যাপার? নইলে চ'লে যাই সোজা!"

"চলে যাচ্ছো!"—গার্ভিলা চেঁচিয়ে ওঠে।

নীরব বালুবেলা যেনো চমকে উঠ্‌লো সেই চীৎকারে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে গ'ড়ে-তোলা পীতাভ বালুর বাঁধ কাঁপতে লাগলো। চেলকশও চমকে গেলো। সহসা গার্ভিলা চেলকশের পায়ের উপরে আছড়ে পড়লো, দুবাহু দিয়ে আকুলভাবে পা দুটি জড়িয়ে ধ'রে নিজের বুকের কাছে টেনে আনলো। চেলকশ তাল সামলাতে পারলো না, ধপ্‌ ক'রে বালুর উপরে ব'সে পড়লো এবং দাঁত কড়মড় ক'রে তার লম্বা হাতে শূন্যে ঘুসি তুললো। কিন্তু এক ঘা লাগবার আগেই সে গার্ভিলার করুণ মিনতি-ভরা ফিসফিস কথা শুনে থেমে গেলো:

"দোস্ত! দাও আমাকে,—ঐ সব টাকা আমাকে দাও, ভগবানের নাম ক'রে বলছি দাও। তোমার কাছে ও কিছুই না, একরাতেই উড়িয়ে দেবে তুমি,—একরাতেই; আর, আমার কাছে থাকবে চিরজীবন,—আমাকে দাও! তোমার মংগল প্রার্থনা ক'রবো; নিত্য দুবেলা, তিন তিনটা গির্জায় তোমার আত্মার মুক্তি কামনা ক'রবো। কেনো ছাইয়ে ঢালবে সব? আমি এ দিয়ে সোনা ফলাবো। ওঃ, আমাকে দাও! দাও!! ওর কোনোই মূল্য নেই, অর্থ নেই তোমার কাছে! খুব কষ্টও হয়নি; একটা রাত আর অম্‌নি এক বাক্স টাকা! এবার একটা পুণ্যের কাজ করো। তুমি তো গেছোই, তুমি জীবনে আর কখনো মোড় নিতে পারবে না; অথচ—আমি—আমি—ওঃ আমাকে দাও।"

চেলকশ বিষণ্ণ, বিস্মিত, ক্রুদ্ধ, বালুর উপরে ব'সে আছে, হাত দুটো পিছনে। নিঃশব্দে সে ব'সে আছে, চোখ দুটো ভয়ংকর ভাবে ঘুরছে কৃষাণ যুবকটির উপর;—সে তখনো চেলকশের হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে মিনতি জানাচ্ছে। এবার চেলকশ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো; পকেটের মধ্যে হাত দুটো ফস্‌ ক'রে ঢুকিয়ে নানা-রঙের নোটগুলি গার্ভিলার দিকে ছুড়ে দিলো।

"এই নে, খেঁকি কুকুর। খা নিয়ে।"—এই হীন জঘন্য পা-চাটা লোকটার জন্য তীব্র অনুকম্পা ঘৃণা আর উত্তেজনায় সে কাঁপতে কাঁপতে গর্জে উঠলো। গার্ভিলাকে এই টাকাটা ছুড়ে দেবার কালে নিজেকে এক বীরের মতোই মনে হ'লো তার।

"আমি তোমাকে আরো দেবো—ভেবেছিলেম। কালকে তোমার জন্য দুঃখই হচ্ছিলো! গ্রামের কথা মনে পড়ছিলো। আমি ঠিক করেছিলাম, আহা ছেলেটিকে সাহায্যই করবো। দেখছিলাম শুধু কি করো তুমি, টাকা চাও কি না? আর তুমি,—তুমি ইতর ভিক্ষুক পা-চাটা, এই সামান্য কটা টাকার জন্য নিজের উপরে এতোটা অত্যাচার? অপদার্থ হীন জঘন্য, লোভীর দল! নিজেকেও বিক্রী করো না, টাকা তো পাবে?"

"চিরজন্মের বন্ধু তুমি! ভগবান তোমার মংগল করবে। ইস্, কতো টাকা পেয়েছি! আমি তো এখন বড়লোক!"—গার্ভিলা আনন্দে আবেগে কাঁপতে কাঁপতে ব'লে উঠলো। "আঃ, কী ভালো তুমি! জীবনেও ভুলবোনা তোমাকে, কক্ষনো না। আমার বৌ, ছেলেমেয়েরা—তারাও তোমার জন্য প্রার্থনা করবে!"

চেলকশ তার চীৎকার ও উৎসাহের প্রলাপ শুনছিলো। লুব্ধ-সুখে কুঞ্চিত গার্ভিলার উজ্জ্বল মুখের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে ভাবছিলো। নিজে সে চোর লম্পট, জীবনের সর্বত্র থেকে তাড়িত; কিন্তু তার পক্ষেও কক্ষনো এতো নীচ ও লোভী হওয়া সম্ভব না, নিজেকে ভুলে যাওয়া সম্ভব না! এই ভাবনা ও চেতনা তার মধ্যে একটা পূর্ণ স্বাধীনতা-বোধ জাগ্রত ক'রে রাখলো। বিষণ্ণ-নির্জন সমুদ্রতীরে গার্ভিলার পাশেই সে দাঁড়িয়ে।

"তুমি আমাকে চির জন্মের মতো উদ্ধার ক'রেছো!"—গার্ভিলা চেঁচিয়ে উঠে চট্ ক'রে চেলকশের হাত জড়িয়ে ধরলো।

চেলকশ বীরের মতো একটু একটু হাসছিলো নীরবে। গার্ভিলা তখনো প্রাণ খুলে ব'লে চলেছে:

"জানো, আমি কি ভেবেছিলেম? এখানে নৌকোয় আসতে আসতে···দেখলাম··· টাকা···তখন ভাবছি,···সোজা···তোমাকে···তোমাকে···দাঁড় দিয়েই এক ঘা! সব টাকা আমার,···লোকটা—মানে এই তুমি সমুদ্রের জলে···মানে, তখন, হ্যাঁ কে আর তোমাকে

খুঁজে পাবে? ভাবছিলাম আর যদি পায়ই বা, কেউ কখনো খোঁজ নিতে আসবে না— লোকটাকে মেরেছে কে? লোকটা তো মানুষ না, তাই কোনো নাড়াচাড়াও হবে না, দুনিয়ার আপদ চুকে গেলেই ভালো। তার জন্যে আবার মাথা ব্যথা কার? কারো না—হাঃ হাঃ।" "দে, দে এক্ষুনি সব টাকা—"চেলকশ গার্ভিলার ঘাড় ঠেসে ধ'রে গর্জে ওঠে।

গার্ভিলা আপ্রাণ শক্তিতে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে চেষ্টা করলো, একবার, দুইবার। কিন্তু চেলকশের আর এক হাত তাকে সাপের মতো জড়িয়ে ধ'রেছে; সার্ট ছিঁড়ে ফেলার একটা শব্দ হোলো···গার্ভিলা তখন বালুর মধ্যে শুয়ে পড়েছে, চোখ দুটি উন্মাদের মতো, আঙুল-গুলি হাওয়া আকড়ে ধরছে যেনো, ছটফট করছে পা দুটো।

চেলকশ যেনো জমাট পাষাণ মূর্তি, দীর্ঘ উন্নত মূর্তি; হিংস্র-খুসী মুখে তাকিয়ে বীরের মতো হাসছে সে। তীক্ষ্ণ সে কাটা-হাসি, ছোরার একটা ঝলকের মতো। তার তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ মুখের উপরে গোঁফজোড়া কুঁচকে আছে।

জীবনে কোনো দিন আর সে এতো তীব্র-ভাবে মর্মাহত হয়নি, আর এতো তীক্ষ্ণ হিংসাবৃত্তিও জেগে ওঠেনি তার মধ্যে।

"কেমন, হ'লো তো এবার?"···একটু হেসে গার্ভিলাকে সে জিজ্ঞেস করলো এবং তার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে সোজা সহরের দিকে চললো। কিন্তু দু পা না যেতেই···গার্ভিলা এক হাঁটুর উপরে বেড়ালের মতো গুড়ি মেরে,···হাতের প্রবল ঝাকানি দিয়ে একটা গোল পাথর তার গায়ের উপর ছুড়ে মারলো, আর সংগে সংগেই হিংস্র জঘন্য চীৎকার!···

—"এই এক!"

চীৎকার ক'রে হাত দিয়ে ঘাড়টা চেপে ধরলো চেলকশ, সামনে টলতে টলতে গার্ভিলার দিকে একবার ঘুরে দাঁড়ালো সে এবং সংগেই সংগেই মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেলো বালুর মধ্যে।

তার দিকে চেয়ে গাভিলার হৃৎপিণ্ড যেনো বন্ধ হ'য়ে গেলো। চেলকশ একবার ন'ড়ে উঠ্‌লো, মাথা তুলতে চেষ্টা করলো, তারপর ধনুকের ছিলার মতো কাঁপতে কাঁপতে গা ছেড়ে দিলো। গাভিলা ছুটে গেলো দূরে, একেবারে অনেক দূরে,—যেখানটায়

একটা জটা-বিপুল কালো মেঘ কুয়াশা-ঢাকা নির্জন প্রান্তরের উপরে ঝুলে র'য়েছে—সমস্ত দিক অন্ধকার ক'রে। ঢেউয়ের ঝাপটারা বালুবেলা ধ'রে উপরে ছুটে যাচ্ছে, আর সেখানে ভেঙে প'ড়ে বেয়ে বেয়ে নেমে আসছে নীচে। চারদিকে শুধু ফেনার হিস্ হিস শব্দ আর বাতাসে উড্ডীন অজস্র শীকররাশি!

বর্ষা সুরু হোলো, প্রথমে ধীরে ধীরে। তারপরেই আকাশ থেকে নেমে এলো অবিশ্রান্ত প্রবল বর্ষণ। সমস্ত আকাশ থেকেই নেমে এলো রূপোলি সুতোর মতো অজস্র জলধারা! সেই জালবুনানিতে সমুদ্র প্রান্তর সবকিছুই ঢেকে গেছে। গাভ্রিলাও এই আড়ালের পিছনে অদৃশ্য। বেলা-বালুর উপরে শায়িত দীর্ঘ দেহটি এবং চারদিকের এই বর্ষণ ছাড়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছুই আর দেখা গেলো না। তখন বৃষ্টির মধ্য দিয়ে হঠাৎ ছুটে এলো গাভ্রিলা। ঠিক একটা পাখীর মতো উড়ে এসে চেলকেশের পাশেই সে নেমে পড়লো ও বালুর উপরে শায়িত তার দেহটাকে মোড় ফেরাতে লাগলো। গরম ও লাল লাল আঠার মতো কিসে যেনো তার হাত ভ'রে উঠলো। আঁৎকে উঠে টলতে টলতে দুপা পিছিয়ে এলো গাভ্রিলা, মুখ তার ফ্যাকাশে, ত্রস্ত।

"ওঠো ভাই!"- বৃষ্টির ঝপ্ ঝপ্ শব্দের মধ্য দিয়ে সে চেলকশের কানের কাছে আস্তে আস্তে বললো।

মুখের উপরে জলের ছাঁটে আবার তাজা হ'য়ে উঠেছে চেলকশ। গাভ্রিলাকে সে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইলো; ঘড় ঘড়্ ক'রে বললো সে—

—"যা—ও, চ'লে যাও!"

"ভাই, ক্ষমা করো!"—তার হাতে চুমো খেতে খেতে গার্ভিলা ধীর কম্পিত গলায় বলে—"লোভের শয়তানে আমার মাথাই ঘুরিয়ে দিয়েছিলো; ক্ষমা করো।"

"যাও, এক্ষুনি চ'লে যাও"—বিড়বিড় কচ্ছিলো চেলকশ।

"আমার পাপ মুছে দাও তুমি! ক্ষমা করো ভাই!"

"যেহেতু তুমি,—যাও, যাও বলছি। নরকে যাও!"

চেলকশ ছোট্ট একটা শব্দ ক'রে বালুর উপরে উঠে বসলো। মুখ তার ফ্যাকাশে; নিভে আসছে কটমটে চোখ, ঘুমে-ক্লান্ত চোখ যেনো।

"আরো কি চাও? তোমার কাজ তো করেছো তুমি,—এবার যাও! সোজা চ'লে যাও!"

ক্লান্তি ভরে তার পাশেই হাঁটু গেড়ে বসতে গিয়ে চেলকশের ইচ্ছে হোলো—এক লাথি দিয়ে সরিয়ে দেয় গাভিলাকে,—কিন্তু পারলো না তা। গাভিলা তার কাঁধটা বাহু দিয়ে ধ'রে তাকে তুলে না রাখলে আবারো সে হয়তো গড়িয়ে প'ড়ে যেতো। চেলকশ এবার গাভিলার মুখোমুখি—উভয়ই ফ্যাকাশে, ভয়ংকর!

"ভাগ্!"—চেলকশ তার সংগীর বিস্তৃত বিস্ফারিত চোখের মধ্যে সোজা থুথু ফেললো।

গাভিলা ভীরু ভাবে জামার নীচটা দিয়ে মুখ মুছে আস্তে আস্তে বললো:

"যা খুসী ক'রো তুমি। একটি কথাও বলবো না। ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি ক্ষমা করো আমাকে!"

"ছিচ্-কাঁদুনে কোথাকার! তুই শয়তানেরও অধম!" চেলকশ ঘৃণা ভরে চীৎকার ক'রে উঠলো ও তার জ্যাকেটের নীচ থেকে সার্টের একটা টুকরো ছিঁড়ে এনে মাথাটা বাঁধতে লাগলো; মাঝে মাঝে নিঃশব্দে সে দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করছিলো। "নোটগুলি নিয়েছো তো?"

"ছুঁইওনি, ভাই! আমি চাইনে ওগুলো! ওর মধ্যে অমংগল আছে।"

চেলকশ জ্যাকেটের মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে নোটের তাড়াটা টেনে আনলো ও রঙীন একটা নোট নিজের পকেটে রেখে বাকীগুলি গাভিলার দিকে বাড়িয়ে ধরলো,—

"নাও, নিয়ে চ'লে যাও!"

"ওগুলো নেবোনা ভাই! নিতে পারবো না; ক্ষমা করো!"

"ন্—নিয়ে যাও বলছি।"—চেলকশ এক ধমকে যেনো জ্ব'লে উঠলো।

"ক্ষমা করো, তা হ'লে নেবো আমি!"—গাভিলা ভীরু ভাবে বললো ও বর্ষার আদরে ভিজা নরম বালুর মধ্যে আছড়ে প'ড়ে চেলকশের পা জড়িয়ে ধরলো।

"মিথ্যে কথা! যেমন ক'রে পারো নেবে তুমি, মায়াকান্না হচ্ছে?"— দৃঢ় বিশ্বাসের সুরে বলে চেলকশ। এবার সে চুল ধ'রে গাভিলার মাথাটা কষ্টে সৃষ্টে টেনে তুলে নোটগুলো তার মুখের উপর সজোরে ঠেসে ধরলো।

"নাও, এই নাও! মাগনা খাটোনি তুমি নিশ্চয়ই! নিয়ে নাও, ভয় নাই। একটা লোককে প্রায় শেষ ক'রেই দিয়েছিলে ভেবে লজ্জারও কোনো দরকার নেই! আমা' মতো লোকের জন্য কেউ তোমাকে শাস্তি দেবে না। তারা জানতে পেলে বরং অনেক ধন্যবাদই জানাবে তোমায়!—ঐ, নিয়ে যাও!"

গার্ভিলা দেখলো—চেলকশ হাসছে; তাই দেখে তার অস্বস্তি কেটে গেলো। হাতের মধ্যে সে নোটগুলি মুঠো ক'রে ধরলো।

"ক্ষমা করলে, ভাই? বলো?"—অশ্রুভিজা গলায় বললো গার্ভিলা।

"আঃ, আমার ভাইরে!"—চেলকশ টলতে টলতেই পায়ের উপর কোনোমতে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপ ক'রে বললো।—"কেনো? ক্ষমা করার তো কিছুই নেই! আজকে তুমি আমাকে নিয়েছো— কালকে তোমাকেই নেবো আমি।"

"ও ভাই, ওঃ ভাই!"—মাথা নাড়তে নাড়তে গার্ভিলা দীর্ঘশ্বাস ফেললো শুধু।

চেলকশ তার সামনে দাঁড়িয়ে, অদ্ভুত রকম হাসছে সে। তার মাথার ন্যাকড়াটা ক্রমেই ভিজে উঠে লাল হ'য়ে যাচ্ছিলো—তুর্কী টুপীর মতো।

আকাশ উল্টে বৃষ্টি পড়ছে। সমুদ্রে ফাঁপা শব্দের গোঙানি। তীরে তীরে ঢেউয়ের ঝাপটা—তীক্ষ্ণ চাবুকের মতো।

দুজনেই নিস্পন্দ নীরব।

"তা হ'লে বিদায়!"—বিদ্রূপের মতো বললো চেলকশ।

টলছিলো সে; মাথাটা অদ্ভুত ভাবে তুলে-রাখা,—যেনো কাঁধ থেকে খুলে প'ড়ে যাবার ভয়!

"আমাকে ক্ষমা করো, ভাই!"—গার্ভিলা আবারো তাকে অনুনয় করলো।

"আচ্ছা বেশ!"—চেলকশের গম্ভীর উত্তর। সংগে সংগেই সে নিজের পথে সোজা চলতে লাগলো। টলতে টলতে যাচ্ছিলো সে; মাথাটা তখনো বাঁ হাত দিয়ে ধরা, ডান হাত দিয়ে গোঁফ জোড়ায় মোচড় দিচ্ছে।

অজস্র ধারায় বর্ষা পড়ছে তখনো,—সমস্ত কিছুই ধূসর কুয়াশায় নিবিড় ভাবে ঢাকা। যতক্ষণ না সে বিষ্টির মধ্যে মিলিয়ে গেলো—গার্ভিলা তার দিকে একদৃষ্টেই চেয়ে রইলো শুধু।